জরাসন্ধ

ন্যায়দণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭
তৃতীয় মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা :
কানাই পাল

এক

এক চক্কর পরিদর্শনের পালা শেষ করে আফিসে ফিরতেই নজরে পড়ল, টেবিলের উপর চাপা-দেওয়া একখানা ভিজিটিং কার্ড—বি. কে. সান্যাল, ডিষ্ট্রিক্ট্ এণ্ড সেসন্স জজ, তার নিচে ব্র্যাকেটের বেড়া দিয়ে হাতে লেখা—'রিটায়ার্ড'। অর্থাৎ চাকরির দায় শেষ হলেও বন্ধন কাটেনি, ঐ বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে তার স্বীকৃতি। মেজর ব্যানার্জির মনে পড়ল, তার প্রথম জীবনের সহকর্মী গিরীনদা বলতেন, চাকরি জিনিসটা কারো বেলায় সাপের খোলস, ছাড়লেই চুকে গেল সম্পর্ক; কারো বেলায় কচ্ছপের খোলা, আমরণ পিঠে করে বয়ে বেড়াও। এই ভূতপূর্ব জজসাহেবটি বোধ হয় সেই দ্বিতীয় দলের।

কার্ডখানার দিকে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন ব্যানার্জি সাহেব। নামটা যেন চেনা। আশ্চর্য কিছু নয়। তাঁর এই বন্দিশালাই তো বিচারশালার পরিপূরক। বিচারমঞ্চের কাঠের ঘেরা ক্ষুদ্র বেষ্টনী পার হয়ে তারপর এই পাষাণ প্রাচীরের বৃহৎ অবরোধ। বিচারপতির সঙ্গে কারাধিপতির সম্পর্ক—দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক। কাঠগড়ার দান গ্রহণ করে কারাগার। তার সঙ্গে একখানি দানপত্র, আইনের ভাষায় যার নাম জেল-ওয়ারেণ্ট্। গ্রহীতার কাছে তার স্বাক্ষরটি মূল্যবান। এই স্বাক্ষর সূত্রেই হয়তো কোনোখানে ঐ কটি অক্ষরের সঙ্গে ব্যানার্জি সাহেবের পরিচয়। তার পরিধিটা 'নাম' ছাড়িয়ে 'মানুষ' পর্যন্ত পৌঁছায় নি।

ঘণ্টা বাজিয়ে আরদালী মারফৎ জজসাহেবকে 'সেলাম' জানালেন জেল-সুপার। তিনি একা নন। পরদা ঠেলে যখন ঘরে ঢুকলেন,

তার গা ঘেঁষে বাঁ হাতের একটি আঙুল জড়িয়ে ধরে চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দাঁড়াল এসে একটি বছর সাতেকের মেয়ে। তারই দিকে প্রথম চোখ পড়ল ব্যানার্জির এবং সে চোখ সহসা ফেরাতে পারলেন না। একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুলে ঘেরা একখানি ফুটফুটে মুখ। কোমল কচি পাতার আড়াল থেকে যেন উঁকি দিল একটি অর্ধস্ফুট পদ্মকোরক। মুহূর্তের জন্যে সম্ভ্রান্ত আগন্তুকের অভ্যর্থনায় বাধা পড়ল। পরক্ষণেই সে-ত্রুটি শুধরে নিলেন। সান্যাল সাহেব সামনেকার চেয়ারটায় বসলেন। আরদালী ছুটে এসে আর একখানা চেয়ার এনে বসিয়ে দিল তার পাশে। কিন্তু মেয়েটি বসল না। দাঁড়িয়ে রইল জজসাহেবের পাশ ঘেঁসে।

ভূমিকা না করে প্রথমেই কাজের কথা পাড়লেন জজসাহেব—পাঁচ বছর আগে শশাঙ্ক মণ্ডল বলে একটি লোকের জেল হয়েছিল। আমি তখন এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট জজ। আমারই কোর্টে কনভিকশন। আজ তার খালাসের দিন। বেরোবার আগে একবার দেখা করতে পারি ?

'পাঁচ বছর আগে!' একটুখানি সন্দেহের সুরে বললেন মেজর ব্যানার্জি, 'কতদিনের জেল ?'

—পাঁচ বছর।

—'তাহলে তো এতদিন তার থাকবার কথা নয়। অন্ততঃ বছর খানেক আগে বেরিয়ে গেছে ?'

'তা কেমন করে হবে!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন জজসাহেব, 'পুরো টার্ম না খেটেই বেরিয়ে গেল ?'

ব্যানার্জি মৃদু হেসে বললেন, তাই সবাই যায়। আপনাদের হুকুমের ওপর আমরা আবার খানিকটা কলম চালিয়ে থাকি।

জজসাহেবের বিস্মিত চোখের উপর নীরব প্রশ্ন ফুটে উঠল। সেই দিকে চেয়ে আর একটু পরিষ্কার করে বললেন জেল-সুপার, ছমাস

কিংবা তার বেশি মেয়াদ নিয়ে যে সব লোক আসে, তারা মাসে মাসে কদিন করে 'রেমিশন' পায়।

—'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, মিষ্টার সান্যাল, 'এ রকম একটা কথা আগেও শুনেছিলাম; এবার মনে পড়ছে। তাহলে তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

—কোন্ তারিখে সে বেরিয়ে গেছে, যদি চান, আমার আফিসের রেকর্ড থেকে বলে দিতে পারবো।

জজসাহেব সেবিষয়ে কোনো উৎসাহ দেখালেন না। নিরাশার সুরে বললেন, তারিখ জেনে আর কী করবো? তার বাড়ি তো আমি চিনি না। তাছাড়া আপনি বলছেন, বছর খানেক আগে চলে গেছে। এ্যাদ্দিন পরে—

—বাড়ির ঠিকানা যদি চান, তাও বোধহয় আপনাকে দিতে পারবো। নামধাম সবই তো আমাদের কাছে থাকবার কথা।.

জজসাহেব ভাবতে লাগলেন। ব্যানার্জির হঠাৎ চোখে পড়ল, আফিসে আসবাবপত্র ঝাড়পোছ করে যে কয়েদীটি, জেল পরিভাষায় 'আফিস-ফালতু', তার হাতে একটি গোলাপের গুচ্ছ। বারান্দায় একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ঐ মেয়েটির দিকে স্নেহাকুল সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, সম্ভবতঃ তার নজরে পড়বার অপেক্ষায়। তাকে ঘরে ডেকে নিলেন, এবং মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন, 'ফুল নেবে খুকুমণি?'···লোকটিকে বললেন, দে, ওর হাতে দে।

বড় সাহেবের হুকুম পেয়ে একগাল হেসে খুকুর দিকে এগিয়ে গেল ফালতু। মেয়েটির মুখেও ফুটে উঠল সেই তাজা ফুলের দীপ্তি। কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়েও আবার কী ভেবে সান্যাল সাহেবের মুখের দিকে তাকাল। তিনি সস্নেহে মাথা নেড়ে বললেন, দিচ্ছেন, নাও। 'কাঁটা টাটা নেই তো রে?' ফালতুকে জিজ্ঞাসা করলেন সুপার।

—'না, হুজুর, কাঁটা সব ছাড়িয়ে দিয়েছি'—বলে আর একটু কাছে গিয়ে তোড়াটা এগিয়ে ধরল। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে নবনী-কোমল ভীরু হাতত্বখানি বাড়িয়ে ফুলগুলো তুলে নিল খুকুমণি এবং তারপরেই জজসাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী বলল।

—'এই যে, চল'—বলে, ব্যানার্জির দিকে ফিরে বললেন, তাহলে দয়া করে ওর বাড়ির ঠিকানাটাই আমাকে দিতে বলুন। একটু দেরি হবে বোধহয়?

—বেশি দেরি হবে না। তাহলেও খুকুমণির যে-রকম তাড়া দেখছি, আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না। কোথায় উঠেছেন বলুন। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই সব আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—আমি উঠেছি ডাক বাংলোয়। কিন্তু একে তো কাজের সময় এসে বিরক্ত করলাম। তার ওপরে আবার এই লোক পাঠানোর ঝঞ্ঝাট—

—কিচ্ছু না। বিরক্ত আপনি মোটেই করেননি, আর লোক পাঠিয়ে আপনার এই সামান্য খবরটুকু জানাতেও আমার কোনো অসুবিধে নেই। বরং ভাবছি, যে-উদ্দেশ্যে আপনি এলেন, তার কিছুই আমি করতে পারলাম না।

—আপনি কী করবেন, বলুন। আমারই ভুল। ওর সঙ্গে দেখা করার সত্যিই আমার খুব দরকার ছিল। এখানে তো হল না। একবার চেষ্টা করে দেখি, বাড়িতে পাই কিনা।

মেজর ব্যানার্জি গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে জজসাহেবকে বিদায় দিলেন, মেয়েটিকেও তার রেশমের মত চুলগুলোয় নাড়া দিয়ে কয়েকবার আদর করলেন।

ফিরে আসবার মুখে শুনলেন, বাঁশির মত সুরে বলছে মেয়েটি, 'কত চোর দেখেছ দাহু? ছাগলের মত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।' জজসাহেবকে বলতে শোনা গেল, 'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।'

জেল-আফিসের পুরানো দপ্তর ঘেঁটে পাওয়া গেল ঠিকানা। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে কিন্তু কোতোয়ালী থানার এলাকার মধ্যেই একটা ছোট গ্রাম; নাম ফুলতলি। সেইখান থেকে এসেছিল শশাঙ্ক মণ্ডল। ডাকাতি মামলায় কিছুদিন হাজত-বাসের পর পাঁচ-বছরের সাজা দিয়েছিলেন দায়রা জজ বসন্ত সান্যাল।

ফুলতলি! হ্যাঁ; এবার মনে পড়ছে নামটা, এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু। একটা ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করে দুপুরের পরই বেরিয়ে পড়লেন সান্যাল সাহেব। অনেক দিনের বিশ্বাসী চাকর নবীনকে সঙ্গে এনেছিলেন। তারই কাছে রেখে গেলেন নাতনীকে। ও তখন ঘুমুচ্ছে। বারবার বলে গেলেন, 'নতুন জায়গা, খুব সাবধান! সব সময়ে চোখে চোখে রাখবে।'

গ্রামে পৌঁছে দুচার জনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, জেল থেকে বেরিয়ে শশাঙ্ক আর বাড়ি ফিরে যায় নি। বাড়ি বলতে ছিল খান দুই চালাঘর; সংসার বলতে বৌ আর একটি বছর দুয়েকের মেয়ে। যেদিন ওর মামলা শেষ হয়ে রায় বেরোবার কথা, মেয়েটাকে কোলে করে বৌ গিয়েছিল শহরে, আর ফেরেনি। কী হয়েছিল সেখানে, সঠিক কেউ বলতে পারে না। হাসপাতালে মারা গেছে, এই পর্যন্তই শুনেছিল। মেয়েটার কী হল তাও জানা যায়নি। কোথায় কোন্ অনাথ আশ্রমে নাকি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জজসাহেব। আপনার জন বলতে ওদের গ্রামে কেউ নেই। সনাতন বলে একজন ছিল; ওদের খবর-টবর রাখত। সেও ক'বছর হল দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

গ্রামের কয়েকজন লোক গাড়ির সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে দিল শশাঙ্কের শূন্য ভিটে। ঘরদোরের চিহ্নমাত্র নেই। ওরা ছেড়ে যাবার পরেও রোদ বৃষ্টি মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল দুতিন বছর। তারপর কখন পড়ে গেছে। ঝড়বাতাসে উড়ে গেছে খড়কুটো, বাকীটুকু পচে গলে

মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। সেই ধ্বসে যাওয়া উঁচু ঢিবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জজসাহেব। তারপর গাড়োয়ানকে ডেকে গাড়ি ফেরাবার নির্দেশ দিলেন।

খানিক দূর এসে একখানা পাঁচিল-ঘেরা কোঠা বাড়ি চোখে পড়ল। মকবুল চৌধুরীর বাড়ি, বলল গাড়োয়ান।• নিজের অজ্ঞাতসারে একটু যেন চমকে উঠলেন জজসাহেব। গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন বাড়িটা। গাড়োয়ান বলে চলল, 'নামকরা জোতদার ছিল একসময়ে। অনেক টাকার লগ্নি। তেমনি পাজি ছিল লোকটা। আশেপাশের বৌঝিরা ইজ্জৎ নিয়ে ঘর করতে পারত না। কিছুদিন হল মারা গেছে। মস্ত বড় আপদ গেছে একটা। নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে এদিককার মানুষগুলো। একটা ছেলে। বাপ থাকতেই কোথায় যে চলে গেছে, আর ফেরেনি। এত যে টাকা-কড়ি জমি-জিরেত—কার ভোগে লাগল?' 'সবই খোদার মরজি', বলে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাল কোচম্যান। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অনেকটা পথ যেতে হবে।

চাবুক খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটুখানিক চাঙ্গা হয়ে উঠল ঘোড়া ছুটো। আবার যথারীতি ঝিমিয়ে পড়ল, এগিয়ে চলল ঢিমে তালে। ছক্কড়ের সেই একঘেয়ে ঘর্ঘর এবং একটানা ঝাঁকুনির মধ্যে এমন একটা নেশা আছে যাতে করে আরোহীর চোখেও ঝিমুনি ধরে যায়। গাড়ির দেয়ালে মাথা রেখে, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঢাকা মাঠের দিকে চেয়ে থেকে থেকে সান্যাল সাহেবের ক্লান্ত চোখ ছুটি কখন জড়িয়ে এল। সেই নিমীলিত চক্ষুর সুমুখে ভাস্বর হয়ে উঠল সেদিনকার সেই বহু-স্মৃতি-মণ্ডিত দিনগুলো, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আজকার এই নিষ্ফল যাত্রা।

পাঁচ বছর। না; তারও কিছুদিন আগে থেকে সুরু। এই জিলারই দায়রা জজ ছিলেন তিনি। ন্যায়নিষ্ঠ কঠোর বিচারক বলে খ্যাতি

ছিল সাধারণের কাছে। অখ্যাতিও ছিল ঐ একই কারণে, বিশেষ করে এক শ্রেণীর উকিল এবং সরকারী কর্মচারীদের মজলিশে। এই দুটো মনোভাবই তিনি জানতেন এবং দুটোর উপরেই ছিলেন সমভাবে উদাসীন।

এমনই একটা রাত। এই রকম একখানা শীর্ণ চাঁদ উঠেছিল আকাশের কোণে। শীতের শেষ। নাতিশীতল বাতাসে আসন্ন বসন্তের আভাস। নদীর ধারে অতি রমণীয় পরিবেশে জজসাহেবের বাংলো। দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায় টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসে একটি খুনী-মামলার রায় লিখছিলেন, আর মাঝে মাঝে কলমটা হাতে নিয়ে নিমগ্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখছিলেন পরিম্লান জ্যোৎস্না-ঢাকা নদীবক্ষের দিকে। চাপরাসী এসে বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়াল, খানিকটা দূরে ঐ দেয়ালের পাশে। জজসাহেব চোখ তুলে তাকাতেই মাথা নিচু করে জানাল, একটি মেয়েছেলে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—'মেয়ে ছেলে!' ভ্রূকুঞ্চিত করলেন সান্যাল সাহেব, 'কী দরকার বলেছে কিছু?'

—আজ্ঞে না; জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলতে চায় না। হুজুর এখন ব্যস্ত আছেন, বলেছিলাম। তাও শুনতে চায় না। বলছে, একটিবার দেখা করিয়ে দাও, আমার বড় বিপদ।

—সাহায্য টাহায্য চায় বোধ হয়? আরেকবার বরং দেখে এসো—

—আজ্ঞে, সেকথাও বলেছি। টাকাকড়ি কিছু নেবে না। হুজুরের কাছে কি নালিশ আছে, এই কথাই খালি বলছে।

—সঙ্গে কে আছে?

—কাউকে তো দেখছি না। একাই এসে দাঁড়াল। কোলে একটি ছোট বাচ্চা।

চিন্তিত হলেন জজসাহেব। ঠাকুর চাকর মালী চাপরাসী নিয়ে তাঁর সংসার। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা সব কলকাতায়। এই রাত্রে

একটি মেয়েছেলেকে ভিতরে আসতে দেওয়া—। তাছাড়া, কে সে, কোথা থেকে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, তাই বা কে বলতে পারে? চাপরাসী তখনো অপেক্ষা করছে। সেই দিকে ফিরে বললেন, ওকে বুঝিয়ে বল, এ সময়ে আমি কারো সঙ্গে দেখা করি না। দরকার থাকলে কাল সকালে—

কথা শেষ হল না। তার আগেই একজন মেয়েছেলে একরকম ছুটে এসে কোলের বাচ্চাটিকে ধপ করে মাটিতে বসিয়ে তাঁর পা চেপে ধরল। চাপরাসী রা-রা করে উঠল—'আহা! ও কী করছ? উঠে এসো। যা বলবার এদিকে এসে বলো।'

মেয়েটি থতমত খেয়ে পা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে যেতেই রূঢ় কণ্ঠে বলল চাপরাসী, তুমি কেমন ধারা মেয়েছেলে গো? বললাম, দাঁড়াও, হুজুরের হুকুম নিয়ে আসি। তা কোন্ আক্কেলে একেবারে—

জজসাহেব হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন, কী চাও, তুমি?

বাচ্চাটি কেঁদে উঠেছিল। কোলে নিয়ে শান্ত করে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটি। সান্যাল সাহেবের মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ছায়া। পরণে মোটা আধময়লা শাড়ি। তার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ফরসা সেমিজ, হাতে দুগাছা শাঁখা ছাড়া সারা দেহে আর কোনো অলঙ্কার নেই। নিতান্ত সাধারণ নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র-ঘরের বৌ। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে সেখানকার মেয়ে এ নয়।

একখানি সুশ্রী মুখ, ঈষৎ শীর্ণ কিন্তু সুডৌল। কপালের উপর পর্যন্ত ঘোমটা টানা। তার নিচে স্নিগ্ধ, করুণ দুটি চোখ। দেহের রঙ গৌর কিন্তু অযত্ন-মলিন। অনেকটা আজকের এই কুয়াসা-ঢাকা ম্লান জ্যোৎস্নার মত। চোখের কোল বেয়ে যে দুটি জলের রেখা নেমে এসেছিল এখনো তার দাগ লেগে আছে। পাৎলা ঠোঁট দুখানা আবার কেঁপে উঠল। তার ভিতর থেকে থেমে থেমে বেরিয়ে এল

কান্নাভরা মৃদু কণ্ঠ, "বাবা, আমাদের কেউ নেই। *বড় বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে।"

—তোমাদের বাড়ি কোথায়? কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জজসাহেব।

—ফুলতলি।

—কদ্দূর এখান থেকে?

—অনেকদূর তিন-চার কোশ হবে।

—কার সঙ্গে এসেছ?

'একা এসেছি বাবা। কেউ নেই আমার। কে নিয়ে আসবে?' বাচ্চাটিকে দেখিয়ে বলল, ওর বাবাকে ডাকাতি মামলায় ধরে নিয়ে গেছে। তিন মাস হল পড়ে আছে জেলখানায়। সব মিথ্যে। ডাকাতি সে করেনি। সমস্ত ঐ চৌধুরী সাহেবের কারসাজি। পুলিশের সঙ্গে সড় করে বিনাদোষে জেলে পুরে দিয়েছে। আপনি জজসাহেব। আপনি সব পারেন। আমার স্বামীকে বাঁচান, আমার এই বাচ্চাটাকে বাঁচান।

—কী নাম তোমার স্বামীর?

মেয়েটি একবার একটুখানি ইতস্ততঃ করল। বহুদিনের সংস্কার। তারপর মাথা নত করে সলজ্জ কণ্ঠে বলল, শশাঙ্ক মণ্ডল।

নামটা মনে পড়ল সান্যাল সাহেবের। ডাকাতি মামলায় দায়রা সোপর্দ হয়ে তাঁরই ফাইলে রয়েছে কেস। কয়েকদিনের মধ্যেই বিচার সুরু হবে। মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখের পেশিগুলো কঠিন হয়ে উঠল! চোখ মুখের উপর থেকে মিলিয়ে গেল কারুণ্যের ছায়া, ভেসে উঠল শীতল গাম্ভীর্য। সে পরিবর্তন এত স্পষ্ট যে বৌটির চোখও এড়াল না। ভয়ে ভয়ে বলল, উকিল মোক্তার দেবার আমার ক্ষমতা নেই বাবা। পয়সা কোথায় পাবো? ওরা সব বললে, জজসাহেবের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়। আসল কথা জানতে

পারলে নিশ্চয়ই তোর স্বামীকে ছেড়ে দেবেন। আপনি যদি দয়া না করেন—

—আমার কাছে আসা তোমার ঠিক হয়নি, বাধা দিয়ে শান্ত কিন্তু গম্ভীর স্বরে বললেন জজসাহেব, তোমাকে যারা পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁরা ভুল করেছেন। তোমার কাছ থেকে কোনো কথাই আমি শুনতে পারি না। তুমি এখন বাড়ি যাও।

চাপরাসী কাছেই কোথাও ছিল। মনিবের ডাক শুনে ব্যস্তভাবে ছুটে আসতেই, বললেন, 'মালীকে ডাক।' মালী বুড়ো মানুষ। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই চোখে মুখে জল দিয়ে এসে দাঁড়াল। হুকুম হল, 'একটা গাড়ি ডেকে এই মেয়েটিকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। সেই গাড়িতেই ফিরবে। যাওয়া-আসার ভাড়া ঠিক করে নিও। নিবারণ…।'

—হুজুর।

—আমার কোটের পকেটে টাকা আছে।

'না, না, গাড়ি করে যাবো না আমি', শঙ্কাকুল স্বরে বলে উঠল মেয়েটি। 'ওরা টের পেয়ে যাবে। মকবুল চৌধুরীর লোক সব জায়গায় ঘুরছে। আজ এখানে, কাল ওখানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। দেখতে পেলে আর রক্ষা আছে? না, বাবা, আমি হেঁটেই যাবো। একাই যেতে পারবো'…বলে, ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে কাঁধের উপর ফেলে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে চলে গেল।

নামমাত্র রাত্রের আহার। একটু ছানা, সঙ্গে কিছু ফলমূল। যথাসময়ে শেষ করে আবার সেই রায় নিয়ে বসলেন জজসাহেব। কিন্তু জটিল তথ্য এবং জটিলতর আইনের তর্কে মন বসাতে পারলেন না। থেকে থেকে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগলেন ঐ মেয়েটির কথা। ওর সেই আবেদন-গভীর কণ্ঠ, দুটি অসহায় চোখের নিচে জলধারা।

রায় রেখে দিয়ে শয্যার আশ্রয় নিলেন। সেখানেও ঐ চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পেলেন না। এক্ষেত্রে যা তার একমাত্র করণীয়, তাই তিনি করেছেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না। তবু আগাগোড়া সমস্ত বিষয়টা আর একবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে দেখলেন।

একটি সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র-গৃহস্থ বধূ বিপদে পড়ে তাঁর শরণ নিয়েছিল। বলতে এসেছিল, কোনো এক প্রবল শত্রুর চক্রান্তের ফলে তাব নিরপরাধ স্বামী আজ জেল-হাজতে পড়ে আছে। উকিল মোক্তার নিযুক্ত করবার সঙ্গতি তার নেই, মনে করেছিল বিচারক যদি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন, সুবিচার থেকে সে বঞ্চিত হবে না। তিনি তার কথা শোনেননি। কিঞ্চিৎ রূঢ়তার সঙ্গেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। সব সত্য। কিন্তু এ ছাড়া আর কী উপায় ছিল? আদালতে সকলের সামনে বর্ণিত হবে যে ঘটনা, সাক্ষ্য জবানবন্দির ভিতর দিয়ে প্রমাণিত হবে যে তথ্য তার বাইরে দৃষ্টি দেবার তাঁর অধিকার নেই। সে প্রসঙ্গে অন্য কোনো সূত্র থেকে যদি কোনো কথা তাঁর কানে এসে পৌঁছায় তাকে অবান্তর বলে বর্জন করতে হবে। এই তো ন্যায় বিচারের বিধি। প্রতিদিন জুরিদের চার্জ বোঝাতে গিয়ে এই কথার উপরেই তাঁকে জোর দিতে হয়—জুরি মহোদয়গণ, কখনো ভুলবেন না, এইখানে এই ধর্মাধিকরণের আসনে বসে যা শুনছেন, যা দেখছেন, তারই উপর নির্ভর করে আপনাদের সত্য নির্ণয় করতে হবে। তার বাইরে যা কিছু, তার সম্পর্কে আপনারা অন্ধ এবং বধির। যে ব্যক্তি আপনাদের কাছে বিচারপ্রার্থী, তার চরিত্র বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোনো নিন্দা বা প্রশংসা যদি আপনাদের কানে এসে থাকে, তার কোনোটাই যেন আপনাদের বিচার-বুদ্ধিকে বিচলিত না করে। সংস্কার-মুক্ত, ভাবাবেগ শূন্য মন নিয়ে ঐ আসামীর দিকে তাকান। এবং সেই মন দিয়ে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে অভিযোগ তার সত্যাসত্য স্থির করুন।

এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি ঐ মেয়েটিকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি বিদায় করে দিয়েছেন। যে কাহিনী সে বলতে এসেছিল, পাছে তার ভিতরে এমন কিছু থাকে, যা অজ্ঞাতসারেও তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করে তাই, তার কোনো কথাই তিনি শুনতে পারেন না। সেই অক্ষমতাই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। বিবেকের কাছে, আদর্শের কাছে জবাবদিহি করবার তাঁর কিছুই নেই।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন সান্যাল সাহেব। নানা চিন্তার মধ্যে এক সময়ে মনে হল, তাঁর এই দৃঢ়প্রত্যয়ের কোন একটা ফাঁক দিয়ে একটুখানি সংশয় যেন তাঁর অন্তরের নিভৃতে ছায়া ফেলে গেল। বিচারকের ন্যায়নীতি তিনি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেইটাই কি সবখানি? মানুষের কাছে মানুষের যে সহজাত প্রত্যাশা তা কি তিনি পূরণ করতে পেরেছেন? মেয়েটি যে অত্যন্ত বিপন্ন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো অত্যাচারী কুচক্রীর কবলে পড়ে তার স্বামী আজ জেলে পড়ে আছে। সে নিজেও তার শিশু সন্তানটিকে বুকে করে তারই ভয়ে রাত্রের অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই ছিল তার নালিশ, এবং সে নালিশ সে জানাতে এসেছিল এমন একজনের কাছে বিচারমঞ্চের উচ্চাসনে বসে অন্যায়ের প্রতিকার এবং উৎপীড়নের শাস্তিবিধান করবার জন্যেই যিনি বিশেষ-ভাবে নিয়োজিত। অন্ততঃ সেইটাই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস নিয়েই এসেছিল মেয়েটি। তার কতটুকু মর্যাদা তিনি রাখতে পেরেছেন? বিচারকের কঠিন বর্ম ভেদ করে ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নটাই তাঁর সামনে মাথা তুলে উঠতে লাগল।

সকালে উঠে যথারীতি আবার রায় নিয়ে বসলেন জজসাহেব। কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেনোগ্রাফার এল। স্নানাহারের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। রাত্রির নিভৃত নির্জনে যে দুর্বল সংশয়

মনের কোণে দেখা দিয়েছিল, তার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। কাছারিতে গিয়ে কেস-ডায়েরির পাতা উল্টে দেখলেন, শশাঙ্ক মণ্ডল এবং তার ছজন সহ-আসামীর বিচারের দিন ধার্য হয়ে গেছে। একবার ভাবলেন মামলাটা অন্য বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়াই বোধ হয় সমীচীন। প্রধান আসামীর স্ত্রী যে আবেদন নিয়ে গোপনে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিল. তার বিস্তৃত তথ্য তিনি শোনেননি, তবু এই সাক্ষাৎটাই কি নিরপেক্ষ বিচারের আদর্শকে খণ্ডিত করেনি? পরক্ষণেই মনে মনে লজ্জিত হলেন বসন্ত সান্যাল। এই ক্ষুদ্র ঘটনার সাধ্য কি তাঁর বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করে? এই তুচ্ছ কারণে যদি তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন, সেটাই হবে তাঁর চরম দুর্বলতার স্বীকৃতি। তাহলেই বুঝতে হবে যে বিচারাসন তিনি অধিকার করে আছেন তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। বিচারমঞ্চে হৃদয়দৌর্বল্যের স্থান নেই। দ্বিধাবিমুক্ত মন নিয়ে এ বিচার তাঁকেই করতে হবে। কেস তাঁর নিজের ফাইলেই রইল।

নির্দিষ্ট দিনে মামলা সুরু হল। মুখবন্ধে আসামীদের কার্যকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন সুযোগ্য পাব্লিক প্রসিকিউটার এবং সেই প্রসঙ্গে জজ ও জুরিদের সামনে তুলে ধরলেন শশাঙ্কের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র।

সাধারণ চাষী গৃহস্থের ছেলে শশাঙ্ক মণ্ডল। নিজের জমিজমা অতি সামান্য। বাকীটা অন্যের জমি ভাগে চাষ করে কোনরকমে সংসার চালাত তার বাপ। স্ত্রী নেই। ঐ একটিমাত্র ছেলে। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে, এই আশা নিয়েই তাকে পাশের গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। পাশ করে বেরোবার পর বিয়েও দিয়েছিল ঐ স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার বিপিন বিশ্বাসের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। পাড়ার লোকে বলাবলি করত, এরকম মেয়ে নাকি বামুন কায়েতের ঘরেও সচরাচর চোখে পড়ে না। মেয়ের উপযুক্ত অবস্থাপন্ন পাত্রের অভাব হত না। কিন্তু হাজার হলেও মাস্টার তো? ছাত্রের মেধা দেখে ভুলেছিলেন বিশ্বাস মশাই। মেধা

সত্যিই ছিল, কিন্তু তার বিকাশ যে এই পথে দেখা দেবে, নিশ্চয়ই তিনি ভাবতে পারেননি।

বিয়ের পরেই ছেলের নানা প্রয়োজন দেখা দিতে লাগল, যা গরিব বাপের সামান্য রোজগারে কুলায় না। তবু যতটা পারে প্রাণপণে যুগিয়ে যায়। মনে মনে আপসোস করে, তার একূল ওকূল দুকূলই গেল। ছেলে না গেল চাকরির পথে, না নামল মাঠের পথে। বেশিদিন এ দায় তাকে ভুগতে হল না। ভাগ্যক্রমে সামান্য একটু সর্দিজ্বর উপলক্ষ্য করে সব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।

ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে এই ছিল বাপের ইচ্ছা। তার অর্ধেকটা মোটামুটি পূরণ হয়েছিল বলা চলে। অর্থাৎ লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শিখেছিল শশাঙ্ক। তা নিয়ে রোজ দুপুর বেলা টেরি বাগিয়ে স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে বাবুদের পাড়ায় গিয়ে তাসের আড্ডায় যোগ দেওয়া চলে, কিন্তু গরুর ল্যাজ ধরে লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যাওয়া যায় না। এদিকে সংসার ঘাড়ে। বৌ একা নয়, তার কোলে একটি মেয়ে। শশাঙ্ক রীতিমত অসুবিধায় পড়ে গেল।

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। কথাটা একাধিক অর্থে সত্য। যাদের বিদ্যার অভাব, অন্যান্য অভাবকে তারা সয়ে নেয়, মেনে নেয়, মনে করে দারিদ্র্যটা তার অদৃষ্টের লিখন। বিদ্যা নামক বস্তুটির অভাব যাদের নেই তারা তাদের অন্য সব অভাবকে পূরণ করবার ক্ষমতা রাখে, তারই জন্যে বিদ্যাকে প্রয়োগ করে, চেষ্টা ও নিষ্ঠা দিয়ে বড় হতে চায়। মাঝখানে পড়ল এই অল্পবিদ্যার দল। তারা খোঁজে অল্পায়াসে বড় হবার পথ। সোজাপথে চলবার মত বিদ্যার জোর নেই বলে ঘুরপথ ধরে। অভাব আছে, তাকে দূর করবার ক্ষমতা নেই, যোগ্যতা নেই। তখন নজর পড়ে সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর উপর। ওর আছে, আমার নেই কেন? এই ঈর্ষা থেকে দেখা দেয় ক্রোধ এবং ক্রোধ থেকে ক্রাইম। আমার যখন নেই, সোজাপথে

যখন পাচ্ছি না, তখন ছিনিয়ে আন ওর থেকে খানিকটা। বিদ্যা যদি একেবারে না থাকত, এই ছিনিয়ে আনা অর্থাৎ পরের ধন হরণ করাটা হয়তো ধর্মবোধে বাধত। কিন্তু অল্প বিদ্যার জোরে সে সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে ওঠা যায়। তাই উঠেছিল শশাঙ্ক মণ্ডল।

মকবুল চৌধুরীর বাড়ি, ওদের গ্রামের এক ধারে। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। জমি-জমা আছে, তার চেয়েও বেশি আছে কাজ-কারবার। কাছারি ঘরে অনেক রাত অবধি টাকা-পয়সার লেনদেন চলে। জমিদার হলে পাইক-বরকন্দাজ থাকত, অন্ততঃ দু-একটি পেয়াদা বা দারোয়ান। কিন্তু কারবারী মানুষের ও সব চাল নেই। বাড়তি লোকের মধ্যে জনকয়েক চাকর-বাকর। শশাঙ্ক মণ্ডলের তাসের আড্ডায় নিষ্কর্মা বন্ধুদের ওইটাই হল সুযোগ। সব প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল। খানকয়েক লাঠি, একখানা রামদাও আর দুএকটা ল্যাজা। তাতেই কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে। হলও তাই।

রাত তখন দশটা কি সোয়া দশটা। নিতান্ত পাড়াগাঁ অঞ্চল। চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে! চৌধুরীদের বাড়িটাও একটু ফাঁকার মধ্যে। কাছাকাছি লোকজনের বসতি বড় কম। গোমস্তার সঙ্গে বসে সেদিনকার হিসাব মেলাচ্ছিলেন মকবুল চৌধুরী। এমন সময় সাত আট জন লোক লাঠিসোটা, ল্যাজা আর রামদাও নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চাকর-বাকর দু একজন ছুটে এসেছিল। কিন্তু প্রথম চোটেই স্বয়ং মনিবের মাথায় লাঠির ঘা পড়তেই আর বেশি এগোতে সাহস করল না। গোমস্তাটি পাকা এবং হুঁসিয়ার লোক। হট্টগোলের মধ্যে নোটের তাড়াগুলো তাড়াতাড়ি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলেছিল ঘরের পেছনে একটা ঝোপের মধ্যে। খুঁজে বের করতে ডাকাতদলকে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হল। ততক্ষণে চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন কিছু এসে পড়েছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করা ছাড়া তাদের দিয়ে আর কি কাজ হতে পারে?

এমন সময় চাবি খুঁজে পাওয়া গেল এবং গোমস্তাকেই রামদাও উঁচিয়ে বাধ্য করা হল সিন্দুক খুলে দিতে। তারপর নোটের বাণ্ডিল নিয়ে আস্ফালন করতে করতে চলে গেল ডাকাতের দল। রংটং মাখা থাকলেও শশাঙ্ক এবং তার তিন চারটি বন্ধুকে চিনতে কারোরই অসুবিধা হয়নি। ওদের হাতের মশালগুলোই সেদিক দিয়ে সাহায্য করেছিল। মশালের প্রয়োজনটা যে কেন হয়েছিল, বলা শক্ত, তবে ওটা বোধ হয় ডাকাতি নামক অভিযানের প্রধান অঙ্গ।

ডাকাতের দল চলে যাবার পর পাড়ার লোকজনের সাহায্যে চৌধুরীকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথার জখম বলে ডাইং ডিক্লেয়ারেশনের ব্যবস্থা করেন ভারপ্রাপ্ত সার্জন। ততক্ষণে চৌধুরীর জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং জবানবন্দিতে তিনি শশাঙ্কের নাম উল্লেখ করেন। এই ব্যক্তিটিই যে দলের নেতা এবং লাঠির আঘাতটাও যে তারই দেওয়া এ সম্বন্ধে দর্শকদের সকলেই একমত। ভাগ্যক্রমে, সম্ভবতঃ কাঁচা হাত বলে জখমটা গুরুতর হয় নি। মাসখানেক ভুগেই চৌধুরী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এজাহার দেওয়া হয়েছিল শেষ রাত্রে। ভোরের দিকে পুলিশ এসে শশাঙ্ক এবং বন্ধুদের কাউকে বাড়িতে পায়নি। টাকা পয়সারও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। পাঁচদিন পরে সাত আট মাইল দূরে তার এক দূর সম্পর্কের পিসীমার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং খানাতল্লাসি করে ধানের গোলার ভিতর থেকে উদ্ধার করা গেল ছুটি অক্ষত হাজার টাকার বাণ্ডিল ও সেই সঙ্গে খুচরা নোট আর রেজগি মিলিয়ে ছুশ বাহাত্তর টাকা বারো আনা। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ পাঁচ হাজারের উপর। বাকীটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুলিশের রিপোর্টের উপর সরকারী উকিলের এই সুনিপুণ ভাষ্য। সরকারী পক্ষের সাক্ষীরা ওর প্রতিটি তথ্য একে একে

সমর্থন করে গেল। পাব্লিক প্রসিকিউটর তাঁর প্রয়োজনমত প্রশ্ন করে করে মামলার পক্ষে যে সব উক্তি অনুকূল, সাক্ষীদের মুখ থেকে বের করে নিলেন। শশাঙ্কের কোনো উকিল ছিল না। তার সহ-আসামীদের কারো কারো তরফে দাঁড়িয়েছিলেন কজন অনভিজ্ঞ নতুন উকিল। তাদের জেরার উত্তরে সাক্ষীদের জবানবন্দির কোনো কোনো অপ্রধান অংশে সামান্য বৈষম্য দেখা গেল। তাতে করে এই কথাই বরং প্রমাণিত হল যে বর্ণিত ঘটনা তৈরি বা সাজানো নয়, সত্য এবং স্বাভাবিক। এটুকু অবশ্য জানা গেল, সাক্ষীরা সকলেই মকবুল চৌধুরীর প্রজা অথবা খাতক। কেবলমাত্র সেই কারণেই তাদের উক্তিকে অবিশ্বাস করা যায় না; বিশেষতঃ যেখানে শুধু তারা নয়, গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাই। কোনো না কোনো ভাবে চৌধুরীর কাছে ঋণী। সরকারী উকিল তাঁর দীর্ঘ সওয়ালে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন।

পাঁচজন জুরি একযোগে শশাঙ্ক এবং তার তিনজন সহ-আসামীকে ডাকাতি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলেন, এবং বাকী দুজনকে সন্দেহের অবকাশে খালাস দেবার সুপারিশ করা হল। জজ-সাহেব জুরিদের সঙ্গে একমত না হবার কোনো কারণ দেখতে পাননি। সুতরাং তাদের সর্বসম্মত অভিমত গ্রহণ করে শশাঙ্ক মণ্ডলকে পাঁচ বছর ও অন্য তিন জনকে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

বিচারবিধির বিভিন্ন স্তরে কোনরকম ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার অবকাশ না ঘটে অভিজ্ঞ এবং সুযোগ্য বিচারক বসন্ত সান্যাল সে বিষয়ে যথারীতি সজাগ ছিলেন। যথাসময়ে প্রতি আসামীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তুমি দোষী না নির্দোষ। অন্য সকলে উকিলের পরামর্শমত সোজা এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিল—আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। শশাঙ্কের জবাব ছিল একটু অন্য ধরনের। বলেছিল

ডাকাতি বা জখমের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই, ধর্মাবতার। যে কাহিনী বর্ণনা করা হল, সেটা উপন্যাসমাত্র। তবে—

তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে জজসাহেব ভরসা দিলেন, বল।

আদালত কক্ষে তিলধারণের জায়গা নেই। অতগুলো লোক, সব নিস্তব্ধ; যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তার মুখের দিকে চেয়ে। শশাঙ্কের চোখদুটো চারিদিকটা ঘুরে এসে ক্ষণেকের তরে স্থির হয়ে দাঁড়াল মকবুল চৌধুরীর মুখের উপর। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা প্রদীপ্ত শিখা। পরক্ষণেই কোর্টের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠেই বলল, আমার একমাত্র অপরাধ আমার স্ত্রীর রূপ। শুধু সেই জন্যই আজ আমি এই ডকের উপর দাঁড়িয়ে।

যেন কোন্ আকস্মিক বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল একঘর মানুষ—হাকিম, পেস্কার, জুরি, উকিল, মোক্তার ও দর্শকের দল। সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন পাব্লিক প্রসিকিউটর, তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন কোর্টের দরবারে উদ্ধত আসামীর এই অবান্তর এবং অসঙ্গত উক্তির বিরুদ্ধে। হাকিম তখনো নিঃশব্দে চেয়েছিলেন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মুখের দিকে। অপেক্ষা করছিলেন আর কিছু সে বলতে চায় কিনা। কিন্তু শশাঙ্ক আর একটি কথাও বলেনি। হয়ত নিষ্ফল হবে জেনেই বলেনি। বিচারকার্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নীরব থেকে গেছে।

এই মামলার রায় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিনকার মত আদালতের কাজ শেষ হল। বিচারাসন ছেড়ে খাস কামরায় গিয়ে বসলেন জজসাহেব। তারপর সুরু হল নথিপত্র ফাইল বগলে আমলাদের আনাগোনা। মনটা যেন ঠিক পুরোপুরি সজীব নেই। ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অবসাদ বোধ করছিলেন সান্যাল সাহেব। মাঝে মাঝে অতি সাধারণ বিষয়কেও যেন মনে হচ্ছিল ঠিক বোধগম্য নয়। একবার ভাবলেন, আজকের মত এইখানেই থাক। কিন্তু কাজ অসমাপ্ত

রেখে উঠে পড়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কোনদিন যা করেননি, আজও পারলেন না। শেষ আমলাটি যখন ফাইল গুটিয়ে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে, চাপরাসী এসে তার সেই কালির দাগওয়ালা ঝাড়নে বেঁধে নিল দরকারী নথিপত্রের তাড়া। মনিবের দুবেলার খোরাক—আজকের রাত এবং কাল ভোর থেকে বেলা নটা।

জজসাহেব গাড়িতে উঠলেন। কাছারির মাঠ ছেড়ে সদর গেট পার হতে গিয়ে বটগাছের নিচে একটা জটলা চোখে পড়ল। কে একটা মেয়েছেলে নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছে, বলল চাপরাসী। জজ-সাহেবের কানে গেল কথাটা, কিন্তু তার মধ্যে মন দেবার মত বিশেষ কিছু পেলেন না। এ ঘটনা তো প্রায় রোজই ঘটে। হয়তো সন্থ দণ্ডিত কোনো আসামীর স্ত্রী কিংবা মা। আকস্মিক আঘাতটা সামলাতে পারেনি। কী করবেন তিনি? কী করবেন অন্যান্য বিচারক? এ আঘাত অনিবার্য। Law must take its own course. আইনের রথযাত্রা দুর্নিবার। কে পিষে মরল সেই চাকার তলায়, কে ছিটকে পড়ল তার গতিপথের বাইরে, সে তার দেখবার কথা নয়। ন্যায়দণ্ডের গুরুভার বহন করে চলেছেন যে বিচারক তাঁরও এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না।

শহরের একপ্রান্তে ষ্টেশন। তার এলাকা ছাড়ালেই মস্ত বড় খোলা মাঠ। শহর তার লোলুপ বাহু বিস্তার করে দুর্বার বেগে এগিয়ে এলেও এখনো তাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু সিঁথির মত একটি পায়ে চলার পথ। প্রত্যহ বেলা পড়ে এলে তারই উপরে দেখা যায় স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধদের একটি ক্ষুদ্র দল। বিচিত্র তাদের চলন-ভঙ্গী। কিন্তু পদচালনা যতই শ্লথ ও অশক্ত হোক, সেটা পুষিয়ে নেন বাক্‌চালনায়। সেখানে রীতিমত প্রাবল্যের লক্ষণ। কিছুক্ষণ ধরে ঐ পথের উপর দিয়ে একটা বাক্যের

ঝড় বয়ে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার আগেই কানে মাথায় কাপড় জড়িয়ে লাঠিহাতে তাঁরা প্রস্থান করেন। তারপর সব নির্জন, নিঝুম। মাঝে একবার পাশের লাইন দিয়ে একখানি মেলট্রেনের ধাবমান গর্জনে সচকিতে জেগে উঠে আবার ঝিমিয়ে পড়ে মাঠখানা। সেই সময়ে তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায় একটিমাত্র নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় ব্যক্তির ধীর পদসঞ্চার। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট জজ বসন্ত সান্যাল! জজসাহেবের বন্ধুসংখ্যা নগন্য। যে সময়টুকু তিনি তাদের সঙ্গলাভ করে থাকেন, তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু লোকালয়ের আলো ও কোলাহলের বাইরে এই নিরালা মাঠটির নিবিড় সঙ্গ তাঁকে প্রতি সন্ধ্যায় আকর্ষণ করে।

অন্যদিনের তুলনায় সেদিনকার নৈশ ভ্রমণ অনেকখানি দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল। মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, খেয়াল করেননি। বাড়ি ফিরবার পথে গতিবেগটা একটু বাড়িয়ে দিলেন। গেট পার হতেই আবছায়া অন্ধকারে কে একজন লোক নত হয়ে নমস্কার করল। চিনতে পারলেন না। বললেন, কে?

—আজ্ঞে হুজুর, আমি সনাতন।

—কী চাই?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, মেয়েটাকে বাঁচানো গেল না হুজুর।

—কার কথা বলছ? কোন্ মেয়েটা?

—রাধা; শশাঙ্ক মণ্ডলের বৌ।

চমকে উঠলেন জজসাহেব। জানতে চাইলেন, কী হয়েছিল?

—কী আর হবে? বিষ খেয়েছিল হতভাগী।

—সান্যাল সাহেব স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর কোনো প্রশ্ন করলেন না, হয়তো করবার মত প্রশ্ন আর ছিল না। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সনাতন ধীরে ধীরে বলতে লাগল,

মকবুল চৌধুরীর ভয়ে এ ক'দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আজ 'রায়' হবে শুনে কাকে নিয়ে যেন কাছারিতে এসেছিল। তখন কি জানি আঁচলে বেঁধে লুকিয়ে এনেছে করবী ফুলের গোটা? জেল হবার খবর শুনেই কখন খেয়ে নিয়েছে। আমরা যখন টের পেলাম তখন কথা জড়িয়ে আসছে। লোকজন ডেকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবু বললেন আর আশা নেই।

গলাটা ধরে এল। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল সনাতন, আমাদের পণ্ডিতমশায়ের কত আদরের মেয়ে রাধা। এই তো সেদিন কত ঘটা করে বিয়ে হল। মেয়ে তো নয় যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা।...

সহসা যেন ধ্যান থেকে জেগে উঠলেন জজসাহেব। বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামীর এই অদ্ভুত উক্তি— 'আমার একমাত্র অপরাধ আমার স্ত্রীর রূপ।' সনাতন কোচার খুঁটে চোখ মুছে জোড়হাত করে বলল, হুজুরের কাছে যেজন্যে এলাম, যদি হুকুম করেন—

ঘরে চল, বলে জজসাহেব বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। চাপরাসী এসে সুইচ্ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। একটা কৌচের উপর বসে পড়ে ওকেও বসতে বললেন। সনাতন বসল না। তেমনি হাতজোড় করে বলল, একটা বছর দুয়েকের মেয়ে আছে রাধার। মরবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলে গেছে, সনাতন কাকা, এই মেয়েটাকে তুমি নিজে হাতে জজসাহেবের কাছে পৌঁছে দিও।

—আমার কাছে! বিস্ময়ের সুরে বললেন মিষ্টার সান্যাল।

—হ্যাঁ, হুজুর, আপনার কাছে। আমি বললাম, এ তুই কী বলছিস রাধা! জজসাহেব একে নিয়ে কী করবেন, কোথায় রাখবেন? আমরা হলাম ছোট জাত। ও বলল, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি খালি দিয়ে এসো; আর আমার নাম করে ব'লো, মেয়ে

হয়ে জন্মেছে হতভাগী। যদি বাঁচে, একদিন বড় হবে। ওর মায়ের মত ওকেও পাছে শকুনে ছিঁড়ে খায়, তাই তাঁর পায়ের তলায় রেখে গেলাম। আমার আর কোনো ভাবনা রইল না।

—মেয়েটি কোথায়? জিজ্ঞাসা করলেন সান্যাল সাহেব।

—ঘুমিয়ে পড়েছিল, আপনার মালীর ঘরে শুইয়ে দিয়েছি। নিয়ে আসবো?

—না, থাক।

সনাতনকে এতক্ষণ যেন ঠিক দেখতে পাননি জজসাহেব। নিবিষ্ট হয়ে ছিলেন, সে কি বলছে, তারই মধ্যে কিংবা তার সেই কাহিনীকে আশ্রয় করে নিজের কোনো গভীর চিন্তার মধ্যে। এবার যখন সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল, হঠাৎ তার দিকে যেন প্রথম নজর পড়ল। বললেন, আচ্ছা, তুমিই কি এই মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী ছিলে?

—ছিলাম, হুজুর। 'সাক্ষী' না দিয়ে উপায় ছিল না কিন্তু ভগবান জানেন, যা বলেছি, কোনোটাই আমার নিজের কথা নয়, শেখানো বুলি। আগাগোড়া সবটাই মিথ্যে।

—'মিথ্যে!'—গভীর বিস্ময়ে কথাটার পুনরুক্তি করলেন জজসাহেব। পরমুহূর্তেই কঠোর স্বরে বললেন, 'আদালতে হলপ করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার ফল কি জানো?'

—জানি হুজুর। জেলে যেতে হয়। কিন্তু মিথ্যা না বললে যা হত, জেল তার কাছে কিছুই নয়। আপনি তো জানেন না, হুজুর, ঐ মকবুল চৌধুরীর কাছে আমার চুল পর্যন্ত বাঁধা। শুধু আমার নয়, আমরা যে কজন তার হয়ে সাক্ষী দিয়ে গেলাম সকলেরই। তাই যা বলতে বলেছে তোতাপাখির মত আউড়ে গেছি। আজ নয়, আরো কতবার এ কাজ করতে হয়েছে; বেঁচে থাকলে এর পরেও হবে। ঐ লোকটা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

গভীর বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন জজসাহেব। অম্লান বদনে এত বড় অপরাধের এমন সরল স্বীকারোক্তি কেউ কখনো করে যেতে পারে, এটা তাঁর ধারণার অতীত। তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক বলছ, আমার কোর্টে যে জবানবন্দি দিয়ে গেছ, তা সত্য নয়? শশাঙ্ক মণ্ডল ডাকাতি করেনি, ডাকাতি করতে গিয়ে জখম করেনি ঐ চৌধুরীকে?

—'আদালতে যাই বলে থাকি, হুজুর', গভীর সুরে বলল সনাতন, 'বিশ্বাস করুন, এখানে আপনার কাছে কোনো কথাই আমি লুকোবো না। ডাকাতি সে করেনি, করতে পারে না। গোটা মামলাটিই সাজানো।'

—কিন্তু ঐ জখমটা?

—ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছিল। সেই ঘা-টাকেই কাজে লাগিয়ে দিল। অনেকদিনের আক্রোশ ছিল শশাঙ্কর ওপর, তাও মিটিয়ে নিল ঐ সঙ্গে। সব চেয়ে বড় লাভ, পথের কাঁটা সরে গেল। কিন্তু—

—শশাঙ্কের ওপর আক্রোশটা কিসের? বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন জজসাহেব।

—কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সেই কথাই বলতে চেয়েছিল শশাঙ্ক। হয়তো ইচ্ছা করেই বলেনি; ভেবেছে কোনো লাভ নেই বলে, কিংবা সরকারী উকিলের ধমক খেয়ে আর সাহস করেনি। সব আক্রোশের মূলে ওর বৌ।...মরে বেঁচে গেল মেয়েটা। নয়তো আরো কত লাঞ্ছনা ছিল ওর কপালে।

জজসাহেব নিবিষ্ট মনে কি ভাবছেন দেখে একটু অপেক্ষা করল। তারপর আবার বলল, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই আমার জানা। হুজুরের হুকুম পেলে খুলে বলতে পারি।

মিষ্টার সান্যাল মাথা তুলে চাইলেন। তাঁর নীরব অনুমতি পেয়ে

তার নিজের ভাষায় ও ধরনে যে কাহিনীটা বলে গেল সনাতন, তাকে সংক্ষেপ করলে এই রকম দাঁড়ায়।

রাধার উপর চৌধুরীর নজর ছিল—অনেক দিন আগে থেকেই। ওরা তা জানত এবং যথাসম্ভব সাবধান হয়ে চলত। চৌধুরীদের পুকুর ছাড়া গ্রামে আর কোন ভাল জলাশয় নেই। সকালে বিকালে ওখান থেকেই বৌ-ঝিদের জল আনতে হয়। রাধাকেও যেতে হত। কিন্তু যখনই যেত, দলবেঁধে, পাড়ার দুচারজন বর্ষীয়সীর সঙ্গে। একদিন কাজকর্মে দেরি হয়ে গেল। সঙ্গিনীরা তার আগেই পুকুরের কাজ সেরে এসেছে, এদিকে কলসিটা একদম খালি। শশাঙ্কও বাড়ি নেই। বাধ্য হয়ে একাই যেতে হল। ঘাট একেবারে জনশূন্য। সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। ভয়ে ভয়ে কোনরকমে ঘড়াটা ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি খেজুর গাছের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে, পাড়ের ঠিক সামনেই মকবুল চৌধুরীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। শশব্যস্তে আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে একপাশে সরে যেতেই, মুচকে হেসে বললেন চৌধুরী, কী খবর; আজ যে একেবারে একা?

রাধা জবাব দিল না। চৌধুরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঈস্; বড্ড রোগা হয়ে গেছ দেখছি! শশাঙ্ক কী করছে আজকাল?' উত্তর না পেয়ে আবার বললেন, আমাকে দেখে এত লজ্জা কিসের? আমাদের শশাঙ্কর বৌ তুমি।

পুকুরের পাড় দিয়েই গ্রামের রাস্তা। কারা যেন যাচ্ছিল কথা বলতে বলতে। সাড়া পেয়ে আস্তে আস্তে সরে গেলেন চৌধুরী। রাধাও একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ি গিয়ে পৌঁছল। স্বামী একরোখা মানুষ, পাছে এই নিয়ে অতবড় প্রভাবশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধিয়ে বসে, সেই ভয়ে তাকে কোনো কথাই জানাল না।

দিন দুয়েক পরেই শশাঙ্কর ডাক পড়ল চৌধুরী সাহেবের বৈঠক-খানায়। খানিকটা অপ্রত্যাশিত খাতির আপ্যায়নের পর অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করছ, টরছ ?

—বিশেষ কিছু করছি না।

—এক কাজ কর না কেন ? যদ্দিন অন্য কিছু না পাও, আমার এই লগ্নি কারবারটা একটু দেখাশোনা কর।

—আপনার তো লোক রয়েছে।

—কার কথা বলছ, সরকার মশাই ? উনি কিছুদিন থেকে বাড়ি যাবো যাবো করছেন। ভাবছি, মাসতিনেকের জন্যে ছেড়ে দেবো। তদ্দিন তুমি চালিয়ে দাও। তারপর যদি ভালো লাগে মনে কর, পাকাপাকি ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

মনে মনে আশ্চর্য হলেও শশাঙ্ক আপত্তি করল না। প্রয়োজনের তাগিদও ছিল। পরের সপ্তাহ থেকেই গোমস্তার পদে বহাল হয়ে গেল। কয়েকদিন পরেই জানতে পারল, যার জায়গায় তার চাকরি, বেচারা বংশী সরকার কখনই ছুটি চায়নি, ছুটিটা তার উপর জোর করে চাপানো। জেনেও কিছু করবার ছিল না। সরকার তখন চলে গেছে। তার উপর এই অতিরিক্ত অনুগ্রহের জন্যে আর এক দফা বিস্ময় দেখা দিল শশাঙ্কের মনে।

কয়েক দিন পরেই তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন চৌধুরী, কী হাল করেছ বৌটার ! দেখে চেনা যায় না। এ বয়সে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া, একটু আমোদ-আহ্লাদ, বেড়ানো-টেড়ানো,—এ সব না হলে মেয়েমানুষের শরীর থাকে ? মাঝে মাঝে পাঠাও না কেন আমার বাড়ি ?

শশাঙ্ক মনে মনে রুখে উঠলেও বাইরে যথাসম্ভব শান্ত ভাব বজায় রেখেই বলল, আপনার আর কিছু বলবার আছে ?

—আহা চটছ কেন ? লোকে জানলে নিন্দে হবে ভাবছ ? কেউ

জানবে না। একটু রাত করে বাঁদী পাঠিয়ে দেবো। চুপচাপ চলে আসবে। বলতো পালকিও পাঠাতে পারি।

এর পরে শশাঙ্ক মণ্ডলের মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব হল না। বেশ গোটা কয়েক কড়া কথা শুনিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিল। চৌধুরী কথাগুলো গায়ে না মেখে তখনো বোঝাবার চেষ্টা করলেন, গোঁয়াতুর্মি করো না। তোমার সুবিধের জন্যেই বলছি। ঐ সরকার ব্যাটা আর আসবে না। বরাবরের মত তুমিই রইলে। তাছাড়া টাকা পয়সা যখন যা দরকার—

কথাটা শেষ করবার আগেই চলে যাচ্ছিল শশাঙ্ক। চৌধুরী সাহেব একটু ক্রুর হাসি হেসে বললেন, আচ্ছা, সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠল না, আঙুলটা একটু বেঁকিয়েই তুলতে হবে।

—তার মানে? যেতে যেতে রীতিমত রূঢ় ভাবেই জানতে চেয়েছিল শশাঙ্ক।

—মানে, বিবিকে পালকি চড়াতে যখন রাজী নও, তখন চুলের মুঠি ধরেই আনবার ব্যবস্থা করবো।···বলে, বেশ কিছুক্ষণ টেনে টেনে হেসেছিলেন চৌধুরী। শশাঙ্কের সমস্ত দেহটা জ্বলে উঠলেও, নিষ্ফল ক্ষোভ বুকে চেপে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

অন্য সকলের মত শশাঙ্কেরও অজানা ছিল না যে, মকবুল চৌধুরী আর যাই করুক মিথ্যা আস্ফালন করে না। রাধাকে নিয়ে সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। বিপদটা যে কখন কি ভাবে এসে পড়বে, সেই ভাবনায় স্বামী-স্ত্রীর ঘুম চলে গেল। কিন্তু যা আশঙ্কা করছিল তা ঠিক হল না। বিপদ এল বাঁকা পথ ধরে। হঠাৎ একদিন জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মকবুল চৌধুরীর দাঙ্গা বেধে গেল তার ছোট ভাই সামসুল চৌধুরীর সঙ্গে। অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবার দরুণ ছোটতরফের আক্রোশ বেশি, এদিকে বয়স কম।

সুতরাং আঘাতের ভাগটা বেশি গিয়ে পড়ল মকবুলের উপর। হাতে পায়ের চোটগুলো তেমন কিছু নয়, কিন্তু মাথার জখমটা মোটামুটি গুরুতর। খবর শুনে অন্য সকলের সঙ্গে শশাঙ্কও মনে মনে খুশী হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কল্পনাও করতে পারে নি, লাঠিটা মকবুল চৌধুরীর মাথায় পড়েনি, পড়েছে তার নিজের মাথায়। ঐ জখমটাকে অবলম্বন করে, এবং তার সঙ্গে একটা ডাকাতি জুড়ে দিয়ে, ডাক্তার পুলিশ সাক্ষী সাবুদের আনুকূল্যে নিখুঁত নৈপুণ্যের সঙ্গে এমন একটি ফাঁদ তৈরী হল শশাঙ্ক মণ্ডলের জন্যে, যার মুখ থেকে তাকে বাঁচাতে পারে এমন সাধ্য ভগবানেরও নেই।

মকবুল চৌধুরীর কথার কোনোদিন নড়চড় হয় না। শশাঙ্ক যেদিন হাজতে চলে গেল, তারপরেও অনেক দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিল মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত আর পারেনি। হাসপাতালে নেবার পর সনাতন যখন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'এ তুই কী করলি রাধা? শেষকালে আত্মঘাতী হয়ে মরলি!' সে বলেছিল, মরণ কি আর বাকী আছে সনাতন কাকা? যেদিন মুখ বেঁধে ধরে নিয়ে গেল, সেইদিনই তো মরেছি। তারপরেও এই দেহটা নিয়ে ঐ শেয়াল-কুকুরগুলো টানাটানি করবে, সে যন্ত্রণা আর সইল না। তাই ওদের হাতের বাইরে চলে গেলাম।

মানুষের জীবনে এক একটা করে দিন আসে এবং চলে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাৎপর্যহীন, গতানুগতিক কালক্ষেপ মাত্র। শেষ দিনটার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের কাজ। জীবনের পাতায় এরা কোনো স্বাক্ষর রেখে যায় না। হঠাৎ কখনো এমন এক-একটি দিন আসে এমন এক-একটি ক্ষণ, অতি ক্ষুদ্র হলেও সে জীবনের মূল ধরে টান দেয়। বসন্ত সান্যালের জীবনে দেখা দিল সেই মহা-সন্ধিক্ষণ। সেই একটি রাত তার অদৃশ্য বাহুর প্রচণ্ড আকর্ষণে

একজন প্রবীণ, প্রাঁজ্ঞ, স্থিতধী বিচারকের সুনির্দিষ্ট জীবনধারাটিকে সবলে টেনে নিয়ে গেল অকল্পিত অনিশ্চয়ের পথে, ভূমিকম্পের বিপুল শক্তি যেমন করে একটি মুহূর্তে বদলে দিয়ে যায় অনাদিকালের নদীস্রোত।

সনাতন যে পথ দিয়ে চলে গেল সেই দিকে কিছুক্ষণ অন্য মনে চেয়ে রইলেন জজসাহেব। তারপর মালীকে ডেকে মেয়েটির সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের একপাশে তার ঘর। স্ত্রীও থাকে তার সঙ্গে। ছেলেপিলেরা বড় হয়ে গেছে। আপাততঃ বাচ্চাটির দেখাশোনার ভার নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন নয়। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, যতদিন অন্য ব্যবস্থা না হয় এ ভার নিতে ওরা রাজী আছে কিনা। মালী সম্মতি জানাল। কিন্তু তার মধ্যে তার অনিচ্ছার সুরটুকু চাপা রইল না। বুঝতে পেরেও জজসাহেবের এ ছাড়া অন্য কোনো পথ আপাততঃ চোখে পড়ল না। মালী এবং মালীবৌকে উপযুক্ত বকশিশের ভরসা দিলেন এবং চাপরাসীকে ডেকে তখনই ওদের হাতে কিছু খরচপত্র দেবার ব্যবস্থা করলেন। যতশীঘ্র সম্ভব মেয়েটিকে অন্য কোথাও পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হবে, এ আশ্বাসও দেওয়া হল।

রাত্রির নিভৃত অন্ধকারে নিজেকে যখন একান্তে পাবার সুযোগ পেলেন সান্যাল সাহেব, এই আত্মঘাতিনী নারী এবং তার লাঞ্ছিত জীবনকে ভিত্তি করে নানা প্রশ্ন তাঁর মনে জেগে উঠল। বিচারের আদর্শ কী এবং তার কতখানি তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন? দুটি বিবদমান পক্ষ যখন বিচারকের কাছে উপস্থিত হয়, তাদের উভয়েরই লক্ষ্য—নিজের উক্তিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই পরস্পর-বিরোধী ঘটনা-সজ্জা এবং বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়ে প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করাই ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য। তার জন্যে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে হয়, নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্য দিয়ে যে তথ্য তাঁর সামনে উপস্থিত করা হল তারই গণ্ডীর মধ্যে।

সাক্ষীর বিবৃতিকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবার অধিকার তাঁর আছে, কিন্তু তার বাইরে যাবার অধিকার নেই। সত্য নির্ধারণের এই যে বিধিনিবদ্ধ পথ, এটা কি প্রতিক্ষেত্রেই নির্ভুল ও অব্যর্থ? এই পথ ধরে গেলেই কি ন্যায়বিচারের একমাত্র কাম্য বস্তু যে সত্য, তাকে লাভ করা যায়? অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে তা যায় নি। চিরাচরিত বিচার-পদ্ধতিকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেও যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন, তার সমস্ত ভিত্তিমূল দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যার উপর। কিন্তু কী করবেন তিনি? বিচারক এখানে সম্পূর্ণ অসহায়। মনে পড়ল একজন পুলিশ কর্মচারীর কথা, যিনি দম্ভভরে প্রচার করতেন, সাক্ষী আপনা থেকে জন্মায় না, তাকে তৈরি করতে হয়। এমনি কত তৈরি-করা সাক্ষীর উক্তির উপর দাঁড়িয়ে বিচারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এমন ব্যক্তিকে দণ্ড দেন, উপস্থাপিত অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলেও, সে নির্দোষ। অনেক সময় এটা বুঝতে পেরেও তিনি নিরুপায়। কোন একটা উক্তি যে মিথ্যা সে কথা মনে মনে উপলব্ধি করলেই চলবে না, তাকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করবার উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। কোথায় তার গলদ, কোথায় তার অসঙ্গতি, কেন সেটা অবিশ্বাস্য, স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহভাবে না দেখিয়ে তাকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। কিন্তু এমন কত সুনিপুণ মিথ্যার ব্যবসায়ী আদালতের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, নগ্ন অসত্যকে পূর্ণাঙ্গ সত্যের সাজ পরিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচারকের সূক্ষ্ম এবং সতর্ক দৃষ্টিকেও যারা অনায়াসে বিভ্রান্ত করতে পারে।

আরো একটা দিক দিয়ে বিচারকের পথ সীমাবদ্ধ। তথ্য নির্ধারণের ভার জুরীর হাতে। কোন্‌টা 'ফ্যাক্‌ট্‌' আর কোন্‌টা 'ফ্যাক্‌ট্‌ নয়' সে সম্পর্কে জুরীদের অভিমত জজকে গ্রহণ করতে হয়। কোনো বিষয়ে সন্দেহ করবার ন্যায়সঙ্গত কারণ যদি থাকে, সেটা তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন এই পর্যন্ত, তার বেশি যেতে পারেন না।

এসব সমস্যা সান্যাল সাহেবের মনে আজ নতুন দেখা দেয়নি। এর আগেও দিয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ চিন্তা তাঁর মনকে আজ পীড়িত করে তুলছিল তার সূত্র আলাদা। সনাতন যে-কাহিনী তাকে শুনিয়ে গেল, তার কতটা সত্য তিনি জানেন না। যদি এইটাই এ মামলার প্রকৃত ঘটনা হয়ে থাকে, সেকথা তাঁর জানবার উপায় ছিল না। যে তথ্য তিনি পেয়েছিলেন তারই উপর ভিত্তি করে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তার জন্য যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, নিজেকে তিনি দায়ী করতে পারেন না। কিন্তু একথা তিনি নিজের কাছে অস্বীকার করেন কেমন করে যে তাঁর অন্তরের নিভৃতে দ্বিধা জেগেছিল ---আদালতে যে ঘটনা বর্ণিত হল, তার পেছনে হয়তো কারো কোনো অলক্ষ্য হাত আছে। যে চিত্র উদ্ঘাটিত হল, নিখুঁত এবং নিশ্ছিদ্র হলেও হয়তো তার মধ্যে মিশে আছে কোনো সুদক্ষ শিল্পীর তুলি। সে অন্তরালেই রয়ে গেল। এই সংশয়কে তিনি আমল দেননি; নিজের মনের দুর্বলতা বলে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছেন এটা সেই সাক্ষাতের ফল। এর পেছনে আর' কোনো ভিত্তি নেই, আছে শুধু একটি বিপন্না নারীর সকরুণ অশ্রুজল; যে-কাহিনী সে বলতে এসেছিল, তারই সূত্র ধরে সেই মেয়েটির উপর অবচেতন মনের করুণা। তারই থেকে এ দ্বিধা ও সংশয়। কিন্তু সে প্রভাব থেকে তাঁর বিচারবুদ্ধিকে মুক্ত রাখতে হবে। তিনি বিচারক। বিচারাসনে যতক্ষণ অধিষ্ঠিত ততক্ষণ কারো প্রতি কোনো দয়া মায়া স্নেহ বা সহানুভূতি যেন তাঁকে কোনোক্রমে বিচলিত না করে।

এই একটিমাত্র চিন্তাকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন জজসাহেব। নিজের অন্তরের এই দুর্বল স্থানটির সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিলেন; যেন সে তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে। রাধার কথা যখনই মনে হয়েছে তখনই তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে তার স্বামীর উপর কঠোর হয়ে উঠেছেন। এই মেয়েটির সঙ্গে যদি তাঁর দেখা না হত, তার

চোখের জলে-ভেজা গুটিকয়েক কথা যদি তাঁর কানে না আসত, তাহলে হয়তো আসামীকে তিনি খোলা চোখে দেখবার সুযোগ পেতেন, খোলা মন নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারতেন তার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের যা কিছু বক্তব্য, সরকারী উকিলের ভাষণ ও ভাষ্য এবং সাক্ষীদেব বর্ণনা। তার উপরকার মিথ্যার আবরণ হয়তো তাঁর শাদা চোখে ধরা পড়ত। কিন্তু সে চোখ, সে মন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সংস্কার-মুক্ত, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে আসামীর দিকে তাকাতে পারেননি। পাছে তার প্রতি কোনো পক্ষপাত প্রকাশ পায়, তার স্ত্রীর অশ্রুধারার পথ বেয়ে পাছে তার প্রতি মনটা কোমল হয়ে ওঠে, এই আশঙ্কা তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, কেবলমাত্র ঐ কারণেই তিনি যে এই লোকটার উপর অহেতুক কঠোরতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন সে দিকটা একেবারেই নজরে পড়েনি।

এই জাতীয় দৃষ্টান্ত তিনি আগেও পেয়েছেন,—বিচারক মাত্রেই পেয়ে থাকেন—দেখেছেন মামলার গতি আগাগোড়া ফরিয়াদী পক্ষের অনুকূল ; এজাহার থেকে শেষ সওয়াল, কোথাও কোনো ফাঁক নেই ; সাক্ষ্য নিটোল, প্রমাণ অকাট্য, জেরা তার কোনখানে ফাটল ধরাতে পারেনি ; বরং আইনের সেই বিশেষ ধারাটিকে সুগম করেদিয়েছে আসামীর উকিলের কোনো নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণের অতীত তাঁর যে নিজস্ব অনুভূতি, যাকে বলা যেতে পারে স্বজ্ঞা, তার দৃষ্টিতে লোকটা নিরপরাধ। তাই বলে আইনের অমোঘ দণ্ডের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেননি। মনে মনে ব্যথিত হয়েছেন। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন—এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বিচারাসনে বসে আইন প্রয়োগের গুরুভার হাতে নিয়ে তারই চিহ্নিত পথে তাঁকে চলতে হবে, নিজের অন্তরের নির্দেশ অনুসরণ করবার তাঁর অধিকার নেই।

আজ আর সে সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন না। বিচারে কোনো ত্রুটি

হয়নি, জুরীর রায় অভ্রান্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে যে অপরাধ সাব্যস্ত হল, তার প্রাপ্য দণ্ডই দিয়েছেন আসামীকে—এই কথাগুলো দিয়েই নিজের মনকে আজ শান্ত করতে পারলেন না। সব যুক্তি ছাপিয়ে সমস্ত তর্ক আলোচনা ডুবিয়ে দিয়ে অন্তরের গভীরে জেগে উঠল একটি নিপীড়িতা নারীর মরণাহত মুখ। তার কোলের কাছে অনাদরে পড়ে আছে একগুচ্ছ পদ্মকোরকের মত একটি অসহায় শিশু, সংসারে যার কোনো আশ্রয় নেই, কোনো অবলম্বন রইল না। এইটুকুই সব নয়। এই করুণা এবং বেদনাবোধকে অতিক্রম করে, তার সমস্ত চিন্তাকে মথিত করে দেখা দিল এক পরম বিস্ময়। কী আশ্চর্য সেই নারী! যে হৃদয়হীন বিচারক তার সামান্য আবেদনটুকু না শুনেই রূঢ় ভাবে তাকে বিদায় করে দিয়েছে, মিথ্যা অভিযোগে তার স্বামীকে দিয়েছে অন্যায় দণ্ড, আর তাকেও ঠেলে নিয়ে গেছে চরম লাঞ্ছনা এবং শোচনীয় মৃত্যুর কবলে, তারই হাতে সে সঁপে দিয়ে গেল আপানর একমাত্র স্নেহের ধন। দিয়ে নিশ্চিন্ত হল, শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে বলে গেল—আমার আর ভাবনা নেই!

সকাল হল। কিন্তু রোজ যেমন হয় তেমন করে নয়। অন্যদিন চাকর বাকরেরা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পায়, একতলার আপিস ঘরের টেবিলে আলো জ্বলছে। তার নিচে মোটা মোটা খোলা বই। তারই উপরে ঝুঁকে আছে একখানা সৌম্য শান্ত ধ্যানমগ্ন মুখ। উজ্জ্বল আলোর পাশে আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা সেই নিষ্পন্দ মূর্তিটির দিকে চেয়ে তাদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে মিশে থাকে কী একরকমের ভয়। তারা নিঃশব্দে চলাফেরা করে, কথা বলে ইসারায় কিংবা ফিসফিস করে। তারপর বেলা বাড়ে। ঠাকুর এসে একফাঁকে রেখে যায় এক বাটি গরম দুধ—জজসাহেবের প্রাতরাশ। আর একটু বেলা হলে তার ছোট্ট খাতাটি হাতে নিয়ে দেখা

দেয় স্টেনোগ্রাফার অতীশ। নটা বেজে পনর মিনিট পর্যন্ত চলে শ্রুতিলিখন।

আজ সব ওলট পালট হয়ে গেল। অনেক রাত অবধি জেগে থাকলেও ঘুম ভাঙল সেই একই সময়ে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করল না। সারা দেহে ক্লান্তি, সমস্ত মন অবসাদে ভরা। অসাড় হয়ে পড়ে রইলেন বিছানায়। বেলা বাড়তে লাগল। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে মেঝের উপর। ঘরের বাইরে যারা যথাসম্ভব সন্তর্পণে চলা ফেরা করছে, তাদের পায়ের শব্দে উদ্বেগের চাঞ্চল্য। সব লোক-গুলোকে ভাবিয়ে তুলেছেন দেখে মনে মনে লজ্জিত হলেন সান্যাল সাহেব। উঠতে যাবেন এমন সময় দরজার বাইরে চাপরাসীর গলা শোনা গেল, কুণ্ঠা ও উৎকণ্ঠায় ভরা, 'হুজুর!' 'ভেতরে এসো।' মনিবের অনুমতি পেয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে নিবারণ এসে সেলাম করে দাঁড়াল। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, হুজুরের শরীরটা কি ভাল নেই? ডাক্তার সাহেবকে খবর দেবো?

—না, ডাক্তার ডাকবার মত কিছু নয়। তুমি এক কাজ কর। আমি মিনিট কয়েকের মধ্যেই মুখ ধুয়ে নিচ্ছি। ঠাকুরকে বল আমার দুধটা যেন এই ঘরেই দিয়ে যায়।

—যে আজ্ঞে, আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নিবারণ দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছিল। জজসাহেব ডেকে ফেরালেন, আর শোনো। অতীশ এসেছে কি?

—আজ্ঞে, এইমাত্র এলেন।

—মিনিট পনের পরে তাকে ওপরে আসতে ব'লো।

বিছানায় উঠে বসতেই বুকের বাঁ দিকটায় সেই পুরনো ব্যথাটা আবার টের পেলেন সান্যাল সাহেব। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেন। সামান্য মনে করে এই ব্যথাকে এতদিন আমল দেননি। সে অবহেলার শোধ নিতেও সে ছাড়েনি। অনেকদিন অনড় হয়ে পড়ে থাকতে

হয়েছিল রোগশয্যায়। তার ফলে ছুটিগুলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজ চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে এল। এই আসন্ন অবসরের মুখে আবার নতুন করে শুয়ে পড়বার অবসর কোথায়? মাথার উপর বৃহৎ সংসার। তার খানিকটা বোঝাও যে কাঁধে তুলে নেবে এমন কেউ এখনো পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বড় ছেলেকে বিলাত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পেনশন নেবার আগেই ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসবে এই ছিল আশা। কোনোটাই হয়নি। ব্যারিস্টার হতে পারেনি, ফিরেও আসে নি। কী হয়েছে, কিংবা কিছু একটা হয়েছে কিনা, তাও তিনি জানেন না। তাছাড়া যেটুকু জানেন, অর্থাৎ সাগরপার থেকে কানাঘুষায় ঢেউ বেয়ে মাঝে মাঝে যে-সব খবর কানে এসে পৌঁছায়, তা কাউকে বলবার মত নয়। শুধু কানাঘুষাই বা কেন, কোনো বিলাত-প্রবাসী বন্ধুর চিঠিতে সব স্পষ্ট করেই জানতে পেরেছেন। মায়ের আশঙ্কা হল তাঁর সোনার চাঁদ ছেলে পাছে কোনো বিদেশিনী ডাইনীর কবলে পড়ে যায়, তাই বিদেশ যাত্রার আগে তার গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বর্গত সুহৃৎ ও সহকর্মী পরেশের একমাত্র সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু কবচ কার্যকরী হয়নি। পুত্রবধূর ম্লান মুখখানা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথাটাও যেন হঠাৎ বেড়ে উঠল।

অতীশ আসতেই শোবার ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ডিক্টেশন সুরু করলেন। বেশিদূর এগোতে পারলেন না। ব্যথাটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। খানিকক্ষণ পরেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই পর্যন্তই থাক। আজকের মত তুমি এসো। যাবার পথে সিভিল সার্জনকে বলে যেও যেন সময় করে একবার আসেন।

অতীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকে তাহলে কোর্টে যাওয়াও বন্ধ করে দিন, স্যার।

—হ্যাঁ; বন্ধ করতেই হল, দেখছি। আফিসে জানিয়ে দিও, জরুরি কাগজ-পত্তর যেন এখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অতীশ তাড়াতাড়ি চলে গেল এবং তার কিছুক্ষণ পরেই সিভিল সার্জন এসে পড়লেন। যথারীতি পরীক্ষাদির পর পুরোপুরি বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিলেন। ওষুধ পথ্যাদির ব্যবস্থাও করে গেলেন।

একা পড়তেই আবার সেই আগেকার চিন্তাসূত্রে ফিরে গেলেন জজসাহেব। ছোট ছেলে সবে মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করেছে, এখনো পশার গড়ে ওঠেনি। দুটি মেয়ের মধ্যে একটিকে পার করতে পেরেছেন। সুযোগ্য পাত্রেই দিয়েছেন। মস্তবড় ব্যবসায়ী ফার্মের জুনিয়র পার্টনার। কলকাতায় বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। কিন্তু মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরে তার মুখ দেখে মনে হয়, পাত্রের যোগ্যতাটাই সব নয়, আরো কিছু আছে যা হয়তো পায়নি মেয়েটা। এখানেও তিনি নিরুপায়। ছোট মেয়েটি এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে। তারপর তাকেও কারো হাতে সঁপে দিতে হবে। এখনো অনেক কর্তব্য সারা হয়নি, অনেক দায়িত্ব অপূর্ণ রয়ে গেছে। অথচ দিন আর বেশি নেই।

হঠাৎ নিচে থেকে ভেসে এল একটি শিশুর কান্না। মুহূর্ত মধ্যে যেন একটা অন্য জগতে চলে গেলেন জজসাহেব। এই ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দুঃখ-দুর্ভাবনা স্বার্থ-সমস্যার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে এক বহু-বিস্তৃত বেদনাময় জগৎ। ঐ শিশুটিই যেন তার প্রতীক, ঐ কান্নাই যেন তার সুতীব্র আহ্বান।

নিবারণকে ডেকে মেয়েটিকে উপরে আনতে বলে দিলেন। মালী কোলে করে তাঁর ঘরের দরজার গোড়ায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। পরনে সামান্য একটা আধময়লা সুতি জামা; খালি পা। ততক্ষণে কান্না থেমে গেছে। কচি গালবেয়ে গড়িয়ে-পড়া জলের রেখা কেউ মুছিয়ে দেয়নি। ভয় ও বিস্ময় ভরা ভাসাভাসা দুটি চোখ। জজ-সাহেব স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাতে তুড়ি দিলেন। গোলাপের পাপড়ির মত রক্তাভ ঠোঁট দুখানি হাসির দোলায় ফাঁক হয়ে গেল।

বেরিয়ে পড়ল কটি ছোট ছোট মুক্তার দানা। সখ্যময় অন্তরঙ্গ হাসি। এই গুরুগম্ভীর প্রবীণ মানুষটি যেন ওর কতদিনের চেনা। সান্যাল সাহেবের মনে পড়ল অনেক বছর পিছনে-ফেলে-আসা তাঁর প্রথম চাকরি-জীবনের দিনগুলো। সাতকানিয়া বলে একটা ছোট জায়গায় মুন্সেফি করতেন। তাঁর প্রথম সন্তান ভাস্কর তখন এতটুকু কিংবা এর চেয়ে সামান্য কিছু বড়। রোজ কোর্ট থেকে ফিরতেই তারও চোখে মুখে ভেসে উঠত এমনি একটি মধুময় হাসির অভ্যর্থনা। যতক্ষণ এজলাসে থাকতেন নানা কাজের মধ্যে এরই জন্য মনটা তৃষিত হয়ে থাকত। বহুকাল পরে সেই তৃষ্ণা যেন হঠাৎ নতুন করে অনুভব করলেন। চেয়ারের উপর থেকেই দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন। মেয়েটি কিছুমাত্র আপত্তি না করে টলতে টলতে এগিয়ে গেল, ঠিক যেমন করে আসত ভাস্কর, আর তিনি কোর্টের পোশাকেই তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

সান্যাল সাহেবের মনে পড়ল, কবে কোথায় যেন পড়েছেন, জীবনকে যদি গাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়, শিশু হচ্ছে তার কিশলয়। শুষ্ক শাখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এরাই নিয়ে আসে নতুন প্রাণের বার্তা। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়', শিশুর মত 'করুণাধারা' আর কিছু নেই। ঐ দুটি ক্ষুদ্র মুঠি থেকে ঝরে পড়ে যে অমৃত তার আস্বাদ পায় বলেই মানুষ বেঁচে আছে, তার প্রাণে আছে সরসতা। তা না হলে কোথায় থাকত জীবনের এই শ্যামল তরুচ্ছায়া? সমস্ত সংসারটা মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করত।

এই পরম সত্যটি তিনি নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম যৌবনের আবেগ-প্রবাহ কেটে যাবার পর স্ত্রীর কাছ থেকে যখনই একটু দূরে সরে এসেছেন একটির পর একটি শিশুসন্তান এসে নতুন করে রচনা করেছে তাঁদের দাম্পত্য জীবনের গ্রন্থি। আজ তারা বড় হয়ে গেছে, সে গ্রন্থিও শিথিল। সংসার যেমন যেমন বেড়েছে,

সেই সঙ্গে বেড়েছে সকলের কাছ থেকে তাঁর দূরত্ব। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জগৎ থেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন বসন্তবাবু। বলতে হয়তো রূঢ় শোনাবে, তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজ সংসারের সঙ্গে তাঁর প্রধান কিংবা একমাত্র যোগসূত্র অর্থনৈতিক। সেখানে তিনি শুধু যন্ত্র—একটি অত্যাবশ্যক যন্ত্র, যার কাজ চাকাগুলোকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই চলমান বস্তুটির মর্মস্থলে তাঁর কোনো স্থান নেই। কতদিন লক্ষ্য করেছেন, মাকে ঘিরে ছেলেমেয়েদের গল্পের আসর মুখর হয়ে উঠেছে, তিনি গিয়ে যোগ দিতেই তার স্বাচ্ছন্দ্যের সুরটুকু কেটে গেছে। ছেঁড়া তার আবার নতুন করে জুড়বার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জোড়া লাগেনি। তারপর কোনো একটা উপলক্ষ্য দেখিয়ে একজন একজন করে সবাই উঠে গেছে। স্ত্রী হয়তো রয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর কথায় কিংবা আচরণে মুহূর্ত-পূর্বের সেই অকারণ আনন্দের স্পর্শ আর পাওয়া যায়নি, তার বদলে কর্কশ হয়ে বেজেছে হয়তো কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের শুষ্ক প্রসঙ্গ। অথচ ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার তাঁর কিছুই নেই! তারা ভদ্র, অনুগত, শ্রদ্ধাশীল; বাপকে সমীহ করে চলে, হয়তো খানিকটা ভয়ের চোখে দেখে। কিন্তু যে সখ্য ও প্রীতির স্পর্শ পারিবারিক জীবনে মাধুর্য বয়ে আনে; তার স্বাদ থেকে তিনি আজ বঞ্চিত। এরা যখন ছোট ছিল, বাবা-মাকে নিয়েই ছিল এদের জগৎ। এখন তা আশা করা যায় না। তাদের দিগ্বলয় বিস্তৃত হবে এইটাই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। তাই বলে ওদের অন্তরের কোণ থেকে তিনি বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, তাই বা কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? সন্তানের কাছে শুধু বাপ হতে কে চায়? তিনি অন্ততঃ চাননি, বন্ধু হতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। হয়তো এই ব্যর্থতার বীজ রয়েছে তাঁর নিজেরই মধ্যে। যে-কারণেই হোক, সবাইকে জড়িয়ে যে সহজ ছন্দোময় অন্তরঙ্গ পারিবারিক জীবন তিনি

কামনা করেছিলেন, তার থেকে তিনি দূরেই রয়ে গেছেন। সেখানে ফিরে যাবার আর কোনো পথ নেই।

ছেলেমেয়েরা যখন আসেনি, তখন যিনি ছিলেন একমাত্র, যাঁকে নিয়ে একদিন অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন, তাঁকে আজ জীবনের মধ্যে খুঁজে পান না। সেই অভাব তাঁকে অহরহ পীড়া দেয়, মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন কোনো শক্তি বা প্রেরণা নিজের মধ্যে অনুভব করেন না, যা দিয়ে সেই একজনকে আবার একান্ত কাছটিতে ফিরিয়ে আনা যায়। বলা যায়, তিরিশ বছর আগে যে কথা তিনি অতি সহজেই বলতে পেরেছিলেন, "আমার জীবনে যেখানে যা ছিল অপূর্ণ, সবটুকু জুড়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। তোমার মধ্যে আমি সব পেয়েছি।" তিরিশ বছর আগেকার সেই দিনটির সঙ্গে আজকের কী দুস্তর ব্যবধান! কোনো উপায়েই আর সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না।

রাধার মেয়েটি নিজের মনে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোনো দরকারী জিনিস পাছে নষ্ট করে, কিংবা ঘরের মেঝে নোংরা করে ফেলে, এই ভয়ে মালী কয়েকবার তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। জজসাহেব বাধা দিয়েছেন, 'থাক, খেলা করছে, করুক।' তারপর অনেকক্ষণ নিজের মধ্যেই ডুবে ছিলেন। হঠাৎ কিসের শব্দ হতেই দেখেন, টিপয়ের উপর থেকে কাচের গ্লাসটা ফেলে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে মেয়েটা। মালী এবং নিবারণ দুজনেই ছুটে এল। কিন্তু আশ্চর্য তাদের কাছে না গিয়ে ছুটতে ছুটতে উঠল এসে জজসাহেবের কোলে। দুহাতে তুলে নিয়ে তার সেই জলেভরা অসহায় ত্রস্ত চোখদুটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ওঁর মনে হল এই যে নিতান্ত অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে এই মাতৃহারা শিশুটি তাঁর কাছে ভেসে এসে পড়ল এর মধ্যে বিধাতার কোনো ইঙ্গিত আছে। হয়তো একে দিয়েই তৈরী হবে, যে জীবন থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়েছেন, সেখানে পৌঁছবার নতুন সেতু। এই শিশুটিকে বীণাপাণির কাছে নিয়ে গিয়ে বলবেন, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, ডানা মেলতে শিখেছে; কাছে থেকেও তারা আমাদের নাগালের বাইরে। শেষ বয়সের বন্ধন দুটি একটি নাতি-নাতনী, তাও আমাদের নেই। তাই বোধ হয় ভগবান একে পাঠিয়ে দিলেন। একে নাও; মানুষ করো। একে আশ্রয় করে আবার আমরা আমাদের সেই প্রথম জীবনের ছোট্ট নীড়টিতে ফিরে যাই।

স্ত্রীর জন্যে কেমন একটা সস্নেহ সহানুভূতি অনুভব করলেন সান্যাল সাহেব—আমার মত সেও বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। তার জীবনের সেই ফাঁকটুকু ভরে দেবে এই শিশু।

বিকালের দিকে দেখা করতে এলেন পাব্লিক প্রসিকিউটর শিবেশ দত্ত। বসেই বললেন, অসুখের কথা শুনে অবধি আসব আসব করছি। তার কি আর উপায় আছে? যত রাজ্যের বাজে লোকের ভিড়। এখন কেমন আছেন স্যার?

—অনেকটা ভাল।

—কে দেখছেন? সিভিল সার্জন?

—হ্যাঁ।

—ডাক্তারটি ভাল। এসব পোস্টে সচরাচর যাঁরা আসেন, তাঁরা আর যাই জানুন, ডাক্তারি জানেন না। তার দরকারও হয় না। কিন্তু এ লোকটিকে একসেপ্‌শন বলা যেতে পারে। তাহলেও বলবো, অল্পের ওপর দিয়ে গেলেও, এটা যখন সেকেণ্ড-অ্যাটাক্, স্পেশালিস্ট না দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাছাড়া এসময়ে একা একা থাকাও উচিত নয়। নিয়মে থাকা, নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া—এখানে সেসব কে দেখে? আমি বলি, দুটো দিন রেস্ট নিয়ে আপনি কোলকাতা চলে যান।

—দেখি কী করা যায়।

শিবেশবাবু একটু আপ্যায়নের সুরে বললেন, অবিশ্যি আমরা, মানে সমস্ত বার (bar) আপনাকে খুবই মিস করবো। সামনের ওপর বলা ঠিক নয়, নিজেদের মধ্যে আমরা সব সময়েই বলাবলি করি, এরকম কড়া বিচারক তার সঙ্গে এমন অমায়িক মানুষ একাধারে পাওয়া যায় না। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন, আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন, এই প্রার্থনাই করবো।

মামুলি শুভেচ্ছা হলেও কথাটা বোধহয় জজসাহেবের অন্তর স্পর্শ করল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। আদালতের কাজকর্ম সম্বন্ধে দুচারটা সাধারণ কথাবার্তার পর বললেন, সেদিনকার ডাকাতি মামলাটা আপনি যেভাবে conduct করেছেন সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি 'রায়'-এ সেকথার উল্লেখ করেছি।

শিবেশবাবু নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত দুটো তুলে বললেন, সেটা আপনার অনুগ্রহ। আমাকে স্নেহ করেন, তাই। তবে প্রশংসাটা আসলে পুলিশেরই প্রাপ্য। কাঠামো তৈরি করে দেয় থানা অফিসার; আমরা যা করি সে শুধু এখানে ওখানে একটু হাতুড়ির ঠুকঠাক। অবিশ্যি রঙ ফলাবার ভারটা আমাদের নিতে হয়। এখানে তাও বিশেষ দরকার হয়নি। দারোগাটি সত্যিই বাহাদুর। কোনো কিছু গড়ে তুলতে হলে একটা বনেদ অন্ততঃ চাই। ওর তাও দরকার হয়নি। সমস্ত স্টোরিটাই দাঁড়িয়ে আছে শূন্যের ওপর।

জজসাহেবের মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বললেন, আপনি কি গোড়াতেই সে কথা জানতে পেরেছিলেন?

—ঠিক গোড়াতে না হলেও, জানতে পেরেছিলাম।

সান্যাল সাহেবের কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে উঠল—তাহলে তক্ষুনি মামলা বন্ধ করে সাক্ষীগুলোকে ২১১ ধারায় ফেলা উচিত ছিল।

জজসাহেবের সুরে যে উত্তাপ ছিল, শিবেশবাবু তা লক্ষ্য করলেন, তার জন্যে তৈরিও ছিলেন। বিনীত কণ্ঠে বললেন, কোনো লাভ হত না স্যর। সে চার্জ টিকত না।

—কেন?

—আমাদের হাতে এতটুকু প্রমাণ ছিল না যে, লোকগুলো আগাগোড়া মিছে কথা বলে যাচ্ছে। আঁটঘাট বেঁধেই এগিয়েছিলেন দারোগাবাবু। ২১১ ধারার মালমসলা কিছুটা পেলেও এ মামলা আমি চালাতাম না।

জজসাহেব আর কিছু বললেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। শিবেশবাবুও কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর স্বর নামিয়ে অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'এ মামলার শেষটা যে এমন ট্র্যাজিক হয়ে দাঁড়াবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। মেয়েটা মকবুল চৌধুরীর হারেমে গিয়ে উঠবে, যেমন আরো অনেকে উঠেছে, এইটাই মনে করেছিলাম। ফস করে খানিকটা বিষ খেয়ে বসবে, কেমন করে জানবো?...অবিশ্যি করবার আমাদের কিছুই ছিল না, কিছুই না,' বলে মাথা নাড়তে লাগলেন।

দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকবার পর জজসাহেবই প্রথম কথা বললেন, আপনার তবু একটা কৈফিয়ৎ আছে, শিবেশবাবু। খাঁটি হোক, নকল হোক, মালমসলা যা পেলেন তার ওপরেই মামলাটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—এই আপনার কাজ। কিন্তু আমি তো সে কথা বলে পার পাই না।

—আপনিই বা কী করতে পারেন, স্যর? আমরা যা জুটিয়ে এনে দিচ্ছি, সেই মালমসলার ওপর আপনাকেও নির্ভর করতে হবে। তার বাইরে তো যেতে পারেন না।

জজসাহেবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। বললেন, জানি। সেই কথাই ভাবছিলাম। ছেলেবেলায় সংস্কৃত ব্যাকরণে পড়েছি—

রাজা কর্নেন পর্য্যন্তি। আমরা যারা আদালতে বসে রাজত্ব করি, দণ্ডমুণ্ডের বিধান দিই, তাদেরও ঐ কান ছাড়া অন্য দৃষ্টি নেই। সাক্ষীরা কী বলে গেল, উকিলরা কী বলছেন, শুনলাম। সেইটুকুই আমাদের একমাত্র সম্বল। তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। কিন্তু আজ বিশেষ করে মনে হচ্ছে, আগেও হয়েছে, এইটাই চরম কথা নয়। আমাদের এই দণ্ডবিধির ওপরেও কিছু আছে; আর কোনো বিধি, যা আমার জানা নেই। যদি জানতাম, আপনি যাকে বলছেন ট্র্যাজিক, সেই পরিণামটা হয়তো এড়ানো যেত।

শিবেশবাবুর বলবার মত কিছুই ছিল না। তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলেন। জজসাহেব বললেন, এই যারা আমাদের কাছে বিচার চাইতে আসে, অজ্ঞ এবং অন্ধ মানুষ, আপনার Criminal Procedure Code কিংবা Evidence Act কি জিনিস, জানে না, তাদের কি ঐ বলে বুঝ দিয়ে খুশী করা যায়? সত্যি মিথ্যা জানি না, যা পেয়েছি, যা শুনলাম, তার ওপর এই আমার জাজমেণ্ট—এই কথা শুনতেই কি তারা আসে? মুখে তারা কিছুই বলে না, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করে—'যা সত্য, তাই যদি তুমি উদ্ধার করতে না পার, তবে তুমি কিসের বিচারক? যে ঘরে বসে তুমি বিচার করছ, আমরা তার নাম দিয়েছি ধর্মাধিকরণ, তোমাকে বলি ধর্মাবতার। তোমার কণ্ঠে সেই ধর্মের জয় ধ্বনিত হবে এই আশা নিয়েই আমরা এসেছি।'...কোথায় সে ধর্ম? সত্যকে জানা এবং নির্ভয়ে প্রকাশ করা—তার চেয়ে বড় ধর্ম আর কী আছে? এই কথাই বসে বসে ভাবছিলাম।...এই যে মোটা মোটা আইনের বই ঘেঁটে তার এক একটা ধারা নিয়ে দিনের পর দিন আমরা সূক্ষ্ম লড়াই করে চলেছি, আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে, তার দিকে তাকিয়ে বলছি This is justice, এর মধ্যে কোথায় যেন

একটা প্রহসন লুকিয়ে আছে।...যাক্; আপনি কাজের লোক, বোধহয় অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলাম।

শিবেশ দত্ত সে প্রসঙ্গের কোনো জবাব দিলেন না। ধীরে ধীরে বললেন, এই মৃত্যুটা আপনাকে এতখানি আঘাত দিয়ে গেছে বুঝতে পারিনি, স্যর। আমাকে মাপ করুন।

—না, না। মাপ করবার কী আছে? আপনি তো ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই আমরা নিরুপায়।...

বলতে বলতে ক্রমশঃ গভীর হয়ে এল কণ্ঠস্বর। অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললেন জজসাহেব, আঘাত? হ্যাঁ; আঘাত নিশ্চয়ই! এই রকমের মৃত্যু সবাইকেই আঘাত দেয়। শুধু আঘাত নয়, এই মৃত্যুটা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট প্রশ্নের মত। সারাজীবন যে পথ ধরে চলেছি, সেইটাই কি ঠিক পথ? তা যদি হবে তবে তার থেকে এত বড় অকল্যাণ ঘটল কেমন করে? বিচার যদি আমার নির্ভুল হয়ে থাকে, তার ফল এমন মর্মান্তিক হবে কেন? আমি যা করেছি, বিধিসম্মত, তার মধ্যে কোনো আইনের ত্রুটি নেই, যে চলে গেল এবং যাদের রেখে গেল, তাদের কাছে এইটুকুই কি আমার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ?...বিছানায় শুয়ে শুয়ে যতই ভাবছি, এ প্রশ্নের কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

পাব্লিক প্রসিকিউটর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার আমি উঠবো, স্যর। আপনার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই, সে স্পর্দ্ধাও রাখি না। শুধু বলবো, আপনি অসুস্থ; এ সময় মনটাকে যদ্দূর সম্ভব হালকা রাখা দরকার। কাল আবার আসবো—বলে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন।

উচ্চপদ অধিকার করলে তার জন্যে উচ্চমূল্য দিতে হয়। কথাটা যে কত বড় মর্মান্তিক সত্য, অসুখে না পড়লে জজসাহেব হয়তো এমন

হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতেন না। সহকর্মী, অনুকর্মী এবং বন্ধু-বান্ধবদের বিরাট গোষ্ঠী ছাড়াও এমন অনেক লোক, কর্মসূত্রে বা অন্য কোনো সূত্রে যাদের সঙ্গে কোনো যোগ নেই, দলে দলে এসে কুশল প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গভীর উৎকণ্ঠা জানিয়ে গেল। উত্তর দিয়ে দিয়ে রোগীর যে প্রাণান্তপরিচ্ছেদ, সে দিকে কারো লক্ষ্য নেই। ক্রমাগতঃ 'বিশ্রাম করুন' উপদেশ বর্ষণ করে শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর বিশ্রামের অবসরটুকুও কেড়ে নিয়ে গেলেন। দু' তিনটা দিন যেন ঝড় বয়ে গেল সমস্ত বাড়িটার উপর দিয়ে। বাধ্য হয়ে দেখাশোনা বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন সিভিল সার্জন। সে নির্দেশ প্রয়োগ করবার ভার পড়ল নিবারণের উপর। কিন্তু কোনো সম্মানিত ভিজিটরকে ফিরিয়ে দেবে ক্ষুদ্র চাপরাসীর সাধ্য কী? তাই নির্দেশটা কার্যকরী হল শুধু ছোটদের বেলায়। পর পর দুদিন চেষ্টা করেও সনাতন যখন তৃতীয়বার বিমুখ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল উপরের বারান্দা থেকে জজসাহেবের হঠাৎ নজরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন।

মনের মধ্যে আর একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, এবং সেই প্রসঙ্গে ভিতরে ভিতরে সনাতনের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন জজসাহেব। এই যে মেয়েটির ভার তিনি গ্রহণ করছেন, এর পেছনে তাঁর বিধি-সম্মত অধিকার আছে কি? এর বাপ বর্তমান, এবং আইনতঃ সেই এর অভিভাবক। মৃত্যুকালে মা অনুরোধ জানিয়ে গেল, সেইটাই যথেষ্ট নয়, বাপের সমর্থন প্রয়োজন। সে সমর্থন সহজ নয়, স্বাভাবিকও নয়। যে-লোক তাকে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠিয়েছে, তার স্ত্রীর শোচনীয় আত্মহত্যার জন্যে যে দায়ী, তারই হাতে এই শেষ সম্বল, একমাত্র শিশু সন্তানটিকে তুলে দেওয়া শশাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হবে কি? যদি না হয় এ মেয়েটির কী ব্যবস্থা সে করতে চায়—এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি দরকার।

সনাতন নত হয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতেই জজসাহেব অদূরে একটা মোড়া দেখিয়ে বসতে বললেন। সেদিকে না গিয়ে মেঝের উপর বসে পড়ে বলল, এখন কেমন আছেন, হুজুর ?

—ভাল আছি। শশাঙ্কর সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা হয়েছে ?

—কোন্ মুখে আর যাবো তার কাছে, বলবোই বা কী ?

একটু থেমে আবার বলল, গাঁয়ের একজনকে পাঠিয়েছিলাম। তার আগেই সব জেনে গেছে। কথায় বলে, দুঃসংবাদ বাতাসের আগে চলে।

—মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলেছে কি ?

—সে আর কী বলবে, হুজুর ? সে কি করতে পারবে, না পারবে, সবই তো আমি জানি।

—যদি তার মনে অন্য কোনো ইচ্ছা থাকে, অন্য কোনো ব্যবস্থা ?

—আমি জানি কোনো ব্যবস্থাই তার নেই, হুজুর। জেলখানার বাবুরা নাকি বলেছিলেন, চেষ্টা করলে মেয়েটাকে কোনো অনাথ আশ্রমে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যায়। তাই শুনে সারাদিন না খেয়ে পড়েছিল। তারপর যখন খবর পাঠালাম রাধা তার মেয়েকে হুজুরের পায়ের তলায় রেখে গেছে, হুজুর তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন কী কান্না। বারবার বলতে লাগল, এ শুধু মেয়েটার কপাল আর রাধার পুণ্যের ফল।

জজসাহেব ও দিক থেকে দ্বিধা-মুক্ত হলেন। কিন্তু দণ্ডদাতার প্রতি বিনাদোষে দণ্ডিত কয়েদীর এই মনোভাব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হল। তারপর ভাবলেন, বিচারক যে কতখানি অসহায় এরাও বোধহয় তা অনুভব করতে পারে। আগের দিন অনেক কথার মধ্যে সনাতনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শশাঙ্কর বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা-সাক্ষ্য দেবার পরেও তাদের সঙ্গে ওর সৌহার্দ্য বজায় থাকে কেমন করে। সে তার জন্যে কোনো রকম বিস্ময় প্রকাশ না করে বলেছিল,

'ও তো সবই জানে। যা বলেছি, নেহাৎ প্রাণের দায়ে। তাছাড়া আর যে কোনো উপায় ছিল না।' ঠিক তেমনি জজসাহেবেরও কোনো উপায় ছিল না, এই কথাই হয়তো মনে করে। সাক্ষীর মত বিচারককেও করুণার চোখে দেখে। তারা জানে, লালসালু-ঘেরা টেবিলের ওপাশে উচ্চাসনে বসে আছেন যে মহামান্য ব্যক্তি, আসলে তিনি আইন নামক একটি দুর্বোধ্য মহাশক্তির হাতের পুতুলমাত্র। পুলিশ, উকিল, সাক্ষী, পেশকার এবং আলমারীর ঐ মোটা মোটা বইগুলো—সবাই মিলে তাঁকে যেদিকে ঘোরাবে, সেইদিকেই তিনি ঘুরতে বাধ্য। এও একরকমের অনাস্থা। বিচারপ্রার্থীর এই অনাস্থার উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিপুলকায় বিচারসৌধ।

সান্যাল সাহেবের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। সনাতন যেন ভয়ে ভয়ে বলল, একটা নিবেদন আছে, হুজুর!

—কী, বল।

—মেয়েটাকে একবার দেখতে চেয়েছিল।

—চাইবে বৈকি? সে ব্যবস্থা আমারই করা উচিত ছিল। অসুখ বিসুখের গোলমালে সম্ভব হয়নি। কাল সকালেই তুমি এসে নিয়ে যেও। আসতে পারবে, না অন্য কাউকে দিয়ে পাঠাবো?

—না, হুজুর, আমিই আসবো।...বলে পা বাড়াতে গিয়ে আবার একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। জজসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবে?

শশাঙ্ক বলছিল, কোথায় ভেসে যেত বাচ্চাটা। তার কত পুরুষের ভাগ্য, হুজুর ওকে পায়ে স্থান দিলেন। সংসারে ঐটুকু ছাড়া আর তো কিছুই রইল না। তাই বলছিল, খালাস পাবার পর—

বাকীটুকু শেষ না করেই থেমে গেল সনাতন। জজসাহেব বললেন, তুমি ওকে বলো, যেদিন ওর মেয়াদ শেষ হবে, আমি নিজে এসে ওর মেয়েকে ওর হাতে পৌঁছে দিয়ে যাবো। ততদিন সে

আমার কাছেই রইল। অনাথ আশ্রম বা আর কোনোখানেই তাকে যেতে দেবো না।

সনাতন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল অভিভূতের মত। তারপর ছুটে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল জজসাহেবের পায়ের কাছে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, আমি এখনই যাচ্ছি তার কাছে।

সনাতন চলে যাচ্ছিল, জজসাহেব ডেকে ফেরালেন। কাছে আসতেই বললেন, আর একটা কথা বলা হয়নি—এই পাঁচ বছরের মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয়—

—'অমন কথা বলবেন না, হুজুর' জোড় হাত করে কাতর কণ্ঠে বলল সনাতন।

সান্যাল সাহেব মৃদু হেসে বললেন, মানুষের জীবন মরণের কথা কিছু বলা যায় না। ধর, যদি তদ্দিন আমি না থাকি, তাহলেও জেল থেকে খালাস পাবার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে তার মেয়েকে সে ফিরে পায়, সে ব্যবস্থা আমি করে যাবো।

গাড়ি এসে থামল ডাকবাংলোর গেটের সামনে। বেশ রাত হয়েছে। গাড়োয়ান নেমে এসে দরজা খুলে দিল। আরোহীর কোনো সাড়া না পেয়ে ডাকল, বাবু। চমকে উঠলেন সান্যাল সাহেব। প্রথমটা হঠাৎ বুঝতে পারলেন না কোথায় এসেছেন। পরক্ষণেই যেন সংবিৎ ফিরে এল। মিলিয়ে গেল ডিস্ট্রিক্ট্ জজের বাংলোর সেই দোতলার বারান্দা; সামনে বসে কথা বলছে সনাতন দাশ, খানিকটা দূরে বছর দুয়েকের একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিবারণ চাপরাসী। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বারান্দায় উঠতেই নবীন এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলো, মাস্না কোথায়?

—ঘুমিয়ে পড়েছে।

—খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছে তো ?

—হ্যাঁ, বাবু।

—কান্নাকাটি করেনি ?

—না, কাঁদবে কেন ?—মৃদু হেসে উত্তর দিল নবীন।

জজসাহেব ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকলেন। একটি কম পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন খাটের পাশে। সারাদিনের দুরন্তপনার পর একেবারে নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটা। কত অযত্ন হচ্ছে এই কটা দিন! কে দেখবে ? নবীনের সাধ্য কি এই মেয়েকে সামলায় ? ডান হাতটা একটু বেমোড়ে পড়েছিল, আস্তে আস্তে ঠিক করে দিলেন। কপালের উপর থেকে কয়েকটা অবাধ্য চুল সস্নেহে সরিয়ে দিলেন। ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুকের কোন্ তল থেকে একটি গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

হঠাৎ কী যেন মনে পড়েছে এমনি ভাবে দরজার বাইরে গিয়ে ডাকলেন, 'নবীন!' নবীন সাড়া দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। ব্যস্ত ভাবে বললেন, মশারি খাটাওনি কেন ?

—মশা তো নেই, বাবু।

—কে জানে যদি থাকে দু-চারটা ? মশারিটা টাঙিয়ে দাও।

দুই

প্রশস্ত আফিসকামরার একটা কোণ জুড়ে কাঠের ফ্রেমে গাঁথা ক্যানভাসের পরদা। তার আড়ালে ছোট টেবিলের পাশে একখানা ডাইনিং চেয়ার। মেজর ব্যানার্জির টিফিন রুম। সকাল সাতটায় লঘু প্রাতরাশ সেরে জেলখানায় আসেন। তারপর খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পালা। আফিসে ফিরতে প্রায় নটা। দশটা সাড়ে দশটায় আরদালীর হাতে আসে কিঞ্চিৎ ভারী-ধরনের ব্রেকফাস্ট্। সুদৃশ্য ট্রের উপরে ততোধিক সুদর্শন আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা। আরদালী অপেক্ষা করে না। ট্রেখানা নামিয়ে রেখেই চলে যায়। সাহেব হয়তো তখন ডুবে আছেন কাজের মধ্যে, ব্যস্ত আছেন কোনো সহকর্মীর সঙ্গে জরুরি আলোচনায়। ডেপুটি এবং কেরানী বাবুদের দল একের পর আরেক দল এসে কাগজপত্র সই করিয়ে নিচ্ছেন। ব্রেকফাস্ট্ অপেক্ষা করতে থাকে। তারই মধ্যে একটু ফাঁক খুঁজে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তাঁর আফিস ফালতু জীবন সাঁতরা। ব্যানার্জি সাহেব বুঝতে পারেন তার নীরব তাগিদ। কোনো কোনো দিন তখনই উঠে গিয়ে বসেন পরদার আড়ালে, যেদিন বেশি ভিড় থাকে, বলেন, 'যাচ্ছি, তুই যা।' জীবন সরে যায়, কিন্তু নজর থাকে সাহেবের উপর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তখনো যদি তাঁর উঠবার লক্ষণ না দেখে, আবার গিয়ে দাঁড়ায় টেবিলের ওপাশটিতে, কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে কোনো রকমে বলে ফেলে, 'চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, হুজুর।' ব্যানার্জি মনে মনে খুশি হন; কিন্তু বাইরে বিরক্তি দেখিয়ে বলেন, 'না; তোর জন্যে আর কাজটাজ করা গেল না, দেখছি।'

বসন্ত সান্যাল যেদিন এসেছিলেন, তার পরদিন। ব্রেকফাস্ট্ ঠিকসময়ে সেরে ফেলে ফাইল নিয়ে বসেছেন সুপার সাহেব। ঘরে

আপাততঃ কেউ নেই। জীবন এসে দাঁড়াল তার সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে।

—কী হল আবার? খেয়ে এলাম তো এক্ষুণি—মাথা না তুলেই বললেন ব্যানার্জি।

জীবনের মাথাটা নুইয়ে পড়ল মাটির দিকে। সেইভাবেই জিজ্ঞাসা করল, 'জজসায়েব চলে গেছেন, হুজুর?'

সুপারের কলম থেমে গেল। একটু বিস্ময়ের সুরে বললেন, কোন জজসাহেব?

—কাল যিনি আইছিলেন?

—কেন, তাঁকে তোর কী দরকার?

জীবন নীরব। দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত। ব্যানার্জি তাঁর প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন। এবার উত্তর এল তেমনি মৃদু এবং সঙ্কোচ-জড়ানো সুরে, শশাঙ্কর মেয়েডারে একবার দেখতাম, হুজুর।

—শশাঙ্কর মেয়ে! কে সে?

—জজসায়েব যারে নিয়া আইছিলেন।

—ও শশাঙ্কর মেয়ে কে বলল তোকে? ওতো সাহেবের নাতনী।

—না, হুজুর। শশাঙ্কর মেয়ে ওডা; মানুষ করছেন জজসাহেব।

ব্যানার্জি সাহেবের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তখনই দুচারটা প্রশ্ন করে ঐ আফিস ফালতুর মুখ থেকেই জানতে পারলেন তার অতিপ্রিয় একদা সহবন্দী শশাঙ্ক মণ্ডলের মোটামুটি ইতিহাস। যতদিন জেলে ছিল, ঐ মেয়েই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। সারাদিন ভূতের মত খাটত। নিজেকে ডুবিয়ে রাখত অবিরাম কাজের মধ্যে। শুধু ভুলে থাকার জন্যে নয়, যত বেশি রেমিশন পেয়ে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া যায়, এই আশায়। রোজ রাত্রে হিসাব করতে বসত, কতদিন খাটনি হল; আর কতদিন বাকী। ঠাট্টা করত কয়েদীরা। ডেপুটি বাবুরা বিরক্ত হতেন বারংবার একই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে। তবু

সাপ্তাহিক 'ফাইলের' দিন এগিয়ে ধরত টিকেটখানা, দেখুন তো স্যর, কমাস খাটতে হবে।

মাঝে মাঝে ব্ল্যাডব্যাঙ্কের লোক আসত রক্ত নিতে। এক একবার রক্ত দিলে কুড়ি পঁচিশ দিন করে রেমিশন পাওয়া যেত। তার আগে জেল ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখবেন স্বাস্থ্যের অবস্থা রক্ত দেবার যোগ্য কিনা। একটা নির্দিষ্ট সময় না পেরোলে দ্বিতীয়বার রক্তদান মঞ্জুর করা হত না। শশাঙ্ক তার আগেই গিয়ে হাজির হত ডাক্তারের কাছে, পীড়াপীড়ি করত, 'আমার কিছু হবে না। অর্ডারটা দিয়ে দিন, ডাক্তার বাবু।' জীবন মাঝে মাঝে বোঝাতে চেষ্টা করত, শরীরটা নষ্ট করে, কী লাভ? কটা দিন পরেই না হয় বেরোলি। সে চুপি চুপি বলত, মেয়েটার জন্যে মনটা বড় ছটফট করছে জীবনদা। একটা দিনও আর থাকতে পারছি না।

শেষের কটা মাস যেন আর শেষ হতে চায় না। পাগলের মত হয়ে গেল লোকটা। হঠাৎ কার কাছে শুনল, মেথরের কাজ করলে খানিকটা বেশি মাপ পাওয়া যায়। সোজা জেলর সাহেবের কাছে টিকেট নিয়ে হাজির—'আমাকে মেথর করে নিন, স্যর।' জেলর ওকে চিনতেন এবং স্নেহ করতেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করলেন।

তারপর একদিন সত্যিই শেষ হয়ে গেল দীর্ঘ মেয়াদ। কিন্তু কই, জজসাহেব তো এলেন না। খালাসের আগে বার বার খোঁজ নিল বাবুদের কাছে। অনেকেই মনে মনে হাসলেন। কেউ কেউ ঠাট্টাও করলেন ঐ নিয়ে। বড় সাহেবও (তখন যিনি ছিলেন) কোনো খবর দিতে পারলেন না। বললেন, এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না।

খালাস পাবার দিন কয়েক পরে দেখা করতে এল জীবনের সঙ্গে। চেনা যায় না। চোখ বসে গেছে। চুল উসকো খুসকো। বিশেষ কিছুই বলল না। শুধু জানিয়ে গেল, বহু চেষ্টা করেও জজসাহেবের

ঠিকানাটা যোগাড় করতে পারেনি, ছুটি নিয়ে কলকাতা চলে গেছেন সেই বছর চারেক আগে—এর বেশি আর কিছু তারা জানে না, কিংবা বলতে চায় না। 'মেয়েটাকে আর দেখতে পেলাম না, জীবনদা।' —বলে ভেঙ্গে পড়ল মোলাকাত ঘরের গরাদের ওপাশে। জীবন সান্ত্বনা দিল, জজসাহেব নিজের মুখের কথা দিয়ে গেছেন, মেয়ে তুই ঠিক পাবি, শশাঙ্ক। কোটের বাবুগো হাতে পায়ে ধর। ঠিকানাটা কি আর জানায়ে দেবে না।

তারপর বছর কেটে গেছে। শশাঙ্ক আর আসেনি। কোথায় আছে, কী করছে জীবনের জানা নেই।

জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট একটা নির্দিষ্ট দণ্ড দিয়ে আসামীকে জেলে পাঠান। দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতার সম্পর্ক ঐখানেই শেষ। জেলের মধ্যে সে কী করে, কেমন তার চালচলন—সে সম্বন্ধে কোনো কোনো বিচারককে কৌতূহল প্রকাশ করতে শোনা যায়। সে দৃষ্টান্তও বেশি নয়। কিন্তু খালাসের দিনে জজ এসেছেন তাঁর কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে, এরকম ঘটনা জেল সুপার তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কখনো শোনেননি, দেখা তো দূরের কথা। তাই সান্যাল সাহেব এসে যখন তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন, মেজর ব্যানার্জি মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারেননি। মনে হল, এর ভিতরে কোনো নিগূঢ় কারণ আছে। তার সম্বন্ধে কৌতূহল যতই থাক, সৌজন্যের খাতিরে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা সম্ভব হয়নি। তারপর ভাবলেন, হয়তো লোকটাকে কিছু সাহায্য করতে চান, কিংবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু। কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে ঐ ফুলের মত মেয়েটির কোনো যোগ আছে, বিশেষ করে সে যে একজন ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত নিম্নশ্রেণী সাধারণ কয়েদীর সন্তান, একথা তাঁর উন্মত্ত কল্পনাতেও কখনো আসতে পারত না। জীবনের কাছে যেটুকু পাওয়া গেল, তা যথেষ্ট নয়। হয়তো এর পেছনে কোনো গভীর রহস্য আছে, যা তাঁর আফিস ফালতুর জ্ঞান ও

ধারণার অতীত। তবু যতটা জানা গেল তাই যদি সত্য হয়, জজসাহেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন তার খানিকটা সুরাহা হয়তো তিনি করে দিতে পারেন, অথবা অন্য কোনো করণীয় তাঁর থাকতে পারে—ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করে মেজর ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত সান্যাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করাই মনস্থ করলেন।

ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন চৌকিদারের কাছে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন, তখনো চারটে বাজেনি। চৌকিদার উত্তর দেবার আগেই বেরিয়ে এল মেয়েটি। হাতে একটা প্রকাণ্ড ডল পুতুল। ব্যানার্জি বললেন, এই যে খুকুমণি, দাদু কোথায় ?

—দাদু টেলিগ্রাম করতে গেছেন।

—টেলিগ্রাম করতে !

—হ্যাঁ, আমরা কাল চলে যাচ্ছি কিনা। টেলিগ্রাম না করলে মা যে ইষ্টেশনে আসতে পারবে না। জানবে কেমন করে আমরা কোন্ গাড়িতে যাচ্ছি ?

—ও, তাইতো বটে। বাঃ, তোমার খোকাটি তো ভারী সুন্দর !

—খোকা নয়, খুকু।

—তাই নাকি ? দাদু কিনে দিয়েছেন বুঝি ?

—না ; মা দিয়েছে।

এই মা-টি যে কে ব্যানার্জি অনুমান করতে পারলেন না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, মেয়েটির প্রশ্নে আবার সজাগ হয়ে উঠলেন।

—আপনাদের জেলে বুঝি অনেক ফুল আছে ?

—আছে বৈ কি ? ঈস, বড্ড ভুল হয়ে গেল। তোমার জন্যে ফুল আনা হয়নি।

—আমার জন্যে না, এই মেয়েটার জন্যে। ওর আবার ফুলের বড্ড শখ।

—বটে! তাহলে তো ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি এখনি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কোন্ ফুল তোমার পছন্দ বলতো? গোলাপ ফুল?

—হ্যাঁ,; লাল গোলাপ।

—বেশ, তাই দেবো।

—আপনি জেলে থাকেন?

—হ্যাঁ, জেলেই তো থাকি।

—আপনার ভয় করে না?

—কিসের ভয়?

—ওখানে যে সব ডাকাত থাকে। যদি মারে?

ব্যানার্জির হঠাৎ মনে পড়ল, ওর বাবার জেল হয়েছিল ডাকাতি মামলায়। মেয়েটি তখন বলে চলেছে—জানেন? আমাদের পাশের বাড়িতে না? একদিন ডাকাত পড়েছিল। ওদের চাকরটার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সে কী রক্ত! মা আমাকে দেখতে দেয়নি। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলাম। ডাকাতগুলো ভারী পাজি। আপনারা ওদের গুলি করেন না কেন?

—মাঝে মাঝে করি বৈকি?

—আচ্ছা, জেলের সামনে একটা লোক বন্দুক নিয়ে ঘুরছিল কেন? কাকে গুলি করবে?

—তোমাকে। যে রকম জ্বালাতন করছ, বলতে বলতে বসন্তবাবু বারান্দায় এসে উঠলেন। মেজর ব্যানার্জি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই বললেন, কতক্ষণ এসেছেন?

—এই তো মিনিট কয়েক।

—খুব জ্বালাচ্ছিল তো?

—ব্যানার্জি সাহেব মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, না, জ্বালাবে কেন? তবে পাকা উকিলের মত এমন জেরা সুরু

করেছিল যে আমি ভেতরে ভেতরে কোর্টের আশ্রয় খুঁজছিলাম। ভাগ্যিস আপনি এসে পড়লেন।

জজসাহেব হেসে বললেন, ওর জেরার হাত থেকে বাঁচাতে পারি সে ক্ষমতা আমার অন্ততঃ নেই।

—আরো বড় জজ দরকার—বলে ব্যানার্জিও হেসে উঠলেন।

মেয়েটি ব্যানার্জি সাহেবের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। ওঁদের কথাবার্তা থেকে কি বুঝল সেই জানে। হঠাৎ বলে উঠল, দাদু আমাকে কিছু বলেন না, মা বড্ড বকে।...কখন বাড়ি যাবে, দাদু?

—এই তো যাবো'খন। তুমি ছাখতো নবীন কোথায় গেল। আমাদের চা দিতে বল।

মেয়েটি চলে যেতেই ব্যানার্জির দিকে ফিরে বললেন, আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচটা নাগাদ আপনার বাড়িতে যাবো স্থির করেছিলাম। পেতাম কি না পেতাম, এসে বড্ড উপকার করলেন।

—এর আগেই আমার আসা উচিত ছিল। সময় করে উঠতে পারিনি। উপকার করবো সে স্পর্ধা আমার নেই। তবে আপনার কোনো কাজে যদি লাগতে পারি, সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

জজসাহেবের কানে বোধহয় শেষের কথাগুলো পৌঁছল না। মুখে ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের রেখা। কয়েক মুহূর্ত কী ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, একটা কথা সেদিন আপনাকে বলা হয়নি। এই যে মেয়েটিকে দেখছেন, ও কিন্তু আমার নাতনী নয়।

—'কিন্তু আমি যা দেখছি, তার চেয়েও বেশি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ব্যানার্জি। একটু থেমে ধীরে ধীরে বললেন, 'ওর জন্মগত পরিচয়টা আমি পেয়েছি।'

জজসাহেবের চোখে বিস্ময় জেগে উঠল—কোত্থেকে পেলেন?

—আমার একটি কয়েদীর কাছ থেকে। আপনি তাকে দেখেছেন, খুকুর হাতে যে ফুল এনে দিয়েছিল, সেই লোকটি। শশাঙ্ক মণ্ডলের সত্যিকার বন্ধু।

—'শশাঙ্কর বন্ধু!' আগ্রহ ভরে বললেন মিষ্টার সান্যাল, 'তাহলে ও-ই হয়তো তার খোঁজখবর দিতে পারবে।'

—'না; জেল থেকে বেরোবার পর তার কোনো খবর ও জানে না।'

জজসাহেব স্পষ্টতঃ নিরাশ হলেন। শুষ্ক স্বরে বললেন, জানে না? তাহলে কী করা যায় বলুন তো? আপনার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওর গ্রামেও ঘুরে এলাম। বাড়িঘর কিচ্ছু নেই। কোথায় আছে, কী করছে, কেউ কিছু বলতে পারল না।

—আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন, মিষ্টার সান্যাল। আপনি কি সত্যিই মেয়েটিকে ওর বাপের হাতে ফিরিয়ে দিতে চান?

—নিশ্চয়ই। তাকে কথা দিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দেবো। সেই জন্যেই তো এলাম।

—কিন্তু যেদিন কথা দিয়েছিলেন, সেদিন এ কাজটা যেমন সহজ ও সরল ছিল, আজ বোধ হয় তা নেই।

জজসাহেবের মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল। বললেন, সে কথা ঠিক। সব কাজই সরল কিংবা সহজ হবে, এটা আশা করা যায় না! অনেক জটিল ও কঠিন কাজও আমাদের করতে হয়। শুধু সেই কারণেই তাকে এড়িয়ে চলি কেমন করে?

মেজর ব্যানার্জি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলা আমার পক্ষে উচিত নয়, শোভনও নয়। তাছাড়া আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে যাওয়াও আমার পক্ষে হাস্যকর।

—না, না, আপনি অসঙ্কোচে বলুন, বাধা দিয়ে বললেন বসন্ত

বাবু, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবো বলেই তো যাচ্ছিলাম। আপনার সাহায্যও আমার একান্ত দরকার।

ব্যানার্জি বললেন, কেমন করে এই মেয়েটি আপনার আশ্রয়ে এল, আমার পুরোপুরি জানা নেই। এইটুকু শুনেছি, ওর মা নেই, বাপ ডাকাতি মামলায় জেল খেটে বেরিয়েছে। বাড়ি, ঘর, সহায়, সম্বল, সঙ্গতি কিছুই নেই। সমাজে ওর স্থান কোথায়, দশজনে ওকে কি চোখে দেখছে বা দেখবে, আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এখন সে কোথায় আছে, কী করছে, কেউ জানে না। যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায়, এই অবোধ শিশুটিকে—যে এতদিন আপনার আশ্রয়ে, শুধু আশ্রয়ে নয়, পারিবারিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ—তার হাতে গছিয়ে দেওয়া কি এর দিক থেকে সুবিচার হবে ?

জজসাহেব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে যেমন মাথা নিচু করে শুনছিলেন কথাগুলো, তেমনি ভাবেই বললেন, দেখুন মিষ্টার ব্যানার্জি, যা কিছুই আপনি করতে চান, সব দিক এবং সকলের স্বার্থ বজায় রেখে করা যায় না। একজনের ওপর যেটা সুবিচার, তাই আরেকজনের ওপরে অবিচার হয়ে দাঁড়ায়। সংসারে ন্যায়ের পথ বড় কঠিন।

স্বল্প বিরতির পর বললেন, এই মেয়েটি আজ আমাদের জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়েছে, আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন। শুধু ওর দিক থেকে বলছি না, আমার দিক থেকেও নয়, আরেক জন আছে—আমার পুত্রবধূ, যাকে ও মা বলে জানে, তার কাছে ওর অভাব যে কী, সে শুধু আমিই জানি! আর কেউ বোধ হয় কল্পনা করতেও পারবে না। তবু এই কঠোর সত্যকে অস্বীকার করি কেমন করে যে, ওর ওপরে আমাদের কোনো অধিকার নেই। ন্যায়, ধর্ম, আইন—কোনো দিক থেকেই নেই। ওর মায়ের মৃত্যুকালের শেষ ইচ্ছাই ওকে আমার হাতে এনে দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল ওর বাবার সম্মতি।

এর বেশি তো আর কিছুই আমরা পাইনি। আমার কাছে ও গচ্ছিত ধন মাত্র; চিরকালের জন্য নয়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সে সময় ফুরিয়ে গেছে। এখন আমার সামনে একমাত্র খোলা পথ, যে কথা তাকে দিয়েছিলাম, তাই পালন করা। তা সে যত কঠিনই হোক।

—হয়তো আপনার কথাই ঠিক, বললেন মেজর ব্যানার্জি, কিন্তু কর্তব্য যেখানে কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, বিশেষ করে একটি শিশুর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখে না, সেখানে কেবলমাত্র ন্যায়ের অনুরোধে তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে যেতে হবে, এ আদর্শে আমার মন সায় দেয় না।...যাক, আর বাজে বকবো না। এবার বলুন, আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি।

নবীন চা দিয়ে গিয়েছিল। সেদিকে এতক্ষণ কারোরই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ মিষ্টি স্বর কানে যেতে দুজনেরই চমক ভাঙল— 'বা, দাদু, তোমরা বসে বসে গল্প করছ, আর তোমাদের চা এদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। নবীন সেই কখো-ন রেখে গেছে।'

জজসাহেব লজ্জিত হলেন, তাইতো; নিন, চা নিন মেজর ব্যানার্জি। বোধহয় আর খাবার মত নেই। ওটা বরং—

টিপয়ের উপর থেকে কাপটা তুলে নিয়ে ব্যানার্জি বললেন, ঠিকই আছে; আপনি ব্যস্ত হবেন না। তোমার খাওয়া হয়েছে, খুকুমণি?

একরাশ কোঁকড়া চুল সমেত মাথাটা ডান দিকে হেলিয়ে খুকু বলল, হুঁ।

—বেশ! তোমার নামটাই তো এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি। কী বল দিকিন।

—মায়া।

—বাঃ, ভারী সুন্দর নাম তো।

ছাই সুন্দর। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল খুকু, সব্বাই ঠাট্টা করে।

—কেন, ঠাট্টা করবে কেন?

—সেকেলে বুড়িদের নাম।

—ও, তা হবে। আমি সেকেলে মানুষ কিনা, তাই বুঝতে পারিনি।

—আমার সব বন্ধু আছে না? সক্কলের নাম আমার চেয়ে ভাল।

—আচ্ছা, বল দিকিন দুএকটা, শুনি।

—ডলির নাম শুভ্রা, আলোর নাম অপর্ণা, বুকনের নাম সুস্মিতা...

জজসাহেব বাধা দিয়ে বললেন, আচ্ছা, এবার নাম কীর্তন রেখে একটু বেড়িয়ে এসো দেখি। নবীন কোথায় গেল?

—বারে, বেড়িয়ে আসবো কি? সব গুছিয়ে নিতে হবে না?

—তুমি আবার কী গোছাবে?

—কেন? আমার খুকুর খাবার-দাবার বিছানা-পত্তর—

—সেসব রাত্তিরে গোছাবে। এখন বেড়াতে যাও। ঐ যে নবীন এসে গেছে।

মায়া চলে গেলে মেজর ব্যানার্জি বললেন, নামটা বুঝি ওদের?

—না; আমার বৌমার দেওয়া।

—আপনার ঘরে এসে ওর নবজন্ম হল, তার সঙ্গে নতুন নামকরণ। কিন্তু—যাক, বলুন স্যর, আমাকে কী করতে হবে।

—সে তো বুঝতেই পারছেন। এই লোকটিকে খুঁজে বার করা; যদিও জানি সেটা মোটেই সহজ নয়।

—খুব কঠিন হবে বলেও মনে হচ্ছে না। সারাজীবন ধরে দেখলাম, শ্রীঘর তার পুরনো আশ্রিতকে সহজে ভোলে না। তারা যেখানেই যাক, যতই এড়াতে চেষ্টা করুক, কেমন করে যেন টেনে নিয়ে আসে। আমার বিশ্বাস এ লোকটিও এতদিনে আমারই কোনো সতীর্থের রাজত্বে নির্বিবাদে বাস করছে। বিশেষ করে যখন সে

একা, সংসারে কোনো বাঁধন নেই, পেছন থেকে টেনে ধরবার কেউ নেই।

—তাই হয়তো হবে, অনেকখানি স্বগতোক্তির মত বললেন জজসাহেব, যে টেনে ধরতে পারত, তাকে তো আমিই ধরে রেখেছি। এই একমাত্র বন্ধনটুকু হারিয়ে কতদিন হয়তো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, তারপর, আপনি যা বললেন, ধরা দিয়েছে জেলের দরজায়। তাই যদি ঘটে থাকে, তার জন্যে আমিই দায়ী। আবার ভুল করলাম। সেবারে তবু বলা যেত আমি অক্ষম, অসহায়। এবার সে কৈফিয়ৎ-টুকুও দেওয়া চলে না।

'সেবার' কথাটা কানে যেতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ব্যানার্জি সাহেব। তার অর্থ বুঝতে ওঁর অসুবিধা হল না, এবং সেই নীরব প্রশ্নের উত্তরেই বললেন, আর একটা কথাও আপনাকে বলা হয়নি। এই লোকটি কোনো অপরাধ করেনি। একটা সাজানো মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে তাকে আমি জেলে পাঠিয়েছিলাম। সে অন্যায় একটি দিনের তরেও ভুলতে পারিনি।

সাজানো মামলার প্রসঙ্গে জেল সুপার বিশেষ বিচলিত হলেন না। এমন অনেক ঘটনা তিনি জানেন। বিচারক যে অন্তর্যামী নন, অপরাধ নির্ণয়ের যে যন্ত্র তাকে দেওয়া হয়েছে তার চালক মাত্র, এবং সে যন্ত্রও নির্ভুল নয়,—এ সবই তাঁর জানা। যন্ত্র যদি ভুল করে, যন্ত্রীর পক্ষে সেটা অন্যায় বা অপরাধ, একথাও তিনি মানেন না। কিন্তু জজ-সাহেবের এই শেষ উক্তি, বিশেষ করে যে সুরে তিনি সেটা উচ্চারণ করলেন—'সে অন্যায় আমি একটি দিনের তরেও ভুলতে পারিনি' মেজর ব্যানার্জির চোখের সুমুখ থেকে একটা পরদার আবরণ যেন এক নিমেষে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই সত্যসন্ধ বিচারকের মর্মস্থলটি তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। এই যে মানুষটি তাঁর নিজের এবং হয়তো তার চেয়েও বেশি, তাঁর পুত্রবধূর বুকের একখানা পাঁজর তুলে নিয়ে

সেই সুদূর দেওঘর থেকে ছুটে এসেছেন, এর পেছনে যে শক্তি তাঁকে চালিত করছে সেটা শুধু কর্তব্য-পালন নয়, প্রতিশ্রুতি-রক্ষাও নয়, তার চেয়ে অনেক গভীর। যাকে তিনি জীবনের একটা মারাত্মক ভুল এবং অক্ষমতা বলে অকপটে স্বীকার করছেন, তার মূলে কোনো সত্য থাক বা না থাক সেই তীব্র জ্বালাময় অনুভূতিটাকেই তিনি এই দীর্ঘ পাঁচ বছর নিঃশব্দে অন্তরের মধ্যে লালন করেছেন, এবং সেই সময়টা কবে শেষ হবে তারই প্রতীক্ষায় অসহ্য উৎকণ্ঠায় দিন গুনেছেন। কোনো যুক্তি, তর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ ওঁর মনের সেই একাগ্র দুর্বার ধারাটিকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারবে না। ব্যক্তিগত কোনো দুঃখ, কোনো বেদনা ওঁকে নিরস্ত করবে না। একদিকে নিবিড় স্নেহ এবং ঐকান্তিক যত্ন, আরেক দিকে আভিজাত্যের উদার আলোবাতাস—এ দুয়ের সংযোগে একটি সতেজ ফুলের চারার মত যে শিশু এই পাঁচটি বছর ধরে অবাধে বেড়ে উঠেছে, সহসা তাকে উপড়ে নিয়ে দৈন্য ও দুর্দশার অন্ধকারে ফেলে দেবার অধিকার তাঁর আছে কিনা, এ প্রশ্ন তুলতে যাওয়াও নিরর্থক।

তাই আর কোনো কথা না বলে যথাশক্তি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেল সুপার বিদায় নিলেন।

তিন

যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন জজসাহেব, আপাততঃ ব্যর্থ হল। কাল সকালেই ফিরে যেতে হবে। সেই আনন্দ ও উত্তেজনায় অনেক রাত পর্যন্ত মায়ার চোখে ঘুম এল না। অনেক করে এইমাত্র তাকে শুতে পাঠিয়ে নবীনকেও বিদায় দিয়ে ডাকবাংলোর নির্জন বারান্দায় ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। সামনের রাস্তাটায় লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরেই অন্ধকারে-ঢাকা খোলা মাঠ। পাঁচ বছর আগে অনেকদিন এই শহরে কাটিয়ে গেছেন। ভারী ভাল লেগেছিল এই মাঠ ঘাট গাছপালা, তার পাশে ঐ নদীর বাঁকটি এবং সব ঘিরে এখানকার মানুষগুলো। সেই ভাল লাগার রেশটুকু শুকিয়ে-যাওয়া বকুল ফুলের মৃদু গন্ধের মত কখনো যেন লেগে আছে তাঁর মনের কোণে। এই মাঠের ওপারেই ডিস্ট্রিকট্ জজের বাংলো। কত রাত, স্টেশনের বড় মাঠে যেদিন যাওয়া হত না, এইখানেই তিনি পায়চারি করতেন। একদিন কী অপ্রস্তুতেই না পড়েছিলেন ঐখানটায়। এতকাল পরে কথাটা মনে পড়তে ভারী কৌতুক বোধ হল।

সামান্য একটুখানি জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। দশটা বেজে গেছে। সময়টা বোধ হয় বৈশাখের মাঝামাঝি। বেশ গরম চলছে কদিন ধরে। নিরুদ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এপার থেকে ওপার। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ সাদা মত কী চোখে পড়ল ঐ পায়ে-চলা পথের ধারে। মাঝে মাঝে সাপ বেরোয় বলে সঙ্গে টর্চ ছিল। জ্বালতেই উঠে দাঁড়াল দুজন মানুষ—একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। তাড়াতাড়ি চলে আসছিলেন, তারা পা চালিয়ে এসে ওঁকে ধরে ফেলল। ফিরতেই দেখেন, অতীশ।

—'বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি' ?

—'হ্যাঁ, স্যর' বলে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করল। সঙ্গিনীর দিকে ফিরে সসম্ভ্রম মৃদুকণ্ঠে বলল, 'জজসাহেব।' বৌটি ততক্ষণে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়েছে। এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নুইয়ে দিল ওঁর পায়ের কাছটিতে। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পেলেন না। কিন্তু বেশ লাগল এই বিনয়নম্র সশ্রদ্ধ সঙ্কোচটুকু।

—এত রাত্রে বেরিয়েছ যে ?

—ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, মাথা নিচু করে বলল অতীশ, ডাক্তার বলেছেন, একটু করে খোলা হাওয়ায় বেড়ান দরকার। সারাদিন কাজেকর্মে সময় পাই না। তাই—

মেয়েটির দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন জজসাহেব। শরীর খারাপের বিশেষ কোনো লক্ষণ চোখে পড়ল না; বেশ স্বাস্থ্যবতী বলেই মনে হল। সেই সঙ্গে মনে পড়ল আগেই শুনেছিলেন, বাপ মা ভাই বোন নিয়ে বৃহৎ পরিবার অতীশদের। হয়তো দুখানা ঘরে কোনো রকমে ঠাসাঠাসি করে থাকে। নতুন বিয়ে করেছে বেচারা।

—আচ্ছা তোমরা বেড়াও, আমি এবার ফিরবো, বলে বিদায় নিলেন জজসাহেব।

অতীশ বলল, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই, স্যর ?

—না, না; আমি একাই যেতে পারবো।

পাঁচ বছর! কতটুকুই বা সময়। কিন্তু কাল নদীস্রোতের মত। কবিরা বলেছেন, কালপ্রবাহ। শুধু দৈর্ঘ্য দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না। আরো অনেক কিছু আছে—তার গভীরতা, তার গতির বেগ, তার আবর্তের আলোড়ন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর জীবনের এই তরঙ্গসঙ্কুল পাঁচটি বছর যেন একটা যুগ। সমস্ত

অস্তিত্বকে এমন প্রচণ্ড বেগে সে নাড়া দিয়ে গেছে, তাঁর সারা জীবনে যার তুলনা নেই।

পিছনের ঐ ঘরটিতে লোহার খাটের উপর যে দামাল মেয়ে এই কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেদিন সে কতটুকু! পুরো দুটো বছরও পেরোয়নি। এমনি এক অন্ধকার রাতে ওকে নিয়েই চিরদিনের তরে এই শহরের মায়া কাটিয়ে কলকাতার পথে যাত্রা করেছিলেন। সমস্ত মন ভরে ছিল ভাবনায়। কোথাকার কোন্ অজ্ঞাতকুল গরীব চাষীর এই সদ্য-মাতৃহারা অনাথ শিশুটিকে কি জানি কী চোখে কোন্ মন দিয়ে দেখবেন বীণাপাণি। তাঁর সংসারের ছায়ায় এর একটু জায়গা মিলবে কি? এই কটা দিন আগেও মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন সান্যাল সাহেব, আগাগোড়া সব কথা জানিয়ে তাঁরই হাতে একে তুলে দেবেন। বলবেন, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে; কতদিন আমরা একটি শিশুমুখ দেখতে পাইনি, শুনতে পাইনি একটি কচি গলার কান্না। মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাই বোধ হয় ভগবান ওকে মিলিয়ে দিলেন। তাঁরই দান বলে গ্রহণ করো, মানুষ করো এই মা-মরা মেয়েটাকে।···ভেবেছিলেন, মন তাঁর সায় দিক আর না দিক, স্বামীর এই আকুল আবেদন নিশ্চয়ই তিনি ঠেলতে পারবেন না।

কলকাতার দিকে যতই এগিয়ে চললেন, ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এল তাঁর পূর্ববিশ্বাসের জোর। বেড়ে চলল সংশয়। হয়তো স্ত্রীর চোখে এমন ভরসা তিনি পাবেন না, যার বলে একথা তাঁকে অসঙ্কোচে বলা চলে। বললেও তার মর্যাদা যদি না থাকে? স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আদর্শের মিল নেই। সংসারে সামান্য বস্তুকেই তাঁরা এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। পদে পদে মতান্তর ঘটেছে, তার থেকে দেখা দিয়েছে মনান্তর। সেইজন্যে যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন, জীবনের শেষ অঙ্কে এসে নিজের সংসারে গ্রহণ করেছেন

নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা। ভেবেছিলেন বাকী কটা দিন এইভাবেই কাটিয়ে দেবেন—ভিতরে বাইরে বিচ্ছিন্ন, মনের দিক থেকে সংশ্রবহীন। কিন্তু পারলেন কৈ? হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে ঝড় উঠল। কোন্ ছিন্ন শাখার ভগ্ন নীড় থেকে এই অসহায় শাবকটিকে উড়িয়ে এনে ফেলল তাঁর পায়ের কাছে। দুহাতে তাকে তুলে নিলেন। কিন্তু তুলে নেওয়া আর ভার নেওয়া তো এক নয়। একে বাঁচিয়ে রাখার মতো জোর তাঁর হাতদুটিতে নেই। তাই যে সংসার থেকে তিনি দূরে সরে এসেছিলেন, শুধু মনের দিক থেকে নয়, অনেকটা বাইরের দিক থেকেও, তারই দ্বারে আবার তাঁকে ফিরে যেতে হল। কে জানে এ যাত্রা তাঁর সফল হবে কিনা?

দুখানা ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ির সামনে এসে যখন পৌঁছলেন বসন্তবাবু, তখন বেশ বেলা হয়েছে। 'কে গা?' বলে ঝি দরজা খুলেই মাথায় কাপড় টেনে জিব কেটে সরে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, 'ওমা! বাবু?' ছোট মেয়ে অনিমা নিচেই ছিল। এগিয়ে এসে প্রণাম করেই চমকে উঠল, 'একি! আপনার কি অসুখ করেছিল?'

বসন্তবাবু মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। হাসিমুখে বললেন, তেমন কিছু নয়। কটা দিন একটু ভুগে উঠলাম।

—একটা খবরও তো দেননি।

—খবর দিলে তোমরা সবাই মিলে ব্যস্ত হয়ে উঠতে; তাই আর দিইনি। তোমার মা কোথায়?

—মা আর বৌদি কালীঘাট গেছে পুজো দিতে। ছোড়দা নিয়ে গেছে।

হঠাৎ দরজার দিকে নজর পড়তেই বলল, এরা কারা, বাবা?

জজসাহেব পেছন ফিরে বললেন, আমার চাপরাসী নিবারণ, আর ওটি ওখানকার মালীর বৌ।

—বাচ্চাটি বুঝি ওর মেয়ে ? ভারী সুন্দর তো।

—না, ওর মেয়ে নয়। পরে সব বলছি তোমাদের। তুমি ওর একটু দুধ-টুধের ব্যবস্থা করে দাও। রাত্রে বিশেষ কিছু খায়নি।

—এক্ষুনি দিচ্ছি। আপনি জামাকাপড় ছাড়বেন চলুন।

বীণাপাণি ফিরে এসে স্বামীর শরীরের অবস্থা এবং অসুখে পড়ে খবর না দেওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে আরেক দফা অনুযোগ দিলেন। বসন্তবাবু প্রতিবাদ করলেন না, স্মিতমুখে সবটুকু মেনে নিয়ে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করলেন। বিশ্রামাদির পর বাচ্চাটির কথা উঠল। জজসাহেব এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। সমস্ত ঘটনা এবং দুর্ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ দিয়ে প্রকাশ করলেন তাঁর মনের সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষা, এই কটা দিন ধরে যাকে অন্তরের মধ্যে পোষণ করে এসেছেন। বীণাপাণির মুখে ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের ছায়া। শুষ্ক স্বরে বললেন, আমার কি আর সেদিন আছে ? নিজের শরীর নিয়েই বাঁচি না। তার ওপর এ বয়সে একটা কচি ছেলের ধকল—

বসন্তবাবু সাগ্রহে যোগ করলেন, সব ধকল তো আর তোমাকে সইতে হবে না। একটি আলাদা ঝি রেখে নাও। তারপর বৌমা আছে, অনু আছে।

—ওদের সময় কোথায় ? বলে, তেমনি অপ্রসন্ন মুখে বসে রইলেন বীণাপাণি।

জজসাহেব তখনো আশা ছাড়লেন না। অনেকটা যেন অনুনয়ের সুরে বললেন, ধর যদি বৌমার কোলে অমনি একটি বাচ্চা আসত ? তাকে তো আর না দেখে পারতে না।

বীণাপাণি কাষ্ঠ হাসির শব্দ তুলে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, কী যে বল ! কার সঙ্গে কার তুলনা !

তুলনার অযৌক্তিকতা বসন্তবাবু অস্বীকার করতে পারলেন না। তবু স্ত্রীর ঐ হাসি এবং সুরটুকু তাঁকে আঘাত করল। তারই

সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল মুখের উপর। বীণাপাণি সে সব অগ্রাহ্য করেই বললেন, তাছাড়া, থাকবে কোথায়? বাড়িতে তেমন আলাদা ঘর নেই। ছোট জাতের মেয়ে, ছোঁয়া-মেলার বাছবিচার আছে তো।

জজসাহেব এ দিকটা তেমন ভেবে দেখেননি। মুখ তুলে বললেন, কিন্তু এসব তো তুমি কোন দিন মানতে না।

—এতদিন যা করেছি, করেছি। এখন বয়স হল, আর কি যা-ইচ্ছে তাই করা চলে? ও-ও, তোমাকে বলা হয়নি। গেল মাসে মন্তর নিয়েছি। হঠাৎ একটি ভাল গুরু পাওয়া গেল। বয়স বেশি নয়, কিন্তু অত্যন্ত সাত্ত্বিক আর শুদ্ধাচারী। কোনো রকম অনাচার সইতে পারেন না।

নবলব্ধ গুরুদেবের গুণাবলী এবং সদ্যঅনুষ্ঠিত দীক্ষাপর্বের বর্ণনায় বীণাপাণি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। হঠাৎ এক সময়ে মনে হল, তার কোনো কথাই বোধহয় স্বামীর মনোগোচর হচ্ছে না। এ হেন অবস্থায় ধৈর্য রক্ষা করা কোনো স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়। বীণাপাণিও পারলেন না। বিরক্তির সুরে বেশ খানিকটা ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন, চিরটা কাল তোমার ঐ একভাবে গেল। ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে এসে পড়লেই কি তাকে ঘাড় পেতে নিতে হবে? এসব হাঙ্গাম কে পোহায় বোঝ না।

স্বামী চুপ করে আছেন দেখে খানিকটা আশ্বাসের সুরে বললেন, যাই হোক, এনে যখন ফেলেছ, একটা কিছু বন্দোবস্ত করতেই হবে। শঙ্কর বাড়ি আসুক। ওকে বলে দেখি। ওদের হাসপাতালে হামেশাই তো এ রকম ব্যাপার ঘটে, শুনেছি। ছেলে হতে এসে মা মারা গেল, আর কেউ নেই। সে সব বাচ্চাগুলো যায় কোথায়? নিশ্চয়ই কোনো আশ্রম-টাশ্রম আছে। সেই রকম কোথাও পাঠিয়ে দিলেই হবে। বেশিদিন তো এভাবে রাখা চলবে না।

স্ত্রীর এই সুস্পষ্ট প্রস্তাবের পরেও বসন্তবাবু নীরব রয়ে গেলেন। এই মৌন যে কিসের লক্ষণ বীণাপাণি খুব ভাল করেই জানেন। চিরদিন দেখে এসেছেন কোনো বিষয়ে অসম্মতি জানাবার এইটাই তাঁর সাধারণ রীতি। সরব আপত্তি সরবে খণ্ডন করা যায়। কিন্তু যে মানুষ শত কথার পরেও হ্যাঁ-না কিছুই বলে না, তাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে যাওয়া নিছক পণ্ডশ্রম। তাই বলে তাকে মেনে নেওয়াই বা যায় কি করে? আসামীকে জেলে পাঠিয়ে জজ তার ছেলেমেয়ে মানুষ করবার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন—এই রকম উদ্ভট কথা কে কোথায় শুনেছে? অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে না পেরে একটি স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করেছে, এও এমন কিছু নতুন নয়। খবরের কাগজ খুললে এরকম দুএকটা ঘটনা প্রায় রোজই চোখে পড়বে। স্বামীর জেল হয়েছে বলে কেউ যদি বিষ খেয়ে মরে তার জন্যেই বা জজের দায়িত্ব কোথায়? দেশের আইন তাই বলে বদলাতে পারে না। মেনে নেওয়া গেল, সে একটা বাচ্চা মেয়ে রেখে গেছে, যাকে দেখবার কেউ নেই। কিন্তু এ রকম অনাথ শিশুরও সংসারে অভাব নেই, কজনকে তাঁরা আশ্রয় দিতে পারেন? প্রয়োজন মত কিছু অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে। তার বেশি আর কিছু করতে যাওয়া গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়। এই সব ছেলেমেয়ের জন্যেই তৈরি হয়েছে নানারকমের অনাথ সদন। তারই একটিতে যদি এই মেয়েটির স্থান করে দেওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যায় কোথায়? বরং সেইটাই সব দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়।

এই সহজ কথাটা যে বুঝতে পারছেন না জজসাহেব, বীণাপাণির মতে তার কারণ, তিনি যত বড় বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং বিদ্বান হোন না কেন, সাংসারিক বুদ্ধি বলে কোনো বস্তু তাঁর ঘটে নেই। সংসারের অন্য দশজন মানুষ যে রাস্তায় চলে ওঁর পথ তার থেকে আলাদা। তার জন্যে সারাজীবন ওঁকে নিয়ে তাঁকে ভুগতে হয়েছে। অনেক

ক্ষেত্রেই স্বামীর কাছে হার মেনেছেন বীণাপাণি। ক্ষোভ, অভিমান, বিদ্রোহ, বিবাদ কোনো অস্ত্র দিয়েই তাঁকে টলানো যায়নি। বাইরে শান্ত, নিরীহ, নির্বিরোধ হলেও ভিতরে ভিতরে এই মানুষটি ইস্পাতের মত কঠিন। বীণাপাণির চেয়ে সে কথা আর কে বেশি জানে? কিন্তু কত আর সইবেন তিনি? সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। অনেকবার অনেক কিছু মেনে নিয়েছেন বলে এই অদ্ভুত সংকল্পে সায় দেওয়া যায় না; বিশেষ করে যেখানে সায় দেওয়া মানে অনেক ঝক্কি, অনেক ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেওয়া। না; স্বামীর এই খেয়াল তিনি মেনে নিতে পারেন না। তিনিও কঠিন হতে জানেন। অন্তত: এই একটি ক্ষেত্রে তার প্রমাণ তাঁকে দিতে হবে।

বীণাপাণি আর কথা বাড়ালেন না। স্থির করলেন, স্বামীর মনে মনে যে ইচ্ছাই থাক, যে সংকল্পই তিনি করে থাকুন, এই মেয়েটির বিলিব্যবস্থার ভার তিনি নিজের হাতেই রাখবেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক নিজের হাতে রাখলেন না; ছেলেমেয়েদের মতামত নেবার প্রয়োজন হল। বড় মেয়ে এবং ছোট ছেলে মাকে সমর্থন করল, এবং আপন আপন পরিচিত সূত্রে যত শীঘ্র সম্ভব একটা কোনো 'হোম' বা আশ্রম খুঁজে বের করবার ভার গ্রহণ করল। অনিমার মনটা এতে সায় দিল না। 'ছেলেমানুষ' বলে তার মতের কোনো মূল্য কেউ দেবে না জেনেও একবার বলতে গেল, 'বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন; আহা, অমন সুন্দর বাচ্চাটা, রেখে দাও না, মা। বৌদি আর আমি দুজনে মিলে পালা করে'—কথাটা শেষ করবার আগেই ধমকে উঠলেন বীণাপাণি, 'থাক, তোমাদের আর 'পালা করতে' হবে না। সামনে পরীক্ষা, সেই ভাবনা ভাবো।' শুধু একজন মানুষ—যার মতামত কেউ জানতে চাইল না, বোধহয় প্রয়োজন মনে করল না—সব নিঃশব্দে শুনে গেল, কিন্তু একটি কথাও বলল না। সে সান্যাল বাড়ির বড় বৌ, জয়ন্তী।

জজসাহেবের স্পষ্ট নির্দেশ না পেলেও নিবারণ এবং মালী-বৌ মনে করেছিল, তিন চার দিনের মধ্যেই তারা ফিরে যেতে পারবে। সেই জায়গায় সপ্তাহ কেটে গেল। গিন্নীমা ছাড়তে চাইলেন না। একদিন কালীঘাট ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন, আরেক দিন পাঠালেন চিড়িয়াখানা, যাত্বঘর। তারই ফাঁকে ফাঁকে চলল বাচ্চাটির জন্যে একটি সুবিধা-জনক আস্তানার সন্ধান। বোঝা গেল, তার জন্যে কিছু সময় চাই। ততদিন ওদের আটকে রাখা চলে না। অগত্যা সাময়িক ভাবে একটি ঝি বহাল করলেন বীণাপাণি। স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে আর কোনো কথা হল না। হাবভাব দেখে মনে হল, তিনি এসব ব্যাপারে নিস্পৃহ। ঘরের কোণে বই নিয়েই দিন কাটে। মাঝে মাঝে সকালে এবং তুপুরে কোথায় বেরিয়ে যান, বিকাল হলে বেড়াতে বেরোন, কদাচিৎ কারো সঙ্গে তুএকটা দরকারী কথা বলেন, এই মাত্র। বীণাপাণি মনে মনে খুশী হলেন এবং এই ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, এতদিনে বোধহয় এই খেয়ালী মানুষটি কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়েছেন। এটা সম্ভব হল তাঁর জন্যেই ; অর্থাৎ তিনি একটু শক্ত হয়েছেন বলেই স্বামীকে এবার হার মানতে হল, এই ভেবে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদও লাভ করলেন।

নিবারণ যেদিন ছুটি পেল, তৈরি হয়ে দেখা করতে গেল জজসাহেবের সঙ্গে। দরজায় দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, 'আমরা যাচ্ছি, হুজুর।' বসন্তবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, "যাচ্ছ ? আচ্ছা, এসো! সাবধানে যেও।" উঠে এসে বালিশের তলায় মনিব্যাগ থেকে কয়েকখানা নোট নিয়ে নিবারণের হাতে দিয়ে বললেন, 'এর থেকে তুখানা কাগজ মালী-বৌকে দিও।' চাপরাসী ইতস্ততঃ করে বলল, আজ্ঞে আমাদের খরচ-পত্তর মা-ই সব দিয়ে দিয়েছেন।

—তাহলেও এটা রেখে দাও। পূজোর সময় ছেলেমেয়েদের কাপড় জামা কিনে দিও।

নিবারণ আপত্তি করল না। দুহাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে মনিবের পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর মাথা নিচু করে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

আলাদা ঝি বহাল হলেও বাচ্চাটিকে প্রায়ই দেখা যায় কখনো অনিমার, বেশির ভাগ জয়ন্তীর কোলে। বীণাপাণি ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না। কিন্তু কন্যা বা পুত্রবধূকে বাধাও দিলেন না। ছেলেকে এবং বড় মেয়েকে ডেকে আর একবার তাগিদ দিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই শঙ্কর একটা খোঁজ নিয়ে এল। ইটালী অঞ্চলে একটা ছোট অরফ্যানেজ। অর্থাৎ যে সব শিশুর মা-বাপ নেই তাদেরই তাঁরা আশ্রয় দিয়ে থাকেন। মেয়েটির বাপ বেঁচে আছে শুনে কর্তৃপক্ষ প্রথমটা রাজী হচ্ছিলেন না। তারপর শঙ্কর যখন বুঝিয়ে দিল, জেলে থাকা ঠিক বেঁচে থাকা নয়, বরং ওটা না থাকারই সামিল ; তার দরুণ আইনগত ত্রুটি যদি কিছু থাকে, উপযুক্ত অর্থমূল্যে তা পূরণ করে দেওয়া হবে, তখন আর তাঁরা আপত্তি করেননি। তবে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য পুলিশ-হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে শিশুটির বাপ-মা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তাঁদের হাতে থাকা দরকার। সেই সব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শঙ্করকে বাবার দ্বারস্থ হতে হল। জজসাহেব ধীর ভাবে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা শুনে নিয়ে বললেন, 'এ সব কিছু দরকার হবে না। দুএকদিনের মধ্যে ওর একটা ব্যবস্থা করছি।' শঙ্কর খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠল মায়ের উপর। বাবা নিজেই যখন ব্যবস্থা করছেন, তখন তার এই ছোটাছুটি খোঁজাখুঁজির কী দরকার ছিল? এর জন্যে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে তার খানিকটা ক্ষতিও হয়েছে। বিরক্ত মুখে, বোধহয় মায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার উদ্দেশ্য নিয়েই নিচে নেমে যাচ্ছিল, জজসাহেব ডেকে ফেরালেন।

—তোমার প্রাক্‌টিস্ কেমন হচ্ছে ?

—মন্দ না। •

—ওষুধের দোকান ?

—ভালোই চলছে।

—একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের সবাইকে। এই ছুটিটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রিটায়ার করছি।

—রিটায়ার করছেন !—চমকে উঠে কথাটা যেন শুধু আবৃত্তি করে গেল শঙ্কর। তারপর খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বলল, কিন্তু পেনসন নেবার সময় তো আপনার হয়নি। এখনো বোধহয় বছর দুয়েক বাকী।

—তার আগেই যেতে চাই। আর জয়েন করবার ইচ্ছা নেই।

—কেন ? শরীরটা ভালো নেই বলে ? তাহলে বরং ছুটিটা আরো কিছুদিন বাড়িয়ে নিয়ে, ডক্টর সেনকে দিয়ে একবার—

—তার দরকার হবে না। শরীর আমার মোটামুটি ভালোই আছে।

—তবে এই অসময়ে রিটায়ার করছেন কেন ?

—কারণ আছে। সেটা তোমরা ঠিক বুঝবে না।

এর পরে আর কথা চলে না। শঙ্কর মনে মনে আহত হল, এবং আর কিছু না বলেই ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। জজসাহেব বললেন, আর একটা কথা আছে। এর জন্যে সংসারের যে আর্থিক ক্ষতি হবে, সেটা আমি বিবেচনা করে দেখেছি। এই দুবছরে যে টাকা তোমরা আমার কাছে পেতে পারতে, আমি একসঙ্গে তোমার মায়ের হাতে দিয়ে দেবো। পরের ব্যবস্থাও করেছি। আমার সমস্ত সেভিংগস্, ব্যাঙ্ক বা অন্যত্র যা কিছু আছে, তোমাদেরই রইল। উইল হয়ে গেছে।

—উইল ! আরেকবার চমকে উঠল শঙ্কর, এখনই তার কী দরকার ছিল ?

—মানুষের শরীর ; বয়স হয়েছে ; কিছুই বলা যায় না। তাছাড়া আমি এখানে থাকছি না।

—সে কি! কোথায় যাবেন ?

—কাল পরশু জানতে পারবে।

হাতের বইখানার যেখানটায় আঙ্গুল রেখে এতক্ষণ কথা বলছিলেন, সেইখানটা আবার খুলে ধরলেন মুখের উপর। অর্থাৎ এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ ; তারই নীরব কিন্তু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। শঙ্কর বাবাকে চেনে। 'জানতে পারবার' প্রয়োজন যতই জরুরী হোক, ঐ 'কালপরশুর' আগে কোনোমতেই তার সম্ভাবনা নেই, এবং আর কোনো প্রশ্ন করা নিরর্থক। তাই একটু ক্ষুব্ধ হয়েই নিঃশব্দে নেমে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই গৃহিনী এলেন ছুটতে ছুটতে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, এসব আবার কী পাগলামি শুরু করলে ?

বসন্তবাবুর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল। বইএর পাতায় মুখ রেখেই বললেন, শুরু নয়, শেষ।

—যত সব অলক্ষুণে কথা! শঙ্কর ছেলেমানুষ ; ওসব উইল-ফুইলের কথা ওকে বলতে হয়! একেবারে মুষড়ে পড়েছে বেচারা।

—মুষড়ে পড়লে চলবে কেন ? ওকে ছাড়া আর কাকে বলবো ? আরেকজন, যাকে বলা যেত, সে থেকেও নেই। তাও ওর অজানা নয়।

—কিন্তু হঠাৎ কাজ ছেড়ে দেবার দরকার পড়ল কিসে ? আর যাবেই বা কোথায় ?

—এ দুটো প্রশ্নেরই জবাব আমি দিয়েছি। শঙ্করের কাছে নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।

—আর একবার না হয় তোমার কাছ থেকেই শুনতাম, রুক্ষস্বরে শ্লেষ মিশিয়ে বললেন বীণাপাণি। 'আমার ঘাট হয়েছে, ঐ বাচ্চাটাকে

বাড়িতে না রেখে, একটা কোনো ভালো জায়গায় পাঠাতে চেয়েছিলাম। তার জন্যে তুমি চাকরি ছাড়তে যাবে কোন্ দুঃখে? বাড়ি ছেড়েই বা যাবে কেন? তার চেয়ে আমাকেই বরং কোথাও পাঠিয়ে দাও। তোমার সংসার নিয়ে তুমি থাক। পথের কাঁটা সরে যাক। আজ বড় ছেলেটা থাকলে,—বাকীটুকু আর বলা হল না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন বীণাপাণি, এবং চোখে আঁচল দিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

কারোই আর কিছু জানতে বাকী রইল না। সমস্ত বাড়িটা কেমন থমথম করতে লাগল। কারো মুখে একটা কথা নেই। যেন কোনো আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় একবাড়ি মানুষ হঠাৎ মূক হয়ে গেছে। এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল, এবং ওপাশ থেকে শোনা গেল গম্ভীর গলার আওয়াজ—টেলিগ্রাম। দরজা খুলে দিল অনিমা। রসিদ সই করে বন্ধ খামখানা সে-ই নিয়ে গেল উপরে এবং বাবার হাতে দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে নেমে এল। কী আছে ঐ বাদামী রংএর আবরণের অন্তরালে, সকলের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে জয়ন্তীকেই প্রথম দেখা গেল উপরে উঠতে। শোবার ঘরের পাশে খোলা বারান্দায় দূরে কোন্ দুর্লক্ষ্য বস্তুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন জজসাহেব। পুত্রবধূর আগমন টের পেলেন না। সেও কিছু না বলে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ এদিকে চোখ ফেরাতেই জিজ্ঞাসা করল, কিসের টেলিগ্রাম বাবা? কোনো মন্দ খবর নয় তো?

—'না; সে রকম কিছু নয়, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন বসন্তবাবু। 'কাশীনাথ পাঠিয়েছে দেওঘর থেকে।' পুত্রবধূর সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চেয়ে যোগ করলেন, 'ও, ওকে তুমি চেন না। আমার পেসকার ছিল এক সময়ে; এখন দেওঘরে থাকে। একটা বাড়ি ভাড়া করতে লিখেছিলাম। সব ঠিকঠাক করে তার করেছে।' ঘরের দিকে

আসতে আসতে বললেন, তুমি এসে পড়েছ ভালোই হয়েছে। ডাকতে পাঠাবো ভাবছিলাম। বাচ্চাটির জন্যে যে ঝি রাখা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করে এসো তো দেওঘর যেতে রাজী আছে কিনা।

—আমি এক্ষুনি জেনে আসছি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে এল জয়ন্তী। বলল, ও রাজী আছে ; ঐদিকেই ওর বাড়ি।

—বেশ ; একটা সমস্যা মিটল। 'আরেকটা কাজ করতে হবে তোমাকে।' বাক্স খুলে একতাড়া নোট পুত্রবধূর হাতে দিয়ে বললেন, মেয়েটার জন্যে জামা-কাপড়, বিছানা-পত্তর, খেলনা-টেলনা যা কিছু মোটামুটি দরকার, তুমি নিজেই এক ফাঁকে বেরিয়ে কিনে এনে দাও। সেই সঙ্গে আমার যা সামান্য প্রয়োজন মনে কর, মানে, ওখানে বসবাস করবার মত, তাও নিয়ে এসো। তারপর ওবেলা বা কাল সকালে একবার এসে ওগুলো একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে দিও। কাল বারোটার গাড়িতে আমি দেওঘর যাচ্ছি। বাচ্চাটিও যাবে, তার সঙ্গে ঐ ঝি।

টাকাটা নেবার আগে জয়ন্তী একমুহূর্ত একটু ইতস্তত করল। মনে হল কিছু একটা বলবার আছে। কিন্তু পরক্ষণেই কিছু না বলে হাত বাড়িয়ে নোটগুলো নিয়ে আঁচলে বাঁধল। ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আর একবার চঞ্চল হয়ে উঠল। যেন কী বলবে স্থির করে উঠতে পারছে না। জজসাহেব তার এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন। সস্নেহে বললেন, কী বৌমা! কিছু বলবে?

—'না, থাক।' বলে আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল। জজসাহেব পিছন থেকে বললেন, হরিদাসকে নিয়ে যেও।

হরিদাস এ বাড়ির অনেকদিনের চাকর এবং বেশ কাজের লোক।

পরদিন সকালে উঠেই জজসাহেব বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যস্ত হয়ে ফিরলেন প্রায় ন'টার সময়। ততক্ষণে জয়ন্তী প্রায় সব কিছুই গুছিয়ে ফেলেছে। শ্বশুর ঘরে ঢুকতেই মাথায় আঁচলটা টেনে সরে দাঁড়াল। বসন্তবাবু লগেজগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এ করেছ কী! এত মালপত্তর কী হবে! কিছু বাদসাদ দিয়ে দাও।

—না, বাবা, বাদ দেবার মত এর মধ্যে কিছু নেই।

—ঐ ট্রাঙ্কটায় কী আছে?

—খুকুর জামা-কাপড়।

—আর ঐ মস্ত বড় স্যুট্‌কেসটা?

—মস্ত বড় কোথায়? ওতে সব আপনার জিনিস।

—অত জিনিস?

—নেহাৎ যা না হলে নয়, তাই দিয়েছি। ওসব আপনাকে দেখতে হবে না।

—বেশ। তারপর ওদিকের ঐ কালো বাক্সে কী দিয়েছ?

—ওটা আমার।

—তোমার!—বলে থমকে দাঁড়ালেন জজসাহেব। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তুমি কোথায় যাবে!"

—আপনার সঙ্গে যাবো, কোনো রকম দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জয়ন্তী।

—আমার সঙ্গে যাবে কী! সে হয় না, বৌমা।

—বাঃ, তাহলে আপনাকে দেখবে কে? আর ঐ বাচ্চাটাকেই বা কে সামলাবে?

—কিন্তু মা, তোমার যে বড্ড কষ্ট হবে। তুমি জান না, সামান্য পেনসনটুকু ছাড়া ওখানকার জন্যে আমি কিছুই রাখিনি।

—তাতেই আমি চালিয়ে নিতে পারবো।

—তুমি সেখানে থাকবে কি করে? কার কাছে থাকবে?

—কেন, আপনার কাছে।

এর পরে আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না বসন্তবাবু। জয়ন্তী ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, আপনিই তো একদিন আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন।

—জানি মা, বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন বসন্তবাবু, আমিই তোমাকে এনেছিলাম। পরেশের বড় আদরের মেয়ে তুমি। কিন্তু কী চাইলাম, আর কী হল! আমারই ভুল। তার জন্যে তোমার কাছে আমি চিরদিনই অপরাধী হয়ে আছি।

—ও কথা বলতে নেই বাবা। ওতে আমার পাপ হয়। আমার কপাল যদি বাদ সাধে, আপনি কী করবেন। তার জন্যে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই।...আপনার কাছটিতে যেন থাকতে পাই, এর বেশি আর আমি কিছুই চাইনা।...বলতে বলতে জয়ন্তীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। গোছগাছ তখনো শেষ হয়নি। সেই বাকী কাজগুলোর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। বসন্তবাবু আর কোনো কথা তুললেন না। এই কন্যাধিকা নতমুখী বধূটির বঞ্চিত তরুণ জীবনের রিক্ততা তাঁর কাছে একটা বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিল। অনেকক্ষণ তার কর্মব্যস্ত হাতদুটির দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, তোমার মাকে বলেছ?

—'এবার বলবো', কাজ করতে করতে তেমনি মাথা নিচু করে জবাব দিল জয়ন্তী।

—উনি যদি মত না দেন?

—যেমন করে পারি আমি ওঁর মত করিয়ে নেবো।

দেয়ালের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হতেই জয়ন্তী ধড়মড় করে উঠে পড়ল—'ঈস, দশটা বেজে গেল। আপনি চট করে চান করে নিন বাবা। আপনার খাবারটা আমি ওপরেই নিয়ে আসছি।

—আবার ওপরে কেন বয়ে আনবে?—আপত্তি করলেন জজ-সাহেব।

—তা হোক, বলে এক রকম ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

জয়ন্তীর দৃঢ় ধারণা ছিল, শাশুড়ীর কাছ থেকে প্রবল বাধা আসবে, এবং তার জন্যে মনে মনে তৈরী হয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। বীণাপাণি নিজের খাটে শুয়ে ছিলেন। বৌএর প্রস্তাব শুনে শুষ্ক নির্লিপ্ত সুরে বললেন, "যাবে যাও। আমার আর তাতে কী বলবার আছে?" অভিমানের ক্ষুব্ধ সুরটুকু চাপা রইল না। জয়ন্তী অযাচিত কৈফিয়তের মত নিজে থেকেই বলল, অত দূরে একা একা এই বয়সে ওঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের একজন কারো যাওয়া দরকার। আপনি গেলে সংসার চলে না। ঠাকুরঝির কলেজ, তিন মাস পরে পরীক্ষা। কাজেই আমি ছাড়া আর কে যাবে?

—কিন্তু ওঁরই বা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কী দরকার হল, বলতে পার?—উষ্মার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন বীণাপাণি।

—সেটা উনিই ভালো জানেন, মা। কারণ যা-ই হোক, স্থির যখন করে ফেলেছেন, তখন ওঁর ইচ্ছাকেই মেনে নিয়ে সেইমতো আমাদের আর সব ব্যবস্থা করতে হবে, এইটুকুই আমি বুঝি।

—বেশ, যা ভালো বোঝ, তাই কর।

শাশুড়ীর ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দার কোণে অনিমার সঙ্গে দেখা। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। বৌদির একটা হাত জড়িয়ে ধরে অনুনয়ের সুরে বলল, বাবাকে বলে আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল, বৌদি।

—পাগল! তুমি কি করে যাবে? পরীক্ষাটা হয়ে যাক; তারপরে গিয়ে কিছুদিন থেকে এসো।

—ছাই পরীক্ষা। পড়া আমি ছেড়ে দেবো। ঐ বাড়িতে আর থাকা যায় নাকি ?

—ও সব বলতে নেই, ছিঃ! সবাই মিলে মাথা গরম করলে কি চলে ? আর সময় নেই। বাকী কাজগুলো তুজনে মিলে হাতে হাতে করে ফেলি, চল। মেয়েটার এখনো কিছুই হয়নি।...বলে ননদের হাত ধরে একরকম জোর করেই নিচে নিয়ে গেল।

বড় মেয়েকে আগেই খবর পাঠানো হয়েছিল। ওঁদের রওনা হবার কিছুক্ষণ আগেই এসে পড়ল। শঙ্করও একটু সকাল সকাল ফিরে এল ডিস্‌পেনসারী থেকে। যাত্রার সময় হয়ে এল। ছেলেমেয়েরা একে একে বিষণ্নমুখে তেতলার ঘরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করল। তারপর গেল চাকর-বাকর। বসন্তবাবু সবাইকে সময়োচিত সম্ভাষণ জানিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর নেমে গেলেন স্ত্রীর ঘরে। খাটের কাছে গিয়ে বললেন, 'কী হল! এ রকম অসময়ে শুয়ে আছ যে ?' বীণাপাণি কোনো জবাব দিলেন না। বসন্তবাবু একটুখানি অপেক্ষা করে বললেন, 'এই টাকাটা রেখে দাও।' তখনো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার বললেন, 'নাও, আমার বেরোবার সময় হয়ে গেছে।' হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলেন বীণাপাণি। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, সে কথাটাও কি জানতে পারবো না ?

মৃতু হেসে বললেন সান্যাল সাহেব, যাচ্ছি আপাততঃ দেওঘর। কেন যাচ্ছি, তুমি নিজেই বুঝতে পারছ।

—ঐ কুড়িয়ে-পাওয়া পরের মেয়েটাই তোমার বড় হল ? আর তোমার নিজের ছেলেমেয়ে ঘরসংসার কিছু নয় ?

—তারাও আমার কাছে ছোট নয়, ছোট করে কোনদিন দেখিও নি।

—তবে আজ সব ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন ?

—কে বললে, ছেড়ে যাচ্ছি? বলতে পার, দূরে চলে যাচ্ছি। আমি তো চিরদিনই দূরে ছিলাম। আজ সেই প্রয়োজনটাই একটু বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

একটুখানি থেমে আবার বললেন, একসঙ্গে থাকাই তো এক হওয়া নয়। তার জন্যে মাঝে মাঝে দূরে যাওয়া দরকার।

—তোমার এ সব কথা আমি কোনোদিন বুঝতে পারি নি। এ শুধু তোমার জিদ। নিজে যা বুঝবে, কোনো অবস্থাতেই তার একচুল নড়চড় হবে না। সবাইকে দুঃখ দিয়েই তোমার সুখ।

জজসাহেবের মুখে একটি ম্লান হাসির কুঞ্চন দেখা দিল। বললেন, আর সময় নেই, এবার আমি চলি। বৌমা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

বসন্তবাবু পা বাড়াতেই বীণাপাণি মৃদু কণ্ঠে বললেন, দাঁড়াও। সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে এসে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আঁচলে চোখ মুছে বললেন, কখন কি করতে হবে না হবে সব বৌমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। আমার কথা তো কোনোদিন শুনলে না, ওর কথাটা শুনো—বলতে বলতে আবার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

জজসাহেব যখন ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন পিছন থেকে কানে গেল 'দুর্গা দুর্গা'। সেই অতিপরিচিত উদ্বেগাকুল চাপা কণ্ঠের মঙ্গলকামনা। প্রতিবার প্রবাস-যাত্রার পূর্বমুহূর্তে এই দুটি শব্দ তাঁকে চিরদিন অনুসরণ করেছে।

দুর্গা দুর্গা!—চমকে উঠলেন জজসাহেব। অবিকল সেই স্বর। ঠিক পেছনে ঐ দরজার পাশে স্পষ্ট শুনতে পেলেন সেই অশ্রুজড়িত মৃদু কণ্ঠ। চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। ডাকবাংলোর প্রশস্ত নির্জন বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। রাত বোধ হয় অনেক। সামনে মাঠের বুকে নেমে এসেছে গাঢ় অন্ধকার। তারই ভিতর থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিল্লিরব।

স্ত্রীর সঙ্গে বসন্ত সান্যালের সেই শেষ দেখা। ঠিক শেষ নয়, শেষ দেখা হয়েছিল কাশীমিত্রের ঘাটে। পালঙ্কের উপরে দুচোখ বুজে শুয়েছিলেন বীণাপাণি। কপালে, সিঁথি-রেখায় জ্বলজ্বল করছে সিন্দূরের রাগ। দুপায়ে গাঢ় আলতার রক্তিমা। স্বামী-পুত্র-কন্যা-, আত্মীয়-পরিজনের মাঝখানে সেই মৃত্যু-গৌরব-মণ্ডিতা প্রৌঢ়া নারীর দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখছিল কত লোক। কে একজন বৃদ্ধা উল্লাসভরে বলে উঠেছিল, "এ রকম সুখের মরণ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! চমকে উঠেছিলেন বসন্তবাবু। সে সুখের আসল রূপ তো তাঁর কাছে চাপা নেই। কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে? তিনি?

সেই শ্মশানে বসেই শঙ্করের কাছে, মেয়েদের কাছে শুনলেন সব কথা। বেরিবেরি হয়েছিল, কিন্তু কাউকে জানাননি। বুক ধড়ফড় করত, হার্টে কোনো জোর ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, জোরে চলাফেরা সব বন্ধ করতে বলেছিল ছেলেমেয়েরা। গ্রাহ্য করেননি। ওষুধপত্র খেতে চাইতেন না। কোনো রকম যত্ন ছিল না শরীরের উপর। রোজকার মত খেয়ে-দেয়ে রাত দশটায় শুয়ে পড়েছেন। হঠাৎ কী হল। দুচারবার কাশলেন, একবার ডাকলেন মেয়ের নাম ধরে। কী রকম বিকৃত গলা। পাশের ঘর থেকে ছুটে আসতে না আসতে সব শেষ। সেই রাত্রেই টেলিগ্রাম গেল দেওঘর। কোথায় বোধহয় লাইন খারাপ ছিল। বসন্তবাবু পেলেন তার পরদিন দুপুরের দিকে। কলকাতায় পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সারাদিন অপেক্ষা করে দেহ তখন শ্মশানে এনে নামানো হয়েছে।

চিতা যখন নিবে আসছে শ্মশানের কোলাহল থেকে খানিকটা দূরে একটু অন্ধকার নিরালায় গিয়ে দাঁড়ালেন জজসাহেব। তামসী রাত্রির কালো আবরণে ঢাকা গঙ্গার দিকে চেয়ে আবার সেই পুরানো প্রশ্নটাই মনে জাগল—এই দুর্ভাগিনী নারীর অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী

কে? বিবাহের পর প্রথম কয়েকটা বছর বাদ দিলে, এই দীর্ঘ জীবন এঁকে তিনি বুঝতে পারেননি, নিজেকেও বুঝবার সুযোগ দেননি। দৃঢ় ঋজু পদক্ষেপে নিজের পথে চলেছেন। আর একজন যে দুর্বল বলে, অক্ষম বলে পিছিয়ে পড়ে রইল, তার দিকে ফিরে তাকাননি। যাঁকে জীবন-সঙ্গিনী বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে সহযাত্রী করতে পারেননি। নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের সমস্ত কঠোরতা নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গতা আর একজনের কাছেও যে কতখানি দুঃসহ সেকথা ভেবে দেখেননি। তাঁর মন, বুদ্ধি, আদর্শ, সংস্কার যদি তাঁকে এগিয়ে আসতে বাধা দিয়ে থাকে, সে দোষ কি তাঁর? সেজন্যে তাঁকে পথের ধারে ফেলে যেতে হবে? এ কোন বিচার? এ কোন ন্যায়ধর্ম?

এতদিন পরে এই শ্মশানপ্রান্তে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বসন্তবাবুর মনে হল, তিনি ভুল করেছেন। এখানেও তিনি ভ্রান্ত বিচারক। ন্যায়ের কঠোর আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে শুধু কঠোরতাকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, ন্যায়কে আশ্রয় করতে পারেননি। একথা তাঁর মনে হয়নি, অক্ষমতা অপরাধ নয়, অক্ষম বলেই কাউকে বর্জন করা যায় না। তাকে কাছে টেনে নেওয়া শুধু মানবধর্ম নয়, ন্যায়ধর্ম। সংসারে চলতে গেলে কিছু নিতে হয়, কিছু ছাড়তে হয়। নিরন্তর গ্রহণ ও বর্জনের মিলিত পথে চলার নামই জীবনযাত্রা।

ভুল তিনি আরও করেছেন,—আর এক জায়গায় আর একজনের বেলায়। তাঁর পরম স্নেহের পাত্রী পুত্রবধূ। বধূ, কিন্তু তার বধূ-জীবনের মঙ্গলদীপ জ্বলে উঠেই নিবে গিয়েছিল। সেখানকার সমস্ত সুধা, সমস্ত মাধুর্য অনাস্বাদিত রয়ে গেছে। সেই অতৃপ্ত, অশান্ত, বুভুক্ষু হৃদয়ের কাছে তিনি সঁপে দিলেন একটি সদ্য মাতৃহারা শিশু। না; নিজে হাতে ঠিক সঁপে দেননি। সে যখন উদগ্র তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে এসে

জড়িয়ে ধরল এই নতুন আশ্রয়টিকে, তখন নিঃশব্দে চেয়ে দেখলেন। বারবার বলি বলি করেও বলতে পারলেন না, বৌমা, ও তোমার কেউ নয়। দুদিনের তরে এসেছে তোমার জীবনে, দুদিন পরে চলে যাবে। অমন করে জড়িও না। ও নিতান্তই পর, পরের গচ্ছিত সম্পত্তি। চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই ফিরিয়ে দিতে হবে। ওকে অমন করে বেঁধো না। কষ্ট পাবে। এই কঠিন কিন্তু সরল সত্য কথাটি তিনি বলতে পারেননি। দেওঘরের বাড়িতে দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছেন, একটি নবজাগ্রত মাতৃহৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীগুলো ধীরে ধীরে অলক্ষ্য বন্ধনে এই শিশুটিকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। তবু কোনোদিন সেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে পারেননি। সে কি ঐ বঞ্চিতা নারীর মুখের দিকে চেয়ে? হয়তো তাই। কিন্তু তাঁর মত ন্যায়নিষ্ঠ, কঠোর-ধর্মী বিচারকের এ দৌর্বল্য শোভা পায় না। সেই তো একদিন বলতে হল, ভেঙে দিতে হল তার সব স্বপ্ন, সব ভুল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দেওঘরে পৌঁছবার কিছুদিন পর। জয়ন্তী তখনো সব গোছ-গাছ করে উঠতে পারেনি। একদিন শ্বশুরের ঘরে ঢুকে বলল, বাবা, একটা দরকারী জিনিস ভুল হয়ে গেছে।

—কী জিনিস মা?

—মায়ার জন্যে একখানা গাড়ি আনা হয়নি।

—মায়া!

—ওখানে ওর কী নাম ছিল তাতো জানি না, আর তা দিয়ে আমাদের দরকারই বা কী! আমি ওর নাম দিলাম, মায়া।

বসন্তবাবু মনে মনে বললেন, এ নাম তো তুমি ইচ্ছা করে দাওনি, তোমার মুখ দিয়ে দিয়েছেন তোমার ভাগ্য-বিধাতা। এ তাঁরই এক নিষ্ঠুর কৌতুক। যাকে খাইয়ে-পরিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে

তোমার আশ মিটছে না, যার গাড়ি আনা হয়নি বলে তুমি ছটফট করে বেড়াচ্ছ, আসলে সে মায়া। হঠাৎ একদিন শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এ কথাটা তখনই ওকে বলতে পারতেন জজসাহেব, জানাতে পারতেন এ মায়ার বাঁধন একদিন তোমাকে নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তার জন্যে তৈরি হও। কিন্তু বলা হল না।

শ্বশুরকে নীরবে বসে থাকতে দেখে জয়ন্তী আবার পাড়ল কথাটা— কাশীকাকা তো মাঝে মাঝে কলকাতা যান। একখানা পেরাম্বুলেটর আনতে পারবেন না?

—তা পারবে বৈকি? বাজার করতে ওর জোড়া নেই।

—তাহলে ওঁকে ডেকে পাঠাই?

—তা তো পাঠাবে। কিন্তু একখানা পেরাম্বুলেটর মানে একমুঠো টাকা।

—তা হোক, ও টাকা আমি দেবো। আপনি অমত করবেন না। বলে মতামতের অপেক্ষা না করেই চলে গেল অন্য কাজে।

কয়েকদিন পরেই একটা বেশ দামী পেরাম্বুলেটর এনে হাজির করল কাশীনাথ এবং নিচে থেকে রীতিমত হাঁকডাক শুরু করে দিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে এল জয়ন্তী—বাবা, দেখবেন আসুন, কী সুন্দর গাড়ি এসেছে আমার মায়ামণির, আর কী গম্ভীর হয়ে বসে আছে একবার যদি দেখেন। একেবারে কুইন ভিক্টোরিয়া!

জজসাহেবের মুখে পড়ল গাম্ভীর্যের ছায়া। সঙ্গে সঙ্গে জোর করে টেনে-আনা খুশীর আবরণে তাকে ঢেকে ফেলে বললেন, তাই নাকি? তাহলে তো হার ম্যাজেস্টিকে একবার দেখতে হয়। একটা কুর্নিশও বোধহয় করতে হবে।

জয়ন্তী হেসে উঠল, এবং শ্বশুরকে আরেকবার তাগিদ দিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতেই নিচে নেমে গেল। গাড়িবারান্দার নিচে সদর

দরজার সামনে ভীষণ সোরগোল। কাশীনাথ একাই জমিয়ে তুলেছে আসর।

—রংটা পছন্দ হয়েছে তো মালক্ষ্মী?

জয়ন্তী ঘাড় নেড়ে বলল, খু-ব। কচিকলাপাতা আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।

—তাই তো ইচ্ছে করেই নিলাম এটা। আগুনের ফুলকির মত মেয়ে তোমার, এমনটি আর কোনো রং-এ মানাত না। ভাখ না, কী রকম দেখাচ্ছে! ঠিক যেন পদ্মপাতায় ঘেরা কমলকলি।

—সত্যি তাই, অস্ফুট মৃদুস্বরে বলল জয়ন্তী। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সেই দিকে। কাছে গিয়ে চুলগুলো নেড়ে দিয়ে চিবুক ধরে একটু আদর করল মেয়েকে। তারপর হঠাৎ চারদিকে চেয়ে লজ্জা পেল এবং সেইটুকু ঢাকবার জন্যে কাশীনাথের দিকে ফিরে বলল, আপনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখেন, কাশীকাকা।

কাশীনাথ একেবারে গলে গিয়ে বলল, কেন, কেন? সেকথা কেন মনে হল, বলতো।

—বাঃ, তা নাহলে কেউ অমন সুন্দর করে বলতে পারে—'পদ্ম-পাতায় ঘেরা কমলকলি'।

—হেঁ হেঁ, তা তোমার কাছে সত্যি কথাই বলবো, মা। ছেলে-বেলায় দুএকটা পদ্য-টদ্য যে না লিখেছি তা নয়।

—তাই বলুন, তা ছাড়লেন কেন?

—ছাড়লাম কি আর সাধে? অনেক দুঃখে ছাড়তে হল।

—কি রকম?

—খাতাটা লুকিয়েই রেখেছিলাম। একদিন পড়বি তো পড়. একেবারে বাবার হাতে, বাঘের হাতেই বলতে পার।

—কেন? তিনি বুঝি ওসব পছন্দ করতেন না?

—পছন্দ! ছেলে যদি তাঁর ঘরে আগুন দিত, তাহলেও বোধহয়

অতখানি ক্ষেপে যেতেন না। ডাকিয়ে এনে বললেন, কাব্যি রোগে ধরেছে? এসো একটু ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।

—ওষুধ!

—ওষুধ বলে ওষুধ? কান দুটো এইসা করে চেপে ধরে হেঁইও হেঁইও করে পঁচিশবার ওঠবস।

জয়ন্তী খিল খিল করে হেসে উঠল।

ওষুধের ডোজটা বোধহয় যথেষ্ট হয়নি, কাশীনাথ।—জজসাহেবের গলার আওয়াজ। কখন এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছেন, ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি। কাশীনাথ জিব কেটে মাথা চুলকোতে লাগল।

জয়ন্তী আবার হেসে উঠল, তারপর বলল, দেখুন, কী চমৎকার গাড়ি এনেছেন কাশীকাকা। আর কী রকম মানিয়েছে!

—বেশ! একবার গাড়ি আলো করে বসে-থাকা মেয়েটির দিকে, আরেকবার মাতৃ-গৌরবে উদ্ভাসিত তাঁর পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে সকলের অলক্ষ্যে জজসাহেবের বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। কাউকে তা জানতে দিলেন না। শুধু বললেন, বেশ। পরক্ষণেই মনে হল, এ কোন্ পথে চলেছেন তিনি! কোন্ পথে চলেছে জয়ন্তী? এ জোয়ারের বেগ রোধ করবে কে?

সেদিনও কিছুই বলা হল না। তারপর গড়িয়ে চলল দিন, মাস, বছর। জয়ন্তী ভুলে গেল এ তার নিজের মেয়ে নয়, তার পেটে জন্মায়নি। জজসাহেবেরও সব সময়ে সে কথা মনে থাকত না। মাঝে মাঝে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠতেন। মনে মনে হিসাব করতেন, পাঁচ বছরের আর কত দিন বাকী। কখনো মনে হত, ভুলে আছে, থাক। দুঃখ তো ওর বিধিলিপি। তার জন্যে সারাজীবন পড়ে আছে। এই আশ্রয়টুকু আঁকড়ে ধরে কটা দিন যদি তাকে এড়িয়ে চলতে পারে, ক্ষতি কি? আবার ভাবতেন, সেই আকস্মিক আঘাত সইতে পারবে তো? তার চেয়ে আগে থেকেই তৈরি হোক। একটু একটু করে

গুটিয়ে নিয়ে আসুক বাহুপাশ, শিথিল করে আনুক ঐ নিবিড় বন্ধন। কিন্তু কেমন করে কী বলে পাড়বেন সে কথা, কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। তারপর বোধহয় নিজেকে ছেড়ে দিলেন ভবিতব্যের হাতে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওদিকের সঙ্গে সম্পর্কটাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। অন্যান্য কারণের মধ্যে তার মূলে ছিল দুটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। একটি মারাঠী মেয়েকে বিয়ে করেছিল শঙ্কর। চিকিৎসা-সূত্রে পরিচয়, ক্রমশঃ প্রণয় এবং শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে তার পরিণতি। বিবাহ স্থির হবার পর যথারীতি বাবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছিল ঠিকই। অনাবশ্যক মনে করে উত্তরটা আর তিনি দেননি। বাড়িতে উৎসব, অনুষ্ঠান কোনোটাই হয়নি। রেজিস্ট্রেশনের পর কোনো অভিজাত হোটেলে যথাযোগ্য পার্টির আয়োজন হয়েছিল। শঙ্করের পশার তখন দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—অনিমার চাকরি। তার আগেই সে ভাল ভাবে বি. এ. পাশ করেছিল, মারাঠী ভ্রাতৃবধূর শুভাগমনের কিছুদিন পরেই হঠাৎ এই চাকরিটি জুটিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল দিল্লী। সে খবরও ডাকযোগে জানতে পেরেছিলেন সান্যাল সাহেব। ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই হয়েছিলেন, বলা চলে। হ্যাঁ; তা একরকম নিশ্চিন্ত বৈকি। বন্ধন নেই, আকর্ষণ নেই। একদিন যারা তাঁকে ঘিরে থাকত, একে একে সবাই সরে গেল, গড়ে তুলল নিজের নিজের চারদিকে একটি করে বৃত্ত। তিনিও ফাঁকা হয়ে গেলেন। এই তো নিশ্চিন্ত জীবন। বাকী রইল এক জয়ন্তী। সেও বৃত্ত রচনা করছে। একদিন যখন সেটা ভেঙ্গে যাবে, তখন? সে পরিণাম আজকাল আর ওঁকে বিচলিত করে না। কী হবে ভেবে? সব চিন্তা দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন কোনো এক দিকে। ছাতাটা নিয়ে ঘুরে আসেন করণীবাগ কিংবা বোম্পাস শহর। কখনো বা নন্দন পাহাড়ের

মাথার উপরে একটা নির্জন কোণ বেছে নিয়ে বসে থাকেন দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে।

বন্ধুহীন, বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ জীবন।

মায়া বড় হয়ে উঠল। বছর ছয়েক হবে, দেখায় তার চেয়ে বেশি। দামাল, দুরন্ত, কার সাধ্য সামলায়। স্নেহ আছে, শাসন নেই। একদিকে মায়ের প্রশ্রয়, আরেক দিকে দাদুর নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য। বলগাহীন তেজী ঘোড়ার মত বাগ-না-মানা গতি। নির্বাধ ঝরনার মত উচ্ছল। কোথায় থাকে, কোথায় যায়, জয়ন্তী জানতেও পারে না। সংসার ছোট হলেও কাজ কম নয়। সব সে নিজে করে। রান্না-বান্না থেকে বাজার করা, ঘর দোর গোছানো, শ্বশুরের দেখাশোনা থেকে মেয়ের ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট। ওরই মধ্যে একটু সময় করে মেয়েকে পড়াবার ভারটাও কিছুদিন নিজের হাতে রেখেছিল। কিন্তু তাকে ডেকে পাওয়া যায় না, পড়াবে কখন! তারপর একটি অল্পবয়সী মাস্টার বহাল হল, সে পড়াবে যতটুকু, তার চেয়ে খেলা এবং গল্প করবে বেশি। সেও নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছে। দুদণ্ড যে স্থির হয়ে বসতে জানে না, তাকে সামলাবে কেমন করে?

একদিন বিকালবেলা বেড়াতে যাচ্ছিলেন বসন্তবাবু। জয়ন্তী এসে বলল, বাবা, মায়াটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিই। বাড়িতে পড়াশুনো কিচ্ছু হচ্ছে না।

—কেন, ওর মাস্টার কী করে?

—তাকে মানলে তো?

জজসাহেব হাসলেন, বড্ড দুষ্টু হয়েছে। বেশ, দাও। কিন্তু ইস্কুল পালাবে না তো?

—তা, প্রথম প্রথম কি আর না পালাবে? তারপর আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। একেবারে বুনো হয়ে গেল বাড়ি বসে।

বসন্তবাবু লাঠিটা হাতে করে পা বাড়ালেন। জয়ন্তী ক্ষণকাল কী চিন্তা করে বলল, স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। দরখাস্তের ফরমও দিয়ে দিয়েছেন। ওর বাবার নামটা দরকার হবে।

জজসাহেবের বুকের ভিতরটা চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দমন করে সহজভাবেই বললেন, এখন স্কুলে দেবার দরকার কি? থাক না কিছুদিন। ঐ মাস্টারটিকে বদলে একজন বয়স্ক লোক বরং রেখে দাও।

প্রস্তাবটা বোধহয় পুরোপুরি ওর কানে পৌঁছল না। নিজের কোনো চিন্তার মধ্যেই ডুবে রইল কয়েক মিনিট। তারপর খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলল জয়ন্তী, আমি বলছিলাম কী, সবাই জানে মায়া আপনার নাতনী, আর বলতে গেলে ও এখন আমাদেরই তো মেয়ে। আমাদের পদবীটাই থাক না ওর নামের শেষে। নাই বা রইল বাবার নাম।

জজসাহেব ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আমার নাতনী, তোমার মেয়ে—এটা তো ওর সত্যি পরিচয় নয়, মা।

জয়ন্তী ভাবতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। মনে মনে বলল, সত্যি না হলেও এইটাই তো আসল পরিচয়। যে বাপ-মাকে ও মনে করতেও পারে না, একজন মরে গেছে, আরেকজন জেলে গেছে, তাদের পরিচয় আবার কিসের পরিচয়? সে পরিচয় লুপ্ত হয়ে যাওয়াই তো ওর মঙ্গল। কথাটা মনে মনে বললেও মুখ ফুটে বলতে পারল না। কঠোর সত্যনিষ্ঠ শ্বশুরকে সে চেনে, মনে মনে ভয় করে।

বসন্তবাবু পুত্রবধূকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, তাছাড়া বাপের নামটা উল্লেখ না করবার কী কারণ দেখাবে তুমি সেক্রেটারীর কাছে।

তাইতো। সে দিকটা ঠিক ভেবে দেখেনি জয়ন্তী। অভিভাবক হিসারে দাদুর নাম অবশ্যই থাকবে। কিন্তু স্কুল-কর্তৃপক্ষ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কী নাম ওর বাবার? নিয়ম যখন রয়েছে, আর কোনো কারণে না হোক, দরখাস্তের ঘর এবং ওদের খাতাপত্রের পংক্তি পূরণ করবার জন্যে ওটা নিশ্চয়ই দরকার হবে। হঠাৎ মনে হল, ভাস্করের নামটা বসিয়ে দিলে কেমন হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্বার যন্ত্রণা কোন্ অন্তস্তল থেকে উঠে এসে যেন বুক চেপে ধরল। পাছে এই আকস্মিক ভাবান্তর শ্বশুরের চোখে ধরা পড়ে যায় তাই এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে মাথা নত করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। এখন অন্ততঃ কিছুক্ষণ তার একা থাকা দরকার।

সেইদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে নন্দন পাহাড়ের উপর বসে জজসাহেব স্থির করলেন, আর দেরি নয়, আজই সব ইতিহাস ওকে জানিয়ে দিতে হবে। মিথ্যার মোহজালে যে জড়িয়ে আছে, তাকে উদ্ধার করতে হলে সবল হস্তের প্রয়োজন। সেখানে দৌর্বল্যের স্থান নেই। রূঢ় আঘাত দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে নির্মম সত্যের মুখোমুখী। তাতে যদি বুক ভেঙ্গে যায়, যাক। একদিন তো যাবেই। তার আর বাকী কই? কয়েকটি মাস মাত্র। তখন তো সইতেই হবে। যা অবশ্যম্ভাবী, যাকে রোধ করা যাবে না, তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করাই তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

বাড়ি ফিরতে একটু রাত হল। সিঁড়ির মুখেই মায়ার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখনো ঘুমোতে যাওনি? ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটের উপর রেখে চাপা গলায় বলল, চুপ, মা ঘুমোচ্ছে।

—ঘুমুচ্ছে! এ সময়ে ঘুমুচ্ছে, মানে?

—বাঃ, মার অসুখ করেছে, জান না? ডাক্তারবাবু বললেন, গোলমাল করো না, মা এখন ঘুমোবে।

জজসাহেবের সাড়া পেয়ে কাশীনাথ এসে দাঁড়াল। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলল, ভয়ের কিছু নেই। প্রেসারটা খুব লো, হার্টও একটু দুর্বল রয়েছে। ডাক্তারবাবু বললেন, কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিলেই সেরে উঠবেন। আর খাবার-দাবারের দিকে একটু নজর দিতে হবে। ওষুধ লিখে দিয়ে গেছেন। নবীনকে পাঠিয়েছি ডাক্তারখানায়।

ঐখানে দাঁড়িয়েই মোটামুটি ব্যাপারটা জানতে পারলেন বসন্তবাবু। কাশীনাথ যেমন রোজ একবার করে খোঁজ-খবর নিয়ে যায়, আজও তেমনি এসেছিল। বৌমাকে দেখতে না পেয়ে ঝিকে জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল, তিনি শুয়ে আছেন, শরীর ভালো নেই। জয়ন্তী অবশ্য অসুখের কথাটা মানতে চাইছিল না এবং ডাক্তার ডাকবার প্রস্তাব শুনে ভয়ানকভাবে আপত্তি করেছিল। কিন্তু কাশীনাথের মনে হল চোখমুখের অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নয়, নাড়ীটাও দেখল বেশ দুর্বল। তাই সাহেবের জন্য অপেক্ষা না করেই হরিশ ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছে।

—বেশ করেছ, বললেন জজসাহেব, আর কিছু বললেন হরিশবাবু?

—না; আর বিশেষ কিছু বললেন না। ওষুধটা যেন নিয়ম মত চলে, আর তার সঙ্গে একটু পুষ্টিকর খাবার-দাবার—

হুঁ; সেটা অনেক আগেই দেখা উচিত ছিল। একেবারেই খেয়াল হয়নি—আপন মনে এই কথাগুলো বলতে বলতে বসন্তবাবু চিন্তিতমুখে তাঁর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

বৌমার শরীরটা যে ইদানীং একটু কাহিল কাহিল দেখাচ্ছিল, চোখমুখের সে ঔজ্জ্বল্য নেই, কদিন আগেই লক্ষ্য করেছিলেন সান্যাল সাহেব। এ সম্বন্ধে ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার, তাও মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। তারপর কখন সব ভুলে গেছেন। সত্যিই তো। সে-ই

শুধু সারাক্ষণ ওঁদের সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে, আর তার মুখের দিকে কেউ তাকাবে না, এর চেয়ে অবিচার আর কী হতে পারে? অথচ এইটাই যেন নিয়ম। তাঁর খাবার সময় জয়ন্তী নিয়মিত উপস্থিত থাকবে, কোনো জিনিসটি ফেলে রাখবার উপায় নেই। কোন্‌টা তাঁর পছন্দ, কোন্‌টা পছন্দ নয়—সে বিষয়ে তার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। কিন্তু সে কী খায়, কখন খায়—তার কোনো খোঁজই তো তিনি রাখেন না। এই বধূটির অনলস যত্ন ও সেবা তিনি গ্রহণ করে চলেছেন, একবার ফিরেও দেখছেন না, নিজের ন্যূনতম যত্নটুকুও সে নিচ্ছে কিনা। নিজের সম্বন্ধে এই মেয়েটি যে অত্যন্ত উদাসীন, তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। বেশ-ভূষা, এ বয়সী মেয়েরা যার উপর প্রখর মনোযোগ দিয়ে থাকে—ওর নেই বললেই চলে। খাওয়ার বেলাতেও তাই। নিশ্চয়ই পেট ভরে খায় না, কিংবা, রোজকার খাবারের যেটা পুষ্টিকর অংশ—দুধ, ঘি, ডিম, মাংস, কি একটু ফল—এসব হয়তো স্পর্শ করে না।

হঠাৎ মনে পড়ল প্রথম যৌবনের কথা। বীণাপাণিও ঐ জিনিসগুলো খেতে চাইতেন না। তাঁর প্রধান খাদ্য ছিল—ভাত ডাল, একগাদা ভাজা কিংবা হরেক রকম তরকারী দিয়ে চচ্চড়ি নামক একটি মারাত্মক হজ্‌পজ্‌। কম বকাবকি করেছেন এই নিয়ে! বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে উঠল বসন্তবাবুর। আজ সে কোথায়! এই অসক্ত দুর্বল স্কন্ধে সমস্ত ভার চাপিয়ে দিব্যি পাড়ি দিয়ে চলে গেল। এসব এখন কে করে? কে দেখে এই বৌটাকে? কে একটু যত্ন নেয়?

বহুদূরে ফেলে-আসা সেই দিনগুলোর মধ্যে এমন গভীর ভাবে ডুবে গিয়েছিলেন জজসাহেব যে বেড়িয়ে এসে জামাকাপড় ছাড়বার কথাটা পর্যন্ত মনে হয়নি। হঠাৎ বাইরে কাদের সাড়া পেয়ে সজাগ হয়ে উঠলেন। কে কোথায় গেল, মায়ার খাওয়া হল কিনা, রোগীর

পথ্যের কী ব্যবস্থা হল, এসব খোঁজখবর নেবার জন্যে বেরোতে যাবেন, এমন সময় ঠাকুর খাবার নিয়ে ঢুকল, তার পেছনে জয়ন্তী।

—একি! তুমি কেন উঠে এলে বৌমা?

—এখন বেশ ভালো আছি, ম্লান হেসে উত্তর দিল জয়ন্তী।

—না, না; মোটেই ভালো নেই। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আমি।

ঠিক সেই সময়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে ঢুকল মায়া। কোনো রকম ভূমিকা না করে বলল, মাকে বেশ করে বকে দাও তো, দাদু। ডাক্তারবাবু শুয়ে থাকতে বলে গেছে না?

—থাক, তোকে আর গিন্নিপনা করতে হবে না। তুই না ঘুমুচ্ছিলি?—কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলল জয়ন্তী।

জজসাহেব বললেন, না, না। ও ঠিক কথাই বলেছে। উঠে আসা তোমার একেবারেই উচিত হয়নি। তুমি যাও, ওকে নিয়ে শুয়ে পড়গে। কী খেয়েছ?

—দুধ খেয়েছি এক বাটি।

—না, দাদু, এই এতটুকু খেয়েছে মোটে—প্রতিবাদ জানাল মায়া এবং ছোট ছোট আঙুল দিয়ে সে পরিমাণটাও দেখিয়ে দিল।

—এসব তো ভালো কথা নয়, মা। আচ্ছা, কাল থেকে তোমাকে আমার সামনে বসে খেতে হবে।

—সর্বনাশ!

--কেন, তাতে দোষ কি?

—মেয়েদের খাওয়া গুরুজনদের দেখতে নেই, বাবা।

—ওসব বাজে কথা, কুসংস্কার। তোমার শাশুড়ী থাকলে তো আর আমাকে—বলেই থেমে গেলেন। কথাটা যেন মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। এই কিছুক্ষণ আগে এই পথেই চলেছিল চিন্তাধারা। হয়তো সেই কারণেই। কিন্তু বাকীটুকু অসমাপ্তই রয়ে গেল। যা

হতে পারত আজ আর পারে না, অনর্থক সে কথা তুলে কী লাভ। এখন এটা তাঁরই কাজ, তাঁকেই করতে হবে।

—তুমি এখন শুতে যাও, বৌমা, আর রাত করো না। ওষুধটা খেয়েছ?

জয়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, খেয়েছি।

দীর্ঘকাল পরে শ্বশুরের মুখে স্বর্গতা পত্নীর উল্লেখ এই প্রথম শুনল জয়ন্তী। খানিকক্ষণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল সেই আনত গম্ভীর মুখের দিকে। মনে হল, সকলের মত সে-ও বোধহয় এই নির্বাক কঠোর মানুষটিকে ভুল বুঝে এসেছে। পাহাড়ের পাষাণময় কাঠিন্যই সকলের চোখে পড়ে। তার কোন্ নিভৃত অন্ধকারে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে যে সূক্ষ্ম জলরেখা, ক'জন তা দেখতে পায়? বাইরে থেকে যাকে শুধু বালুরাশি বলে জানি, তার অন্তরেও লুকিয়ে থাকে ফল্গুধারা।

নন্দন পাহাড়ে বসে যে সংকল্প স্থির করে এসেছিলেন জজসাহেব, তা আবার ওলটপালট হয়ে গেল। তার বদলে নিজের হাতে তুলে নিলেন পুত্রবধূর চিকিৎসা এবং খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত। কিন্তু এ সব তাঁর ধাতে নেই। এই খবরদারির উৎপাতে জয়ন্তীর অসুখটা কমছে কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু অস্বস্তি বাড়ছে তা স্পষ্ট দেখা গেল। বসন্ত সান্যালের চোখের দৃষ্টিতে, মুখের রেখায়, এবং স্বভাবে, আচরণে এমন একটা সহজাত গাম্ভীর্য ও গভীরতা আছে, যার কাছে মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ আপনা থেকেই বাধা পায়। সে মেয়ে যতই আপনার জন হোক, ওঁর সান্নিধ্যে এলেই তার মাথা নুইয়ে পড়ে, কথা পথ পায় না, হাসির উৎস বন্ধ হতে চায়। নিজের স্বভাবের এই দিকটা তাঁর অজানা নয়। তাই জয়ন্তীর কাছে সহজ হতে গিয়ে কৃত্রিম হয়ে পড়েন। কথাবার্তার মধ্যে চেষ্টাকৃত তরলতা তাঁর নিজের কানেই কেমন বিসদৃশ মনে হয়, এবং তার জন্যে লজ্জা বোধ করেন।

কী করা যায় ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, এ ভারটা তো অনায়াসে কাশীনাথের উপর ছেড়ে দেওয়া যায়। এ লোকটির সংসার বলতে এক স্ত্রী, যিনি প্রায় সারাদিন জপতপ পূজাপাঠ নিয়ে আছেন, নিজের মধ্যেই পরিতৃপ্ত। দুটি মেয়ে; দুটিরই বিয়ে হয়ে গেছে এবং তারা ছেলেপিলে নিয়ে সুখে আছে। নিজের কোনো ঝঞ্ঝাট নেই বলে পরের ঝঞ্ঝাট বয়ে বয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যে তার দিন কাটে। সে রকম কিছু যখন থাকে না, অর্থাৎ কারো বাজার করা, ছেলেমেয়েকে ডাক্তার দেখানো, বুড়ো মা কিংবা রুগ্না স্ত্রীকে বৈদ্যনাথ দর্শনে নিয়ে যাওয়া—এই জাতীয় পরোপকারের যখন অভাব ঘটে, কাশীনাথ পাত্রের ঘুম হয় না, হজমে ব্যাঘাত ঘটে। দেওঘরের বাঙালী সমাজে এবং কিছু কিছু বিহারী পরিবারেও কাশীনাথ আত্মীয়ের স্থান দখল করে আছে। জজসাহেব তার পুরাতন এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন মনিব। তিনি যেদিন দেওঘরে বসবাস করতে এলেন (স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যেই তাঁর কলকাতা ছেড়ে আসা, এই কথাই জানত কাশীনাথ) সেদিন সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। তেমনি ভয়ও হল মনে মনে। মনিবকে সে চিনত। তাঁকে সম্ভ্রম করা চলে, দূরত্ব বাঁচিয়ে সেবা করা চলে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা যায় না। যতই কাছে আসবার চেষ্টা কর, মাঝখানে একটা বেড়া থাকবেই। অথচ এরকম অমায়িক সদাশয় স্নেহশীল মানুষ দেখা যায় না। এই দুর্বোধ্য মনিবের সঙ্গে কিভাবে চলবে, কি করে এই প্রবাস জীবনে তাঁর তুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যাবে, এই সব ভাবনাই তার মন অধিকার করে ছিল। কিন্তু জয়ন্তী এবং তার ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখা মাত্রই তার সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। ওরা তাকে দুদিনেই আপন করে নিল। কাশীনাথও তার অন্যান্য দায়িত্ব এবং অন্যত্র যাতায়াত যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়ে অতি সহজেই সান্যাল পরিবারের চতুর্থ ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াল।

জজসাহেবের সঙ্গে কাশীনাথের যোগাযোগ কদাচিৎ। সেদিন

যখন তাঁর ঘরে ডাক পড়ল, একটু ভয়ে ভয়েই গিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে। কর্তা বললেন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, কাশী।

—আজ্ঞে করুন, বিগলিত হয়ে বলল কাশীনাথ।

—বৌমার ওষুধ, পথ্য, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, ডাক্তার যেমন যেমন বলছেন, ঠিক সে রকম হচ্ছে না। ওটা তোমাকে দেখতে হবে।

—আজ্ঞে এ আর এমন কঠিন কি? আমি দুবেলা তদারক করে যাবো।

কাশীনাথ যতটুকু বলে, করে তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এতদিন যে ছানা প্রায়ই বিড়ালের ভোগে ব্যয় হত, অর্ধ-সিদ্ধ ডিমের অর্ধেক যেত নর্দমায়, এখন তা কাশীনাথের সস্নেহ ধমকসহ জয়ন্তীকে নিয়মিত গলাধঃকরণ করতে হয়। দুধের বাটির তলানিটুকু ফেলে রাখলে কাশীকাকা রসাতল কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

একদিন ওভালটিনের পেয়ালায় চামচে নাড়ছিল জয়ন্তী, আর সামনে বসে অনর্গল বক বক করে যাচ্ছিল কাশীনাথ। হঠাৎ বাইরের বারান্দায় জজসাহেবের জুতোর আওয়াজ কানে যেতেই কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। চোখের ইঙ্গিতে জানাল, কর্তা বেরোলেন। জয়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা কাশীকাকা, আপনি বাবার কাছে চাকরি করতেন কেমন করে?

—কেন?

—এখনই যে রকম ভয় আপনার, তখন যে হার্টফেল করেননি, এইটাই আশ্চর্য।

—তা যা বলেছ, মা। তবে হার্ট বেচারা পুরোপুরি ফেল না করলেও অনেকবার করবো করবো করে কোনো রকমে টিকে গেছে।

—অথচ, ঐ রকম শান্ত মানুষ! কাউকে বকেন না, ধমকান না, রাগ বলে কোনো জিনিস নেই, উঁচু গলায় একটা কথা পর্যন্ত বলেন না কারো সঙ্গে।

—তাহলে কি হয়, কী রকম রাশভারী লোক দেখছ তো। কাছে দাঁড়ালে বুক ঢিপ ঢিপ করে। জানো বৌমা, সাহেব যেদিন সাবজজ হয়ে এলেন, আমি তখন খুলনায়। পরদিন থেকেই এই বাঁ হাতটা অচল হয়ে গেল।

—অচল হয়ে গেল! কেমন করে? বিস্ময় ভরে প্রশ্ন করল জয়ন্তী।

—মানে, ওর রোজগারটা বন্ধ হয়ে গেল। টেবিলের তলা দিয়ে ঐ বাঁ হাতই তো যা কিছু আনত। ডান হাত মাসকাবারে সই করে যে-কটা টাকা পেত, সে তার কাছে কিছুই না।

এ সম্বন্ধে জয়ন্তীরও কিছু কিছু ধারণা ছিল। তার বাবাও মুন্সেফ থেকে সাবজজ হয়েছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছিল কোনো কোনো পেসকার ঘুস নিয়ে থাকে। বলল, বাবা বুঝি ঐ নিয়ে খুব কড়াকড়ি করতেন?

—মোটেই না। ওদিকে ওঁর লক্ষ্যই ছিল না। তবু কী ছিল ঐ গম্ভীর মুখে, একবার তাকিয়ে দেখেই আর হাত উঠল না। কিন্তু পেসকারের সাধু হওয়াও বিপদ। উকিলবাবুরা চটলেন। হাতে একখানা নোট গুঁজে দিয়ে গাধা গরু পার করিয়ে নেবেন, সেটা আর হয় না। সব দেখে শুনে, হুঁশিয়ার হয়ে করতে হয়। পাকাপোক্ত কড়া হাকিম। সে সব কে বোঝে? একদল মামলাবাজ মক্কেল আর কতগুলো আমলাও পেছনে লাগল। শেষকালে সবাই মিলে জোট বেঁধে আমার নামে বেনামা ঝাড়ল জজসাহেবের কাছে।

—বেনামা মানে?

—মানে নাম ধাম না দিয়ে উড়ো দরখাস্ত। কাশী পাত্র ঘুষ খায়, অমুক দিন অমুকের কাছ থেকে অত নিয়েছে। এই এতবড় এক ফিরিস্তি।

—কী সর্বনাশ! মিথ্যে করে লিখল আপনার নামে?

—সব কি আর মিথ্যে? সত্যি-মিথ্যেয় জড়ানো। আগে নিতাম তো বেশ কিছু।

—তারপর?

—তারপর স্যর আমাকে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। যেতেই হাতে দিলেন সেই বেনামা দরখাস্ত।

—উনি পেলেন কি করে?

—জজসাহেব ওঁরই কাছে পাঠিয়েছিলেন, তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে।

—ও, ও। আপনি পড়লেন সব?

হুঁ; আগাগোড়া সবটা পড়া হলে বললেন, আপনার কোনো ভয় নেই। কোনো মারাত্মক ক্ষতি না হয়, তা আমি দেখবো। কিন্তু একটা শর্তে—সব খুলে বলতে হবে। বলুন, এর মধ্যে কোনো সত্যি আছে?—বলে, বুঝলে মা, এমন করে তাকালেন আমার চোখের দিকে যে সব কেমন ঘুলিয়ে গেল। ভেবেছিলাম অস্বীকার করে যাবো। প্রমাণ তো কিছু নেই। কিন্তু সেই চোখের দিকে চেয়ে সে মতলব টিকল না। সব স্বীকার করে বসলাম; মানে যেগুলো সত্যিই নিয়েছি। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, বাকীগুলো? আজ্ঞে, ওগুলো মিথ্যে। আপনি যবে থেকে চার্জ নিয়েছেন, তারপর একটি পয়সাও ছুঁইনি। তেমনি চোখে চোখে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক বলছেন? ওঁর পাদুটি জড়িয়ে ধরে বললাম, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি বিচারক, সব চেয়ে বড়, আপনি আমার মনিব। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, যা বললাম তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়।

কী রিপোর্ট গেল জানি না। কয়েক মাস যেতেই অনেককে ডিঙ্গিয়ে প্রমোশন পেয়ে গেলাম—পেসকার থেকে জজকোর্টের সেরেস্তাদার।… কিন্তু, তোমার ওভালটিন যে জল হয়ে গেল, মা?

—যাকগে, এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না।

—সেটি হবে না, মা। তাহলে রিপোর্ট যাবে তোমার নামে।

জয়ন্তী হেসে ফেলল, বেশ তো, দিন না রিপোর্ট। আমি গিয়ে কাটিয়ে দিয়ে আসবো। বলবো, কাশীকাকা মিছে কথা বলেছেন।

—তাতে কোনো ফল হবে না, মালক্ষ্মী। জজসাহেব তোমার সব কথা মেনে নেবেন, কিন্তু কাশী পাত্তর মিছে কথা বলেছে, সেটা বিশ্বাস করবেন না। তাহলে তো সেদিনই করতেন।

জয়ন্তী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়ের লেখাপড়ার কোনো সুবন্দোবস্ত না করতে পেরে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। এবার শ্বশুরের কাছে এল এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে। জজসাহেব প্রাতরাশ শেষ করে ক্যাম্প-চেয়ারে শুয়ে বই পড়ছিলেন। আজকাল রান্নার পুরোপুরি ভার পড়েছে ঠাকুরের হাতে। সেদিকটা এক চক্কর ঘুরে এসে, অন্যান্য দিকে যা দেখাশোনা দরকার একপত্তন শেষ করে আপাততঃ হাতে কোনো কাজ ছিল না। শ্বশুরের পায়ের কাছে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এটি ওর একটি অতি প্রিয় অভ্যাস। প্রথম প্রথম বসন্তবাবু আপত্তি করতেন, বলতেন, 'আর দরকার নেই, মা। এবার তুমি একটু বিশ্রাম করোগে।' জয়ন্তী সে কথা কানেও তুলত না, আব্দার করে বলত, 'আপনি চুপ করুন তো। আপনার দরকার না থাক, আমার আছে।' পুত্রবধূর কাছে প্রতিবারেই হার মেনেছেন বসন্তবাবু। তাই আজকাল আর বাধা দেন না। ওর যখন ইচ্ছা, করুক।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর জজসাহেবই প্রথম কথা কইলেন— তোমার ওদিকের কাজ মিটল? জয়ন্তী নিবিষ্ট মনে কী ভাবছিল, শ্বশুরের প্রশ্নটা বোধহয় কানে গেল না। হঠাৎ বলে উঠল, বাবা, মায়াকে আমি পুষ্যি নেবো।

সহসা ধ্বক করে উঠল বসন্তবাবুর বুকের ভিতরটা। সোজা হয়ে বসে বললেন, কী বললে ?

—মায়াকে পুষ্যি নেবো আমি। তাহলে তো আর বাবার নামের দরকার নেই। তখন আইনত আমিই ওর মা। আমার নাম লেখা হবে ওখানটায়।

সান্যাল সাহেবের যেন বাকরোধ হয়ে গেল। নীরবে শুধু তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। জয়ন্তী মুখ তুলে অনুনয়ের স্বরে বলল, আপনি সব ব্যবস্থা করে দিন।

চঞ্চলভাবে মাথা নাড়লেন বসন্তবাবু, সে হয় না, মা।

—কেন ?

—আছে, বাধা আছে।

—কিসের বাধা ?

—আর একদিন বলবো।

এর পরেও জয়ন্তী বলতে যাচ্ছিল, আজই বলুন না ? কিন্তু শ্বশুরের মুখের দিকে চেয়ে সহসা থেমে গেল। মনে হল, সেখানে যেন কে একরাশ কালি ঢেলে দিয়েছে। বুঝতে পারল না, এই সামান্য ব্যাপারে ওঁর এতখানি ভাবান্তর ঘটবার কারণ কী। আর কোনো কথা না পেড়ে চিন্তান্বিত মুখে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

পাঁচ বছর শেষ হবার আর কয়েকটা দিন বাকী। এবার যেতে হবে। তার আগে ঐ দুর্ভাগিনী মেয়েটাকে জানিয়ে দিতে হবে, যে কথা এতদিন আজ থেকে কাল, এ মাস থেকে ও মাস শুধু ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছেন জজসাহেব। শুধু কালক্ষয়, অনিবার্যকে রোধ করবার ব্যর্থ প্রয়াস। এবার ওকে বলতে হবে, আমার সংসারে এসে তুমি সব হারালে। বিয়ের উৎসব মিটতে না মিটতেই স্বামী হারিয়েছ, সন্তান বলে যাকে পেলে, সরল বিশ্বাসে আপনার মনে করে বুকে টেনে

নিলে, তাকেও আজ হারাতে হবে। সেখানেও আমি, এখানেও আমি। আমি তোমাকে সর্বহারা করে সংসারের শূন্য পথে ছেড়ে দিলাম। অথচ যাদের তুমি হারালে তারা তুজনেই আছে, তুজনেই রইল। কিন্তু তুমি পেলে না, এইটাই সব চেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। মৃত্যুর মধ্যে যে হারানো, তার একটা সান্ত্বনা আছে। এখানে তাও নেই।

বাইরে ঝড় উঠেছে, তার সঙ্গে অকাল বর্ষণ। মাথার কাছে জানালাটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। বারান্দার দিকে দরজাটা খোলা। সেই ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন জজসাহেব, নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন, বর্ষণ-নিপীড়িতা ধরণীর বিপর্যস্ত রূপ, শুনছিলেন তার অসহায় হাহাকার। যে কথা তাঁর বলবার, তারই জন্যে যেন এই দিনটিকে বিশেষ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভগবান। জয়ন্তীকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে এল মায়া। ঝড় দেখে ভয় পেয়েছে, মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। জানে না এর চেয়ে অনেক বড় ঝড় আসছে, যেখানে এ নির্বিঘ্ন আশ্রয়টুকু তার জুটবে না।

—তুমি একটু ঝিয়ের কাছে যাও তো, মায়া, শুষ্ক স্বরে বললেন জজসাহেব।

—কেন? অনেকটা ক্ষুব্ধকণ্ঠে জানতে চাইল মায়া।

—দরকার আছে।

তখনো দাঁড়িয়ে রইল ঘাড় বেঁকিয়ে দৃঢ় প্রতিবাদের ভঙ্গীতে।

—'দাতু বলছেন, যাও'—র্ভৎসনার সুর লাগল মায়ের চাপা গলায়। এবার চলে গেল; কিন্তু তার প্রতি পদক্ষেপ জানিয়ে গেল, সে যেতে চায়নি।

—বৌমা, দৃঢ়গম্ভীরস্বরে ডাকলেন জজসাহেব। জয়ন্তীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। যে-সুরে তিনি এতদিন ডেকে এসেছেন, এ সে সুর নয়। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে যেন কোন্ অনাগত

অমঙ্গলের পূর্বাভাস। সাড়া দিতে গিয়ে স্বরটাও যেন একটু কেঁপে গেল—বাবা।

—এ দিকে এসো।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল। জজসাহেব বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার ওর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, পরশু বিকেলের গাড়িতে আমি কদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। মায়াকে নিয়ে যেতে হবে।

—কোথায়!

—ওর বাবার কাছে।

—ও, কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল জয়ন্তী, তাই বলুন। আমি কি রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ওর বাবা কি জেল থেকে বেরিয়েছে?

—শীগগিরই বেরোবে।

—তা, ওকে অতদূরে নিয়ে যেতে হবে কেন? ওর বাবাকেই এখানে আসতে লিখে দিন না।

জজসাহেব ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন,—ওকে আমাদের ছাড়তে হবে, বৌমা।

—ছাড়তে হবে!

—হ্যাঁ। ওর বাবাকে আমি কথা দিয়েছি—তার জেল যেদিন শেষ হবে সেই দিন তার মেয়ে তাকে ফিরিয়ে দেবো।

—ফিরিয়ে দেবেন! মায়া চলে যাবে! আমাদের কাছে আর ফিরে আসবে না?

—না।

—সে কথা আমাকে এতদিন বলেননি কেন?—বলতে বলতে গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল জয়ন্তীর। জজসাহেব উত্তর দিলেন না; বোধহয় দেবার মত উত্তর কিছু ছিল না। জয়ন্তী তার জন্যে অপেক্ষা করল না।

অনেকটা যেন নিজের মনেই বলল, মা নেই, অতটুকু মেয়ে থাকবে কার কাছে ?

—ওর বাবার কাছেই থাকবে।

—তাই কখনো হয় ? দেখাশুনো করবে কে ?

—সে সব আমাদের ভাববার কথা নয় মা।

—আমরা না ভাবলে কে ভাববে বাবা ? ও যে একেবারে শিশু, আপনি ওর বাবাকে ডেকে পাঠান। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো, যদ্দিন না বড় হচ্ছে—

—তা হয় না, বৌমা। আমি তাকে কথা দিয়েছি। তারই উপর নির্ভর করে সে বসে আছে। এই শর্তেই এই মেয়েটিকে আমি গ্রহণ করেছিলাম।

জয়ন্তী বলতে পারত, আপনি একদিন কী কথা দিয়েছিলেন সেইটাই বড় হল ; আর আমি যে দিয়েছি, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সমস্ত প্রাণ উজাড় করে, তার কোনো দাম নেই ? বলতে পারত, কিন্তু বলল না। সে জানে, প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছেন, যে কারণে যার কাছেই হোক, তার মূল্যই এই মানুষটির কাছে সব চেয়ে বেশি। সেখানে দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি—কোনো হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই। সুতরাং বলা বৃথা। তবু মুখ থেকে বেরিয়ে গেল একটা অসহায় ব্যাকুল প্রশ্ন—আমি কেমন করে থাকবো ? প্রশ্নটা করল বোধহয় তার নিজেরই অদৃষ্টের কাছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁচল চেপে ধরল চোখের উপর।

বসন্তবাবু উঠে এসে ডান হাতখানা রাখলেন ওর মাথার উপর। এতক্ষণ কোনো রকমে নিজেকে ধরে রেখেছিল জয়ন্তী, আর পারল না। ঐ একটি মাত্র স্নেহস্পর্শ তার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে গেল, ভাসিয়ে দিয়ে গেল সংযমের বাঁধ। দুর্বল শরীর দুএকবার কেঁপে উঠেই ভেঙ্গে পড়ল শ্বশুরের পায়ের তলায়। মাথার আঁচল খুলে পড়ল, মেঝের উপর ছড়িয়ে গেল অপর্যাপ্ত কেশভার।

নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন বসন্ত সান্যাল। সেই অবোধ .আকুল একটানা কান্নার স্রোতে ভেসে-আসা দুএকটা জড়িত স্বর তাঁর কানে এসে লাগল, কী নিয়ে থাকবো আমি? কী নিয়ে বাঁচবো? আপনি তো সবই জানেন!

পরদিন যথানিয়মে, ভোর না হতেই জয়ন্তীর ঘরের দরজা খুলে গেল। রোজকার রুটিনের কোনো নড়চড় হল না। ঝি-চাকরদের ডেকে তুলে উনুনে আঁচ দেওয়ানো থেকে শুরু করে একটির পর একটি সব কাজ সেরে নিয়ে মায়াকে নিয়ে পড়ল। তার মুখ ধোয়ানো, জামা-কাপড় পরানো, খাওয়ানো ইত্যাদি পর্ব মিটে যাবার পর সদ্য-স্নাত এলোচুলের উপর আঁচলখানা তুলে দিয়ে শ্বশুরের জন্য একবাটি গরম দুধ হাতে করে যখন উপরে উঠে গেল, তখনো তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। অন্য দিন এর অনেক আগেই তিনি উঠে পড়েন। পুত্রবধূ এসে পড়বার আগেই দরজা খুলে দেন। আজই প্রথম দেখা গেল ব্যতিক্রম। জয়ন্তী মুহূর্তকাল দোরগোড়ায় অপেক্ষা করে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, বাবা। প্রথমবার কোনো সাড়া এল না। দ্বিতীয়বার একটু গলা চড়িয়ে ডাকতেই ভিতর থেকে জবাব দিলেন, কে?

—আমি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। বসন্তবাবু অপ্রতিভ হলেন, একি! তুমি এরই মধ্যে খাবার নিয়ে এসেছ? এত সকাল সকাল—বলে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়েই থেমে গেলেন।

জয়ন্তী বলল, আজ বরং একটু দেরি হয়ে গেছে। আপনি মুখ ধুয়ে নিন। আমি পরে আসছি।

দুধের বাটি হাতে করেই ফিরে যাচ্ছিল। জজসাহেব ডাকলেন, বৌমা। জয়ন্তী চোখ তুলে তাকাল। রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট ক্লান্ত দুটি চোখ। বসে-যাওয়া কোল; তার উপরে যেন একরাশ কালি ঢেলে

দিয়েছে। এই মেয়েটির উপর দিয়ে একটি রাত্রে যে ঝড় বয়ে গেছে, তার সমস্ত চিহ্ন রয়েছে ঐ মুখের উপর। বসন্তবাবুর চোখেও ধরা পড়ল। তাঁর বুকের ভিতরটা হয়তো একটু নড়ে উঠল। কিন্তু তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে শান্ত কিন্তু স্পষ্ট এবং দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, বৌমা। এ হয় না। আমি যে কথা দিয়েছি তা রাখতেই হবে। যদি না পারি কী জবাব দেবো নিজের কাছে? মিথ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকবো কেমন করে? সে শুধু অন্যায় নয়, তার চেয়েও বেশি; অবিচার।

আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব এল—যে গাড়িতে যাবেন, তার একটু আগে আমাকে বলবেন। আমি ওকে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে দেবো।

জজসাহেব গভীর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই সহজ সুরের পিছনে যে কঠিন সংগ্রাম লুকিয়ে আছে, যে সুকঠোর সংযম দাঁড়িয়ে আছে এই সামান্য কটি কথার অন্তরালে, তার খবর তাঁর চেয়ে আর কে বেশি জানে? এই বধূটির উপর তাঁর স্নেহ ও করুণা অপরিসীম। আজ সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর অন্তর জুড়ে জেগে উঠল শ্রদ্ধা। এতদিন যে জয়ন্তীকে তিনি দেখে এসেছেন, এ তার চেয়ে অনেক বড়—দুঃখ ও বঞ্চনায় অবনমিতা কিন্তু ত্যাগ ও সংযমে মহীয়সী। মুহূর্তপূর্বে যে দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল তাঁর বাক্যে ও কণ্ঠস্বরে হঠাৎ যেন লজ্জায় মাথা নোয়ালো এই নতমুখী বধূটির কাছে। তিনি যে কত অসহায় তারই অকপট স্বীকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল, তাঁর কথায়, তাঁরই জবাবদিহি—আমি সবই বুঝেছি মা। কিন্তু কী করবো? একান্ত নিরুপায়। এ ছাড়া আর পথ নেই। শুধু কি তোমার কথা। ঐ মেয়েটার—

—ওসব কথা থাক বাবা, আর্তকণ্ঠে বলে উঠল জয়ন্তী, আমি সইতে পারবো না।...

বলতে বলতে আকণ্ঠ কান্নার বেগ রোধ করবার জন্যে খানিকটা আঁচল মুখে পুরে দিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে গাড়ি। দুপুরবেলা মায়াকে খাইয়ে অন্য দিনের মত ছেড়ে না দিয়ে সঙ্গে করে উপরে নিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

—ঘুম পায়নি যে, ক্ষোভমেশানো আব্দারের সুরে বলল মায়া।

—চোখ বুজে থাকলেই পাবে। না ঘুমুলে যাবে কি করে?

—কোথায় যাবো, মা?

—দাদুর সঙ্গে কোলকাতায় যাবে।

শুয়েছিল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে উঠল—কী মজা! কোলকাতায় যাবো। আমাকে কিন্তু সেই নীল জামাটা পরিয়ে দিতে হবে। সেই যে পূজোর সময় তুমি কিনে দিয়েছিলে?

—বেশ, তাই দেবো। এবার ঘুমোও।

—আর তুমি কি পরে যাবে, বলবো? (ভাবতে লাগল)

—আমি আবার কী পরবো?

—ও, তুমি বুঝি এই বিচ্ছিরি কাপড়টা পরে যেতে চাও? কখ্খনো তা দেবো না। আমি যে কাপড়টা বেছে দেবো, তাই পরতে হবে।

—আমি যাচ্ছি, কে বললে তোকে?

—বা-রে! আমি একলা যাবো নাকি?

—একলা কোথায়? দাদুর সঙ্গে যাচ্ছিস তো।

—ঈস! তুমি না গেলে আমি কখ্খনো যাবো না!

—ছিঃ, যাবো না বলতে আছে? দাদু সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন।

—কেন নিয়ে যাচ্ছেন, বল না?

—কেন আবার? কদিন বেড়িয়ে আসবি।

—তবে তুমি যাচ্ছ না কেন?

—আমার যে কত কাজ।

—ছাই কাজ!···বলে উপুড় হয়ে বালিসে মুখ গুঁজে কাঠ হয়ে পড়ে রইল। জয়ন্তী ওর পিঠে হাত রেখে বলল, ও কী হল! এদিকে ফের। মায়া নড়ল না, সাড়াও দিল না। কিন্তু ঘুম না পাড়ালে গোছগাছ করা কঠিন হবে। আর সময় নেই। বাহু ধরে খানিকটা টানাটানির পর যখন মুখ ফেরান গেল, মেয়ের গণ্ড ভাসিয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই একলাফে উঠে এসে দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জয়ন্তী যত চেষ্টাই করুক মায়াকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে; যে রকম মেয়ে, হয়তো শেষ মুহূর্তে কান্নাকাটি করে একটা হুলস্থুল বাধিয়ে বসবে—এ আশঙ্কা বসন্তবাবুও করেছিলেন। অনেক ভেবে এ সমস্যা-সমাধানের ভার কাশীনাথের হাতে ছেড়ে দেওয়াই স্থির করলেন, এবং দুপুর বেলায় তাকে ডেকে পাঠালেন। কথাটা পাড়তেই কাশীনাথ একেবারে সরাসরি নাকচ করে দিল—তা কী করে হবে, স্যর! বৌমা সঙ্গে না থাকলে ও কখনো যায়? তার দরকারটাই কী। বৌমাকেও নিয়ে যান। অনেকদিন যাননি, সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে আসুন। এখানকার জন্যে ভাববেন না। আমি তো রইলাম।

মায়ার আসল পরিচয় কাশীনাথের জানবার সুযোগ হয়নি। মাঝখানে অনেকদিন সান্যাল পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না। ভাস্করকে দেখেছে সেই ছেলেবেলায়। তার বিয়ে দিয়েছেন জজসাহেব এবং তার কিছুদিন পরেই সে বিলাত চলে গেছে, এই পর্যন্ত শুনেছিল। জয়ন্তীকে প্রথম দেখল এই দেওঘরে। মায়া যে তারই মেয়ে, এটা মনে করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এ বিষয়ে তার মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। ওঁদের আচরণ থেকে জাগবার কোনো কারণও ছিল না। প্রকৃত ঘটনা কাশীনাথকে জানাবার কোনো উপলক্ষ্য সান্যাল সাহেবের

তরফেও এ পর্যন্ত দেখা দেয়নি। আজই প্রথম দিল। মেয়েটির পিতৃপরিচয় এবং সেই সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয় না জানতে পারলে ব্যাপারটার গুরুত্ব সে বুঝতে পারবে না এবং এ সম্পর্কে যে সাহায্যের প্রয়োজন তাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কাছাকাছি কোথায় মায়ার সাড়া পাওয়া গেল। জজসাহেব বললেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এদিকে এসে বসো কাশীনাথ। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন রহস্যময় মনে হল। আদেশ পালন করে কাছে আসতেই তিনি ধীরে ধীরে শুরু করলেন, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, তেমন কিছু দরকার পড়েনি, কোনো উপলক্ষ্যও দেখা দেয়নি। সব ব্যাপারটা আমি ফিরে এসে বলবো। আপাততঃ,—বলে একটু থেমে যোগ করলেন, ঐ মেয়েটি আমাদের কেউ নয়।

—কার কথা বলছেন!

—মায়ার কথা বলছি। একরকম কুড়িয়ে পাওয়াই বলতে পার।

—কী আশ্চর্য! কিন্তু কে বলবে ও বৌমার পেটের সন্তান নয়?

সেইখানেই তো সমস্যা—চিন্তান্বিত ভাবে বললেন জজসাহেব। তারপর শশাঙ্ক মণ্ডলের পরিচয়, তার স্ত্রীর মৃত্যু, শশাঙ্কের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি—সব একে একে বর্ণনা করে সকলের শেষে ব্যক্ত করলেন তাঁর সংকল্প, যার জন্যে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে আজই তাঁর যাত্রা করা প্রয়োজন। জয়ন্তী যে ত্যাগ ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, সশ্রদ্ধভাবে তার উল্লেখ করে অনুনয়ের সুরে বললেন, শেষ রক্ষাটা তোমাকেই করতে হবে, কাশী। বৌমার সাধ্য কি ওকে সামলায়? তাছাড়া, সইতে পারারও একটা সীমা আছে।

কাশীনাথ কিছুক্ষণ অভিভূতের মত বসে রইল। তার মনিবকে সে চেনে। যেখানে যত বেদনাই বাজুক, যাকে তিনি 'সংকল্প' বলে প্রকাশ করেছেন, তার থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হবেন না, সে বিষয়ে সে

নিঃসন্দেহ। আবেদন বা আলোচনা এখানে নিরর্থক। তবু অনেকটা যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই বলে ফেলল, এটা কি আপনি একেবারে স্থির করে ফেলেছেন, স্যর?

—হ্যাঁ! কাশী। তোমাকে তো আগেই বলেছি এটা আমার সংকল্প। এর মধ্যে আর ভেবে দেখবার কিছু নেই।

—আমি এখনি আসছি—বলে বাইরে এসে এতক্ষণে যেন একটু নিঃশ্বাস নেবার অবসর হল। এ অবসর যে নিতান্তই সাময়িক কাশীনাথ তা জানে। যতই নিষ্ঠুর হোক, এ আদেশ তাকে পালন করতে হবে, এবং তাও অবিলম্বে। জয়ন্তীর কাছে বসে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, সান্ত্বনা ও সমবেদনার ভিতর দিয়ে তারই সাহায্যে একটা পথ খুঁজে বের করা—সে অবকাশও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া তার কাছে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে কাশীনাথ? সে যখন সম্মতি দিয়েছে, এখন আর কোনো আপত্তি বা ওজর সে তুলবে না। সে শিক্ষা, সংযম এবং মনোবল তার আছে। তবু কী বলবে, কেমন করে তুলবে এ কথা?

শেষ পর্যন্ত কাশীনাথকে যেতেই হল। অপরাধীর গ্লানি মাথায় নিয়ে কুণ্ঠানত মুখে ধীরে ধীরে জয়ন্তীর ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো। তার দিকে এক পলক তাকিয়েই জয়ন্তী বুঝতে পারল, কাশীকাকার আর জানতে কিছু বাকী নেই। যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে বলল, কী রকম একগুঁয়ে গোঁয়ার দেখছেন তো, জেগে থাকতে ওকে গাড়িতে তোলা যাবে না। রাত বারোটা কত মিনিটে যে ট্রেনটা আছে ওতে করেই যেতে হবে। সেই ব্যবস্থাই করছি।

এই সহজ কথাটাও যেন বোধগম্য হয়নি, এমনি ভাবে তাকিয়ে রইল কাশীনাথ। কোন ধাতু দিয়ে তৈরি এরা? ইস্পাত না হীরক? সব সমস্যার সমাধান এ তো নিজেই করে রেখেছে। তবে আর ভাবনা কিসের? আসলে কিন্তু ভাবনা গেল না। মনটা তার

ভারাক্রান্ত হয়েই রইল। ঝড়ো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, অথচ ঝড় উঠল না—প্রকৃতির সেই শান্ত থমথমে ভাবটাই ভয়াবহ। তার চেয়ে ঝড় এলেই যেন স্বস্তি পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার আগে মায়াকে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে তার জিনিসপত্র-গুলো জয়ন্তী একটা ট্রাঙ্কে গুছিয়ে দিচ্ছিল। জজসাহেব নিচে যাচ্ছিলেন। সেই একরাশ জামা-কাপড় খেলনা-পুতুল হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। ক্ষণকাল থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, অত জিনিস কী হবে? তু একটা সাধারণ জামা, তার সঙ্গে একটা তুটো খেলনা—এই শুধু একটা ছোট বাক্সে কিংবা পোঁটলা করে বেঁধে দাও।

জয়ন্তী আয়ত চোখ মেলে একবার শ্বশুরের মুখের দিকে তাকাল। কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে উঠল একটা তুর্দম প্রশ্ন—এ গুলো নিয়ে আমি কী করবো? বলা হল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কোনো রকমে নিজেকে সংবরণ করে মাথা নিচু করে বলল, তাই দিচ্ছি। জজ-সাহেব পা বাড়াতে গিয়ে কী মনে করে আবার থামলেন। বললেন, যে অবস্থায় নিয়ে এসেছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই ফিরিয়ে দিতে চাই। তুঃখী, গরীব বাপকে যেন বাপ বলে সহজেই গ্রহণ করতে পারে, এখানকার কোন ঐশ্বর্য সে পথে ওর বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, যাবার সময় তুমিও ওকে সেই আশীর্বাদই করো মা।

বারোটা হতে আর বেশি দেরি নেই। কোনো তাগিদ দিতে হল না। জয়ন্তী আগে থেকেই তৈরি। ঘুমন্ত মেয়ে; স্টেশনের পথে হঠাৎ জেগে উঠে যদি কোনো গোল বাধায় তাই তাকে কোলে করে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যেই সে প্রস্তুত হচ্ছিল। কাশীনাথ এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আর বোধ হয় সইতে পারল না। বিছানার পাশে এসে বলল, তুমি থাক মা। এ কাজটা আমাকেই করতে দাও। কাশী পাস্তুর সব পারে!

জয়ন্তী অনেকক্ষণ অনেক কিছু সয়ে ছিল শেষ মুহূর্তে এই অনাত্মীয় বৃদ্ধের সামান্য একটু সমবেদনার স্পর্শ তার সব সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে গেল। দুহাতে মুখ চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল ঘুমন্ত মেয়ের শয্যার উপর। বাইরে থেকে ভেসে এল জজসাহেবের গম্ভীর কণ্ঠ—কাশীনাথ!

—এই যে যাই, স্যর—বলে, একটিবার চেয়ে দেখল সরল-বিশ্বাস-ভরা, নিদ্রাকাতর ছোট্ট সুন্দর মুখখানার দিকে, পরক্ষণেই অতি সন্তর্পণে সেই নেতিয়ে-পড়া হালকা দেহটুকু দুহাতে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

অনেকগুলো পায়ের শব্দ এবং তার সঙ্গে হাঁকডাক কানে যেতেই হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন জজসাহেব। যারা ঘোরাঘুরি করছিল তারাই বোধহয় বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে থাকবে। দেয়াল-ঘড়িটার দিকে নজর পড়ল। চারটা বেজে দশ মিনিট। এর কিছুক্ষণ আগেই একটা ট্রেন আসে। এরা বোধহয় তারই যাত্রী, ডাক বাংলোর নতুন অতিথি। ইজিচেয়ারে শুয়ে সেই পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জানতে পারেননি। এখনো একটু রাত আছে। খানিকক্ষণ গড়িয়ে নেওয়া যায়। সকাল হলেই তো ফিরে যাবার আয়োজন।

ঘরে ঢুকেই দেখলেন, বালিস থেকে নেমে সরতে সরতে মায়া একেবারে ধারে চলে এসেছে। মশারির একটা দিক খুলে গিয়ে একখানা হাত বাইরে ঝুলছে। কী সর্বনাশ! আর একটু হলেই খাট থেকে পড়ে যেত। তাড়াতাড়ি ওকে তুলে ঠিক জায়গায় শুইয়ে মশারিটা আবার গুঁজে দিলেন।

চার

—কখোন বাড়ি যাবো দাদু ?

—এই তো এসে পড়েছি।

—আর কটা ইস্টেশন, বল না ?

—কত আর, চার পাঁচটা হবে।

—হুঁ ; তুমি তো সেই ক-খোন থেকে বলছ খালি চার পাঁচটা।

—ঐ ছ্যাখ, কী সুন্দর মোটর-গাড়ি আমাদের সঙ্গে ছুটছে।

—ছাই! বলে যে ছবির বইখানার পাতা ওল্টাচ্ছিল, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদিকে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ফার্স্ট ক্লাশ কামরা। আর কোনো যাত্রী নেই। কালকার রাতটা কোনো রকমে ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল। ভোরবেলা শিয়ালদ পৌঁছবার পর থেকে বারবার ঐ একই প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বসন্তবাবু। ট্যাক্সি করে হাওড়ায় এসে দেওঘরের গাড়ি ধরেছেন। স্টেশনেই ওকে কিছু খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। যা খেয়েছে, সে একরকম না খাবার সামিল। নবীন রয়েছে পেছনে, থার্ডক্লাসে। সেখানেও দুবার ঘুরে এসেছে। গল্প, খেলনা, ছবির বই—কোনো দিকেই মন নেই। থেকে থেকে ঐ এক কথা—কখন মার কাছে যাবো, মাকে কেন নিয়ে এলে না, মা কাঁদছিল আমার জন্যে। হুঁ ; আমি দেখেছি।

সান্যাল সাহেব ভাবছিলেন, আজ ফিরবার কথা তাঁর একা। এতক্ষণ কোথায় থাকত এই মেয়ে ? অজ্ঞাতসারে কেমন একটা শঙ্কার ছায়া পড়ল বুকের ভিতর। বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাড়াতাড়ি চোখ ফেরালেন গাড়ির মধ্যে। কই, মায়া কোথায় গেল! ঐ তো

বেরোচ্ছে বাথরুম থেকে। মনে মনে যেন আশ্বস্ত হলেন জজসাহেব। আছে, সে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল জয়ন্তীর কথা, সেই ব্যথাতুর ম্লান মুখখানা। পরক্ষণেই রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন নিজের অন্তরের কাছে—যাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করবার সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেছিলেন, তাকে ঘিরে কিসের এ শঙ্কা! তাকে হারাতে হবে কল্পনা করেই কেন এ ভয়ের ছায়া! সে যে রইল, এইটুকু জেনেই কেন এই স্বস্তির নিঃশ্বাস! তবে কি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে মনে তিনি খুশি হয়েছেন? অন্তরের সঙ্গোপনে কিংবা অবচেতন মনের কোনো গোপন কক্ষে এই আশাই পোষণ করে এসেছেন এতদিন?

মনের গহনে দৃষ্টি নামিয়ে দিলেন বসন্তবাবু। না, না, এসবই তাঁর দুর্বলতা। চিত্তের সে অবিচল সামর্থ্য আর নেই। কর্তব্যের কঠোর পথ থেকে পা দুটো যেন মাঝে মাঝে স্খলিত হয়ে পড়ছে। হয়তো এর জন্যে দায়ী তাঁর বার্ধক্য, ভগ্নস্বাস্থ্য কিংবা সাময়িক ভাবপ্রবণতা। কারণ যাই হোক, একে জয় করতে হবে, এর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

একটা কোন স্টেশনে গাড়ি থামল। লোকজনের ওঠানামা, হাঁকডাক, ফেরিওয়ালার বিচিত্র চিৎকার—সব মিলে নিজস্ব চিন্তাজগৎ থেকে ওঁকে আবার পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে নিয়ে এল। মায়াকে ডাকতে গিয়ে দেখলেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, চুলগুলো উসকো-খুসকো, সমস্ত শরীরে অযত্নের চিহ্ন। আবার জয়ন্তীর কথা মনে পড়ল। তার জিনিস, এবার তার কোলে পৌঁছে দিতে পারলেই তিনি আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

দেওঘর স্টেশনে গাড়ি ঢুকল। প্লাটফরমের উপর কাশীনাথকে দেখতে পেয়েই মায়া জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—ছোটদাদু! রিনরিনে মিষ্টি সুরের অতি-পরিচিত কিন্তু অপ্রত্যাশিত ডাক। কাশীনাথ হঠাৎ চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে

গেল ওঁদের কামরার সামনে। জজসাহেব লক্ষ্য করলেন, তার মুখখানা এক মুহূর্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে ছাইএর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ' মায়ার চোখে সে সব পড়বার কথা নয়। গাড়ি থামতেই প্লাটফরমে লাফিয়ে পড়ে কাশীনাথকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে চারদিক মাথায় করে তুলল—মা কোথায় ছোটদাদু ? মা আসেনি ?

কাশী কেমন যেন থতমত খেয়ে বলে উঠল, মা ? না, দিদি, মা তো আসেনি।

—কেন ?

সে প্রশ্নের আর জবাব পাওয়া গেল না। জজসাহেব নেমে এসে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর ভূতপূর্ব পেসকারের মুখের দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, খবর সব ভালো তো কাশীনাথ ? হাঁ-না'য় মেশানো একটা কী অস্পষ্ট জবাব দিয়ে সে হঠাৎ মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ডাকহাঁক করে কুলী জুটিয়ে তাকেই তাড়া দিতে দিতে এগিয়ে চলল গেটের দিকে।

বাড়ি পৌঁছে জয়ন্তীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বসন্তবাবুর মনে হল তাঁর পা দুটো যেন কত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ একমুহূর্তে অচল হয়ে গেছে, ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নেবার ক্ষমতা আর তাদের নেই। কোনো রকমে নিজেকে ঠেলে নিয়ে তাঁর ঘরের সেই ক্যাম্পচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। একটি শোকাকুল কচি কণ্ঠের 'মা, মা' তখন সমস্ত বাড়িখানা চঞ্চল করে তুলেছে। ঠাকুর, চাকর, ঝি সবাই মিলেও তাকে ধরে রাখতে পারছে না।

কাশীনাথ আসতেই জজসাহেব চোখ তুলে চাইলেন তার দিকে। নীরব হলেও সে দৃষ্টি এমন বাঙ্ময় যে তার অর্থবোধ কারো পক্ষেই কঠিন নয়। উত্তরে সে নিঃশব্দে এগিয়ে ধরল একখানা খামে-আঁটা চিঠি। বসন্তবাবুর চোখে পড়ল, তার উপরে জয়ন্তীর হাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'পূজনীয় বাবা'। খামখানা ধরতে গিয়ে বুক কেঁপে

উঠল। কি জানি কী আছে ওর মধ্যে। কম্পিত হাতে কোনোরকমে একটা ধার ছিঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে এল এক টুকরো কাগজ। কয়েকটা মাত্র লাইন। তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাশীনাথের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, পড়। কাশী এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল—

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আপনার অসাক্ষাতে, আপনার অনুমতি না নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি, এ যেন আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এ চিন্তাও যে আমার স্বপ্নের অতীত। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। মনে হল, এই বাড়িটা যেন আমার বুকের উপর চেপে বসছে। আর এক মুহূর্ত থাকলেই দম বন্ধ হয়ে যাবে। টিকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম।

কাশীকাকাকেও বলে যাওয়া হল না। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তাই ঠাকুরের কাছে এই চিঠিখানা রেখে জানিয়ে গেলাম, আমি কলকাতা যাচ্ছি।

কোথায় যাবো কিছুই স্থির করিনি। ইচ্ছে করছে দিল্লীতে ঠাকুরঝির কাছে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসি। কিন্তু অতদূরে একা যেতে পারবো না। তাই ভাবছি, কলকাতায় নেমে আমার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নেবো।

যখন যেখানে থাকি আপনাকে জানাবো।

আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। শরীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। সে সম্বন্ধে যা যা করা দরকার আমি কাশীকাকাকে লিখবো।

আপনার কাছে অনেকদিন অনেক অপরাধ করেছি। আজও করলাম। তবু জানি সব আপনি ক্ষমা করবেন।

সেবিকা

আপনার স্নেহের বৌমা

পাঁচ

জজসাহেব যে ছুটি নিয়ে চলে গেছেন, এ খবর শশাঙ্ক জেলে থাকতেই পেয়েছিল। কলকাতায় তাঁর বাড়ি একথাও জানিয়েছিল সনাতন। তার বেশি আর কিছু বলতে পারেনি। প্রথম দিকে দুতিন মাস অন্তর সে দেখা করতে আসত। ক্রমে সে ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগল। শেষ দু বছর আর আসেনি। পাশের গ্রামের একজন চেনা লোকের জেল হয়েছিল মারামারি মামলায়। তার মুখেই শুনেছিল শশাঙ্ক, মকবুল চৌধুরীর সঙ্গে কী নিয়ে বিবাদ হবার পর সে দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। এরকম আরো দুচার জনকে যেতে হয়েছে। ব্যাপারটা নতুন নয়, আশ্চর্যও নয়। শশাঙ্ক এ নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। শুধু একটা নিঃশ্বাস পড়েছিল পুরানো বন্ধুর কথা স্মরণ করে।

গাঁয়ের সঙ্গে ঐ একটুখানি যোগসূত্র তার ছিল, তাও গেল। আপনার বলতে সংসারে আর কেউ রইল না। সমস্ত জীবন, সমস্ত অন্তর জুড়ে রইল শুধু তার 'রাণী' ঐ একফোঁটা সম্বল। 'রাণী'। মনে মনে বার বার উচ্চারণ করল শশাঙ্ক। মেয়ের নাম রেখেছিল রাধা। শশাঙ্ক হাসতে হাসতে বলেছিল, 'ভিখিরীর ঘরে রাণী, লোকে যে হাসবে শুনে।' 'হাসুকগে', মেয়েকে আদর করতে করতে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল রাধা। আরো বলেছিল, 'কে বলে ভিখিরি? এই মেয়ের কল্যাণে আমাদের সব হবে। দেখে নিও তুমি।' সবই হয়েছে বটে! আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শশাঙ্কর বুকের ভিতর থেকে।

খালাস পাবার পর এখানে ওখানে খবর নিতে লাগল। কোথায়

গেছেন জজসাহেব। কাছারির বাবুরা বিরক্তি প্রকাশ করলেন—'কে জানে কোথায় গেছেন? সে কি আজকের কথা যে এখনি বলে দেবো তোমাকে? নতুন কোনো জায়গায় জয়েন করেছেন কিংবা হয়তো রিটায়ার করে চলে গেছেন এতদিন।' দিন তিনেক ঘোরাঘুরির পর জজ-কোর্টের বারান্দায় পুলিশের নজর পড়ল শশাঙ্কর উপর। 'ওহে, শোন শোন, মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।' কাছে এসে আর একটু অন্তরঙ্গভাবে ঠাহর করে বললেন জমাদার, 'হুঁ, ঠিক ধরেছি। এই তো সেদিন দেখা হল জেল প্যারেডে। কি বল, তাই না?' শশাঙ্ক স্বীকার করল কয়েকদিন আগেই সে জেল থেকে বেরিয়েছে।

রবিবার সকাল বেলা একটি পুলিশী অনুষ্ঠান চলে জেলখানায়; তার নাম 'জেল প্যারেড'। আগামী পনের দিনের মধ্যে যাদের খালাস পড়বে, রিলিজ দপ্তরের চিত্রগুপ্তের খাতা দেখে তাদের তালিকা তৈরি হয়। জেল কর্তৃপক্ষ তাদের খুঁজে এনে সারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে দেন পুলিশ বাহিনীর সামনে। উদ্দেশ্য, লোকগুলোকে চিনে রাখা যাতে করে জেলের বাইরে গিয়েও তারা পুলিশের নজরের বাইরে যেতে না পারে। গৃহস্থের নিরাপত্তার জন্যেই রাষ্ট্রের এ ব্যবস্থা। একবার যে জেল খেটেছে তাকে বিশ্বাস কি? সে দাগী। চিরকালের তরে চিহ্নিত একটি আলাদা জাত। তাদের নিয়ে আইনরক্ষীদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই, আইনাশ্রয়ী নাগরিকের নিদ্রা নেই।

—তা, এখানে ঘুরঘুর করছ কেন হে চাঁদবদন? মতলবটা কি? সুবিধে পেলেই পকেট ফাঁক!—বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে গড়িয়ে গেলেন জমাদার সাহেব। উত্তর দিতে গেলে কড়া উত্তর দিতে হয়। তারপর ফ্যাসাদ অনিবার্য। শশাঙ্ক সেটা এড়াতে চায়। বিরোধ করবার এবং তার ফলে নতুন করে বিপদে জড়াবার সময় এটা নয়। তাই কোনো উত্তর না দিয়েই সে চলে যাচ্ছিল। জমাদার এগিয়ে এসে হাত ধরলেন,—বলি, যাচ্ছ কোথায়?

—কাজ হয়ে গেল ; চলে যাচ্ছি।

—বাড়ি কোন জায়গায় ?

—ফুলতলি।

—এখানে এসেছিলে কী করতে ?

—কাজ ছিল।

—কী কাজ ? মামলা মোকদ্দমা ?

—না।

—তবে ?

—জজসাহেবের ঠিকানা জানতে এসেছিলাম।

জমাদার আবার হো হো করে হেসে উঠলেন। সঙ্গের পুলিশটিও যোগ দিল। হাসি থামিয়ে বললেন, তা আগেই বুঝেছি। চল, থানায় চল।

—কেন ?

—সে কৈফিয়ৎটা না-ই বা দিলাম।

সেদিনকার মত থানার চার্জে ছিলেন একজন টাটকা-বহাল সাব-ইনসপেক্টর। বয়স ও অভিজ্ঞতা দুদিকেই কাঁচা। তাই এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে, সে-পথে না গিয়ে অর্থাৎ আসামীকে সরাসরি হাজতে না পুরে তিনি ওকে বুঝিয়ে দিলেন, কি করে তোমার চলে, তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারাটাও আইনের চোখে অপরাধ। তাদের আমরা ১০৯ ধারায় চালান দিয়ে থাকি। তোমাকে আর তা দিলাম না। সবে জেল থেকে বেরিয়েছ; একটা চান্স্ দিতে চাই। কোনো একটা কাজটাজ খুঁজে নাও। এভাবে ঘুরে বেড়িও না।

কথাটা যে সমীচীন শশাঙ্কও তা স্বীকার করে। কিন্তু কাজ খুঁজলেই তো আর পাওয়া যায় না। গ্রামে গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধবে ? কাকে নিয়ে বাঁধবে ? সেমুখো হতে কি মন চায় ? তাছাড়া,

কোথায় গিয়ে উঠবে? ঘরদোর সব পড়ে গেছে। নতুন করে তুলতে হলে সময় চাই। কোথায় থাকবে ততদিন? পাড়া প্রতিবেশী, কারো বাড়িতে ওঠা মানে তাদের শুধু বিব্রত করা নয়, বিপন্ন করা। জেল-ফেরত দাগীকে কে আশ্রয় দেবে? পুলিশ তার পিছনে লাগবে। সুতরাং গ্রামে ফেরা অসম্ভব। এই মফঃস্বল শহরে কী কাজ আছে যার সে যোগ্য? তবু দুচার জায়গায় ঢুঁ মেরে দেখল। সাড়া পাওয়া গেল না। জেল থেকে খোরাকী এবং বখসিস বাবদ সামান্য যা পেয়েছিল, শেষ হয়ে গেছে। এখন একমাত্র সম্বল বিনা-পয়সার কলের জল। এমন সময় বাজারের মোড়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ছেলেবেলার সহপাঠী গণেশের সঙ্গে। গণেশ বিশ্বাস, আদালতের পেয়াদা। খাকী রংএর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হনহন করে চলেছিল কোথায় সমন-জারির তাগিদে। হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বলল, শশাঙ্ক না? এখানে কি করছিস? চল, বাসায় চল। ঈশ, কতকাল পরে দেখা, 'বলতো। শশাঙ্ক ইতস্ততঃ করছিল। সরকারী চাকুরে বাল্যবন্ধু; যদি কোনো বিপদে পড়ে। গণেশ একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল।

বাসা মানে সরুগলির মধ্যে ছোট্ট একখানা টিনের ঘর। বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। নিজের হাতেই সব করে গণেশ। তারই মধ্যে একটু বিশেষ ব্যবস্থা হল বন্ধুর জন্যে। খাওয়া-দাওয়ার পর চলল খবরাখবরের বিনিময়। গণেশ বলল, তোকে পেয়ে ভালই হল। মাসদুয়েকের ছুটি নেওয়া দরকার। বৌ আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে।

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, কী কাণ্ড?

—মানে মেয়েরা যা করে বুঝলি না? আঁতুড়ে কাণ্ড।

ও, ও—বলে হেসে উঠল শশাঙ্ক। তা, তুই কি করবি?

—দশ মাসে পড়ল; আগলাতে হবে। আরো গোটা দুই আছে তো কোলে কাঁখে। এদিকে এক কানা পিসী ছাড়া সংসারে আর

কেউ নেই। চল না তোকে ভর্তি করিয়ে দিই আমার জায়গায়। পেসকারটা পাজি; লোক না দিলে ছাড়ছে না।

—আমাকে নেবে কি?

—কেন নেবে না? লেখাপড়া তো আমার চেয়ে অনেক বেশি জানিস।

—জেল খেটে এলাম যে।

—তা আর কে জানছে? আর, জেল যে আসলে কিজন্যে তাতো কারোই জানতে বাকী নেই।

—তাহলেও জেল। বলে ছাখ কী বলেন তোর কত্তারা।

গণেশ সোজা চলে গেল মুন্সেফবাবুর কাছে। তাঁর নির্দেশে শশাঙ্ককে খাসকামরায় ডেকে পাঠান হল। দুচারটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তিনি বললেন, একটা দরখাস্ত করে দাও। তারপর গণেশকে ডেকে বললেন,' চলবে। কটা দিন দেরি হবে, পুলিশ রিপোর্টটা যদ্দিন না আসে।

—পুলিশ!

—হ্যাঁ, পুলিশের কাছে নাম পাঠাতে হবে—ফেরারী টেরারী কিনা, জেল খেটেছে কিনা কোনোদিন।

—জেল খাটলে বুঝি চাকরি হয় না?

মুন্সেফবাবু হাসলেন, তা কি করে হবে? সরকারী চাকরি।

বেসরকারী চাকরির বেলাতেও দেখা গেল ঐ একই বাধা। জেল-ফেরতকে কে জায়গা দেবে? ইচ্ছা থাকলেও সাহস হয় না। এসব লোককে দোকানে, গদিতে কিংবা বাড়িতে কাজ দেওয়া মানেই সাধ করে পুলিশের হাঙ্গামা ডেকে আনা। যদি কিছু করে বসে, তাহলে তো কথাই নেই। নাও যদি কিছু করে তবুও নানা ঝামেলা। কাছাকাছি কোথাও কোনো চুরি-ডাকাতি হলেই পাঁচবার ওর ডাক পড়বে। কে চায় সে সব ঝঞ্ঝাট?

গণেশ পরামর্শ দিল, কলকাতায় চলে যা। সেখানে আর কে জেনে বসে আছে জেল খেটেছিস কি না? যদি জানতেও চায় চেপে গেলেই হল। সে বিষয়ে একমত না হলেও বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করল শশাঙ্ক। অতবড় জায়গা। কত লক্ষ লক্ষ লোক করে খাচ্ছে। তারও একটা সংস্থান হয়ে যাবে। তার চেয়েও বড় কথা, ওখানে গেলে জজসাহেবের খোঁজ পাবার সম্ভাবনা রইল। শ্যামবাজারে তার বাড়ি, এ খবর সে সংগ্রহ করেছিল গণেশের চেষ্টায়। শ্যামবাজার কত বড় জায়গা, শশাঙ্কের জানা নেই। যত বড়ই হোক, খুঁজতে খুঁজতে একদিন কি আর মিলবে না? আজ তার মাথা গুঁজবার একটু জায়গা নেই। মেয়েটাকে কাছে এনে রাখবে, দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবে, সে সঙ্গতিও নেই। শুধু একবার দেখে আসা। কেমন আছে, কত বড় হল রাণী। হয়তো তাকে চিনতে পারবে না, কাছে আসতেও চাইবে না। তা হোক, তবু একটিবার সে দেখতে চায়। তারপর চিরদিন কি আর তার এ অবস্থা থাকবে? দুদিন একদিন কাটবেই। তখন তার রাণীকে নিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু হবে।

এই আশায় বুক বেঁধে একদিন কলকাতার পথে যাত্রা করল শশাঙ্ক। যাবার সময়, যেন ঘুষ দিচ্ছে এমনি ভাবে, গণেশ তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল কয়েকখানা একটাকার নোট।

শশাঙ্ক কলকাতায় গিয়ে দেখল চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ— গাদাগাদি ঠাসাঠাসি। কোথায় থাকে এত লোক! কাজের যেমন অন্ত নেই, কাজ যারা চায় তাদেরও তেমনি শেষ নেই। এই যে এত বড় বড় বাড়ি, দোকানপাট, কলকারখানা, এর কোন্‌খানে একটু আশ্রয় পাবে সে? সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার পর বিশ্রাম নেয় ফুটপাথে, কোনো গাড়ি-বারান্দার নিচে। সে একা নয়, তার মত আরো কত লোক, রাস্তাই যাদের ঘর। দুবেলা ভাত খেতে সাহস করে না। ঐত কটা টাকা। মুড়ি চিড়ের উপর দিয়েই চালিয়ে দেয়।

কখনো বা ছুপয়সার চিনেবাদাম। কাজ খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে চলে যায় শ্যামবাজার, গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় জজসাহেবের সঙ্গে। একদিন সেখানেই একটা বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন দিলীপবাবু। একেবারে মুখোমুখি দেখা।

—কি হে শশাঙ্ক, তুমি এখানে?

শশাঙ্ক নত হয়ে পায়ের ধূলো নিল। দিলীপবাবু হাত রাখলেন ওর কাঁধের উপর—হয়েছে, হয়েছে, কি ব্যাপার বলতো?

দিলীপবাবু শশাঙ্কদের গ্রামের ছেলে। লেখাপড়া করেছেন কলকাতার কলেজে। কলেজ ছাড়বার পর করেছেন স্বদেশী। জেলেও গেছেন ছ্একবার। মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে সভাসমিতি করে বক্তৃতা দিয়েছেন, অন্তরঙ্গভাবে মিশতে চেয়েছেন চাষাভূষোদের সঙ্গে। তাদের ডেকে নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কি করে আয় বাড়ানো যায়, ভাল খেয়ে, ভাল পরে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা যায়।

শশাঙ্ক বয়সে তাঁর সামান্য কিছু ছোট, কিন্তু অনেক বেশি ছোট বিদ্যায় বুদ্ধিতে অভিজ্ঞতায়। তবু দিলীপবাবু তাকে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে একাজে ওকাজে পরামর্শ চেয়েছেন, এমন সব ব্যাপারে নির্ভর করেছেন, যেটা শশাঙ্কের মত সামান্য মানুষের পক্ষে অতিবড় শ্লাঘার বিষয়। ওঁর উপরে তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। অভিভূত কণ্ঠে বলল, কতকাল পরে আপনাকে দেখলাম, দিলীপদা।

—কি করবো, ভাই, নানা ধাঁধায় ঘুরতে হয়। অনেক দিন যেতে পারিনি তোমাদের কাছে। তোমার সব খবর কি, বল।

সংক্ষেপে ছুচার কথায় মোটামুটি অবস্থাটা জেনে নিলেন দিলীপবাবু। প্রথম প্রয়োজন একটা আশ্রয়, তারপর কাজ। আশ্রয় সমস্যা সাময়িকভাকে তখনই মিটল। সঙ্গে করে ওকে নিজের মেসেই নিয়ে তুললেন। কাজের চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল। একটা নামকরা

খবরের কাগজের সঙ্গে দিলীপবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তুদিন পরে বললেন, আপাততঃ হাতের কাছে আর তো কোনো কাজ দেখছি না। কাগজ ফেরি থেকে শুরু কর। আপত্তি আছে?

—আপত্তি! আমাকে বাঁচালেন দিলীপদা!

কাজটা প্রথমে যতটা সহজ মনে হয়েছিল, আসলে দেখা গেল তার চেয়ে অনেক কঠিন। রাত থাকতে গিয়ে ধরতে হবে কাগজ। একটু দেরি হলেই ফসকে গেল। সেদিনের মত বেকার। সময় মত গেলেও কখনো কখনো খালি হাতে ফিরতে হয়। অনেকদিন থেকে আছে যে-সব হকার, তাদের মৌরুসী-স্বত্ব বজায় রাখতে চায়। নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাবার জন্যে সাধু অসাধু কোনো উপায়ই বাকী রাখে না। অনেক সময় কাড়াকাড়ি করতে হয় তাদের সঙ্গে। সেটা শশাঙ্কর রুচিতে বাধে, শক্তিতেও কুলায় না। তবু টিকে থাকবার চেষ্টা করল। তার কারণ শুধু জীবিকার প্রয়োজন নয়, এই কাগজের মধ্যে একটা নতুন জগতের সন্ধান পেল শশাঙ্ক, সপ্তাহান্তে 'কলিকাতা গেজেটের' বিজ্ঞাপন—নিয়োগ, বদলি, ছুটি। কত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি, সাবডেপুটির খবর থাকে। কেউ যাচ্ছেন হুগলী থেকে বহরমপুর, কেউ ছুটি নিচ্ছেন, কারো-বা প্রমোশন হল মুন্সেফি থেকে জজিয়তির আসনে। শশাঙ্ক তীব্র আগ্রহ নিয়ে সমস্ত স্তম্ভটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। অধীর ভাবে অপেক্ষা করে আগামী সপ্তাহের জন্যে। এরই মধ্যে একদিন হয়তো পেয়ে যাবে তার দীর্ঘ-আকাঙ্ক্ষিত নাম—ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্স্ জজ, শ্রীবসন্তকুমার সান্যাল।

কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেল। কত জজের ছুটি আর বদলির খবর পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল শশাঙ্ক। সেই বহু-ঈপ্সিত নামটা আর চোখে পড়ল না।

মেস থেকে কাগজের অফিস অনেক দূর। বেশ কিছু রাত থাকতে

উঠেও ঠিক সময়ে পৌঁছানো যায় না। শশাঙ্ককে তাই মেস ছেড়ে কাছাকাছি একটা বাড়ির রোয়াকে আস্তানা নিতে হয়েছিল। দিলীপ-বাবুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাঁরই চেষ্টায় একদিন হকার-গিরি ছেড়ে পেয়ে গেল হকার্স-কর্নার। ছোট একটি খবর-কাগজের স্টল, তার সঙ্গে কিছু সাময়িক পত্রিকা, কিছু বাজার-চলতি কমদামী বই। কিছুদিনের মধ্যেই খোলা রাস্তা থেকে উঠে গেল দেয়ালের আশ্রয়ে। একটা গলির মধ্যে একখানা-ঘরের বাসা। ছুবেলা ছুটি ডালভাতের সংস্থান। এর চেয়ে আর বেশি কী তার কাম্য। এবার সে অনায়াসে রাণীকে কাছে এনে রাখতে পারে। কিন্তু এই বিশাল জনারণ্যের মাঝখানে কোন গৃহকোণটিতে সে বসে আছে, কে বলে দেবে? এতদিনে কত বড় হল? মনে মনে হিসাব করে দেখল, প্রায় বছর দশেক হবে। কেমন দেখতে হয়েছে কল্পনা করবার চেষ্টা করল। নিশ্চয়ই তার মায়ের মত। তাইতো সবাই বলত। অবিকল রাধার মত দেখতে। কই, জজসাহেব তো একবারও তার খোঁজ নিলেন না। কথা দিয়েছিলেন, নিজে এসে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন, তার হাতে। হয়তো এসেছিলেন, তাকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেছেন। একবার মনে হল দেশ ছেড়ে কলকাতা আসাটাই তার ভুল হয়ে গেছে। ওখানে থাকলে হয়তো দেখা হত জজসাহেবের সঙ্গে, রাণীকে ফিরে পেত এতদিনে। কিন্তু না এসেই বা কী উপায় ছিল? এই যে বেঁচে থাকবার মত ছুটি অন্ন, মাথার উপরে একটু আশ্রয় সে পেয়ে গেছে দিলীপদার চেষ্টায়, ওখানে বসে তাও তো সে জোটাতে পারেনি। আচ্ছা, মেয়েটা কি আজও জজসাহেবের আশ্রয়েই আছে, না পাঠিয়ে দিয়েছেন কোনো বোর্ডিংএ কিংবা অনাথ আশ্রমে? বাপ-মা-হারা অনাথ আতুর অভাগাদের দলে মানুষ হচ্ছে তার রাণী! দৃশ্যটা কল্পনার চোখে ফুটে উঠতেই তার ছুচোখ জলে ভরে গেল।

দোকান বন্ধ করে বাসায় ফিরবার পথে তন্ময় হয়ে এই সব কথা

ভাবতে ভাবতে চলেছিল। রাত প্রায় নটা। গলিপথ প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। হঠাৎ পাশ থেকে কাঁধের উপর শক্তভারী হাতের চাপ পড়তেই চমকে উঠল। একেবারে মুখোমুখি পথ আগলে দাঁড়িয়ে একটি ছোটখাট দৈত্য। রাস্তার গ্যাস-পোস্টটা তার পিছনে এবং বেশ খানিকটা দূরে। লোকটির মুখের উপর অন্ধকারের আড়াল এবং তাকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে একরাশ দাড়ির জঙ্গল। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইল, এই মূর্তিটিকে আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। তার এই শঙ্কিত ভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ দাড়ির স্তূপে ফেটে পড়ল অট্টহাসি এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গোটা কয়েক ক্ষয়ে-যাওয়া অসমান সোনা-বাঁধানো দাঁত।

নিতাইদা! অস্ফুট চিৎকার করে উঠল শশাঙ্ক।

—তবু যাহোক চিনতে পারলি এতক্ষণে! কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তোর?

—আমার কথা থাক। দাড়ি রাখতে শুরু করলে কবে' থেকে? ঐ জন্যেই তো চিনতে পারিনি।

—ও সব নকল। —এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল নিতাই।

—নকল!

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আস্তে। পুলিশের উদ্দেশে একটা শকারন্ত বিশেষণ উচ্চারণ করে বলল, বড্ড পেছনে লেগেছে কদিন থেকে। গেজেটে না কি কাগজ আছে, তাতে ছবি পর্যন্ত ছেপে দিয়েছে। মস্ত লোক হয়ে গেছি, বুঝলি না?—বলে সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলো বের করেই সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল হাসিটা। চাপা গলায় বলল, কেউ আবার পেছু নেয়নি তো? টিকটিকি ব্যাটাদের কিছু বিশ্বাস নেই।

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, আছ কোথায়?

—তার কি কিছু ঠিক আছে রে? আজ এখানে কাল ওখানে। মাঝে মাঝে বেকায়দা বুঝলে একেবারে হাওয়া। তুই কী করছিস? থাকিস কোথায়? মেয়ে ফিরে পেয়েছিস তো?

—না, কই আর পেলাম। খোঁজই পাচ্ছি না।

—কেমন, আমি বলিনি? জজসাহেব বড্ড ভালো! এখন দেখলি তো? আরে, ওরা হল সব বড় লোক, বড় অফিসার। আমাদের কি মানুষ বলে গণ্য করে? তবে, ওজন্যে তুই ভাবিস না শশাঙ্ক। মেয়েটা যেখানেই থাক, ভালো আছে। একটা কিছু বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করে দিয়েছে জজসাহেব। তুই তাকে মানুষ করতিস কেমন করে?

একথার পর শশাঙ্ক নিরুত্তর রইল বটে, কিন্তু মন সায় দিল না। ভাল থাকাটাই তো সব নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি, কাছে থাকা। যত সুখেই থাক, তবু সে পরের ঘর, পরের আশ্রয়। ভালোভাবে মানুষ করতে পারছে না বলে কেউ কি নিজের সন্তানকে অপরের হাতে সঁপে দেয়? কে চায় 'আমার মেয়ে পরের ঘরে মানুষ হোক।'

শশাঙ্ক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেটা নিতাইএর চোখ এড়ায়নি। ওর ওই স্বভাব সে আগে থেকেই জানে। ব্যাপারটা হালকা করে দেবার উদ্দেশ্যে বলল, বিয়ে-থা করেছিস?

শশাঙ্ক মাথা নাড়তেই হেসে উঠল, নাঃ, এখনো তুই তেমনি ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস। বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হয়নি। কদ্দুরে তোর বাসা? একটু চা খাওয়াতে পারিস?

শশাঙ্ক লজ্জিত হল। এতক্ষণে এ প্রস্তাবটা তার কাছ থেকেই আসা উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি আগ্রহের সঙ্গে বলল, এই তো কাছেই। চল না?

নিতাই সরকার জেলখানার ছাপমারা পুরনো বাসিন্দা। কলকাতার

'পুরানা জেল'ই * তার সরকার-নির্দিষ্ট বাসস্থান। সেখানেই ছিল। দলবল জুটিয়ে কী একটা গণ্ডগোল বাধাবার উপক্রম করাতে কর্তৃপক্ষের হুকুমে তাকে মফঃস্বল জেলে চালান দেওয়া হয়। সেইখানেই শশাঙ্কের সঙ্গে পরিচয়। ভারী আমুদে মানুষ। হাসি ঠাট্টা হুল্লোড়ে জেলের ব্যারাক মাতিয়ে রাখে। তার জ্বালায় সাধ্য কি কেউ দুদণ্ড মুখ ভার করে থাকবে? বয়স, রুচি, স্বভাব, শিক্ষাদীক্ষা—কোনো দিকে মিল নেই, তবু কেমন করে শশাঙ্কের উপর তার একটি বিশেষ টান গড়ে উঠেছিল। জীবনের চরম দুঃখকে আশ্রয় করে যখনই তার মনের কোণে মেঘ জমতে শুরু করত, তখনই এসে হাজির হত নিতাই। হাসি গল্প জোর জুলুমের দমকা হাওয়ায় সে মেঘ দাঁড়াতে পারত না। এই বারবার-জেল-খাটা দাগী লোকটাকে ভিতরে ভিতরে কখন যে ভালোবেসে ফেলেছিল, শশাঙ্ক নিজেও কোনোদিন টের পায়নি।

যে-সব কার্যকলাপের ফলে তাকে মাঝে মাঝে জেলে যেতে হত, সেগুলো যে আসলে 'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ', নিতাই অস্বীকার করত না। কিন্তু তার ঐ দুঅক্ষরের প্রতিশব্দটি সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাত। নানা যুক্তি দিয়ে সে যা বোঝাতে চাইত, ভদ্র পোশাকে সেটা অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়—

'চুরি' কথাটার মধ্যে একটা গোপনতা এবং দীনতার ইঙ্গিত আছে। চোর যা-কিছু করে সব লুকিয়ে, সকলের চোখের আড়ালে। পাছে ধরা পড়ে সেই ভয়ে সে তটস্থ। তার চলাফেরার মধ্যে সর্বদা জড়িয়ে আছে শঙ্কা ও সঙ্কোচ। পালাবার জন্যে সে পা বাড়িয়েই আছে। লোকে তাকে ভয় ও ঘৃণা করে যতখানি, তার চেয়ে বেশি করে কৃপা ও অবজ্ঞা। সে বেচারা; সর্বজনীন উপহাসের পাত্র।

---

* প্রেসিডেন্সি জেলের চলতি নাম। বি ক্লাস কয়েদী অর্থাৎ যারা একাধিকবার জেল খেটেছে, ও জেলটি তাদেরই জন্যে সংরক্ষিত।

নিতাইএর কার্যকলাপ সম্বন্ধে এর কোনোটাই বলা চলে না। তার যেটা কর্মস্থল, সেখানে হাজার লোকের আনাগোনা, কর্মপদ্ধতির মধ্যেও কোন গোপনতা নেই। চুরি অপরাধ অর্থাৎ ৩৭৯ বা ৩৮০ ধারায় সাজা নিয়ে যারা জেলে এসেছে, তাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলত নিতাই, ওদের মত অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গেরস্ত বাড়ির তালাভাঙ্গা, গরাদেকাটা, আর একটু শব্দ হলেই শেয়ালের মত দে ছুট—ও সব ছোট কাজ আমি করি না। আমি যা করি তার মধ্যে, বাবা, লুকোচুরি কিছু নেই। সকলের সামনে মরদের মত বুক ফুলিয়ে গটগট করে ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে উঠলাম। যে-সে গাড়ি নয়, বোম্বাই মেল, দিল্লী এক্‌স্‌প্রেস্‌, মাদ্রাজ মেল, এই সব দূরপাল্লার জমকালো গাড়ি, যাতে বড় বড় লোক আসে যায়।

—টিকিট চায় না? প্রশ্ন করল হয়তো কোনো অর্বাচীন অনুচর।

—চায় বৈকি? টিকিট করেই উঠি। যেখানে যেরকম মানায়, বেশ হোমরাচোমরা গোছের একটা নাম দিয়ে বার্থও রিজার্ভ করে ফেলি দরকার মত। এই যেমন মাদ্রাজ মেলে হলাম ভেঙ্কটরাম আচারিয়া, বোম্বাই মেলে গোবর্ধনলাল ঝুনঝুনওয়ালা, দিল্লীর গাড়িতে তেমনি মিস্টার এস. বি. চ্যাটার্জি। নামের সঙ্গে ম্যাচ করে, সে রকম পোশাকও যোগাড় করতে হয়। চেহারাটা তো আর মন্দ দেননি ভগবান। তার ওপরে বেশ মানানসই হ্যাট্ কোট, পাগড়ি টাগড়ি চাপিয়ে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বেশ একটা দামী সিগারেট ধরিয়ে যখন ধোঁয়া ছাড়ি কার সাধ্যি বলে—ব্যাটা সেই পুরনো চোর নিতাই সরকার?

—তবে ধরা পড় কেমন করে?

—আরে, সব বারে কি আর পড়ি? মাঝে মাঝে পড়তে হয়। এই যেমন সেবার হল। কোলকাতা থেকে পাঞ্জাব মেলে চড়েছি।

ওপরের বার্থে বিছানা-টিছানা করে পড়ে আছি ঘাপটি মেরে। ওদিকটায় এক ব্যাটা ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারী নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। নিচের দুখানা বেঞ্চির একটাতে আছে একটি অল্পবয়সী মেয়ে, বোধহয় ওর ছেলের বৌ-টৌ হবে, আরেকটাতে একজন গাট্টাগোট্টা আধাবয়সী মেয়েছেলে। দেখে মনে হল ওদের ঝি, কি কোনো দূর-সম্পর্কের আত্মীয় টাত্মীয়। বৌটির বেঞ্চির তলায় একটা ছোট স্যুটকেস। এক নজর দেখেই বুঝতে পেরেছি, ওর পেটভরা গয়না। এক-একটা স্টেশনে গাড়ি থামে আর মাথা তুলে তুলে উঁকি মেরে দেখে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা কোন্ বড় স্টেশনে গাড়ি এসে লাগল। অনেক রাত। কারো সাড়া নেই। আস্তে আস্তে ওপর থেকে নেমে এলাম। দরজা 'লক্ করা' ছিল। কোনো রকম শব্দ না করে খুলে ফেললাম। তখনো সব চুপচাপ। স্যুটকেসটা হাতে করে প্লাটফরমে যেমনি পা দেওয়া, হঠাৎ কোত্থেকে আচমকা উড়ে এসে কোমর জড়িয়ে ধরল দুখানা চুড়িপরা হাত

—তা মন্দ কি! রসিকতা করল কে একজন, কমবয়সী মেয়ের নরম নরম মিষ্টি হাত—

—আরে না, না। সে কপাল আর হল কই? ঐ মদ্দা ঝিটা। হাত তো নয়, যেন দুটো লোহার সাঁড়াশি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে কোনো রকমে কোমর যদি বা ছাড়ালাম, এইখানটায় বসিয়ে দিল দাঁত, ডান হাতে একটা বড় দাগ দেখিয়ে যোগ করল, ওটা মানুষ নয়, নির্ঘাৎ রাক্ষুসী। দাঁতে কী বিষ! পুরো এক মাস পড়ে থাকতে হল জেল হাসপাতালে।

মজলিশের ভিতর থেকে আর একজন কে বলল, একটা ভুল করেছিলে, নিতাইদা। প্লাটফরমে না নেমে যদি উল্টো দিকে নামতে—

—সে কথা একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু মনটা কেমন খুঁত খুঁত

করতে লাগল। চোরের মত অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবো? ধরতে এলে ছুটবো রেল লাইন ধরে? ধুৎ!

যারা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় তাদের কেউ কেউ উপস্থিত ছিল নিশ্চয়ই। কথাটা কারো কারো গায়ে লাগল এবং একজন বলে বসল, গা ঢাকা না দাও, চুপি চুপি সরে পড়বার চেষ্টা তো করেছিলে।

—ঐটাই হল ভুল। গোপনে কাজ সারতে গিয়েই ধরা পড়লাম। তার চেয়ে যদি দিনের বেলায় আমার মাল পত্তরের সঙ্গে ঐ স্যুটকেসটাও কোনো রকমে মিশিয়ে ফেলে নেমে পড়তাম, তাহলে আর ধরে কে?

—ওরা যদি চেঁচাত?

—চেঁচাক না যত খুশি? একজন কোটপ্যাণ্টটাইপরা ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জার! চোর বলে কার সাধ্যি? কাছে ঘেঁষতেই কেউ সাহস করত না। এলাহাবাদ স্টেশনে সেবার কী হল? ভর দুপুর বেলা গাড়ি-ভর্তি লোক। একজন যেই বাথরুমে গেছে, কুলী ডেকে তার ভারী বাক্স আর বিছানাটা নিয়ে সরে পড়লাম। চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, কারো কারো সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলতে পারল না। ওরা যে সব ভদ্দর লোক। চক্ষু-লজ্জায় বাধে; বুঝলি?

নিজের ঘরে এসে মাদুর বিছিয়ে দিয়ে শশাঙ্ক বলল, "তুমি বসো, নিতাইদা, আমি এক্ষুনি আসছি।" নিতাই ঘরের চারিদিকটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একপাশে গুটিয়ে-রাখা ছোট্ট বিছানা, একটা টিনের স্যুটকেশ, খবরের কাগজের উপর সাজানো একগাদা বইপত্র। আর একদিকে সামান্য ক'খানা বাসন, একটা ঝুড়ি, একটা ছোট তোলা উনুন। দেখতে দেখতে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল। এক ঠোঙা খাবার আর কাঁচের গেলাসে চা হাতে করে শশাঙ্ক ঘরে

ঢুকতেই সজাগ হয়ে উঠল। অন্তরঙ্গ সুরে বলল, তোর ঘরখানা বেশ লাগল, বুঝলি শশাঙ্ক? কিন্তু একটা জিনিসের অভাব আছে।

—কী জিনিস।

—একটা বৌ।

শশাঙ্কের বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। কদিন হল রাধার কথা একবারও মনে হয়নি। এরই মধ্যে বিস্মৃতির ধুলো জমতে শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন পুরু হতে থাকবে। তারপর হয়তো একদিন সে একেবারেই চাপা পড়ে যাবে। সে সম্ভাবনার কথা মনে হতেই শিউরে উঠল। নিতাই বলল, কথা বলছিস না যে? মুখের উপর ম্লান হাসি টেনে এনে উত্তর দিল শশাঙ্ক, সব অভাব কি পূরণ হয় নিতাইদা? তা ছাড়া সব জিনিস সকলের কপালে টেকে না।

—তা ঠিক। সব জিনিস সকলের কপালে টেকে না।

একটু যেন উদাস সুর লাগল পুলিশের ভয়ে পালিয়ে-বেড়ানো ফেরারী আসামী নিতাই সরকারের ভাঙা গলায়। হয়তো তার বিস্মৃত দিনের কোনো অভাব বা অপ্রাপ্তি চকিতে একবার ছায়া ফেলে গেল তার কঠিন মনের কোন গোপন কোণে। সঙ্গে সঙ্গে সে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, ও সব বাজে ভাবনা ছেড়ে দে। টপ করে একটা বিয়ে করে ফেল। আচ্ছা, সে ভার আমি নিলাম। দেখে শুনে কদিনের মধ্যেই—

—সে কথা এখন থাক, নিতাইদা। এবার তোমার কথা বল।

—কেন, থাকবে কেন? বউকে খাওয়াবি কি, তাই ভাবছিস? সে ভাবনা আমার। এই এক বোঝা বই-পত্তর নিয়ে কী করছিস? ওতে কত আসে? চলে আয় আমার লাইনে। তোর মত ছেলে; দুদিনে অবস্থা ফিরে যাবে।

—"কী হবে! এই বেশ আছি। এর থেকেই যদি একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি"—বলেই হঠাৎ থেমে গেল। চকিতে মনে পড়ে

গেল রাণীর কথা'। দাঁড়ানো দরকার তো তারই জন্যে। তা না হলে নিজের প্রয়োজন আর কতটুকু!

নিতাই চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, "তুই তেমনি কাঁচাই রয়ে গেলি শশাঙ্ক। মাথা তুলতে দিচ্ছে কে তোকে? দিলেই বা কদ্দূর তুলবি?" স্বর নামিয়ে চোখের ইঙ্গিতে পাশের বাড়িটা দেখিয়ে বলল, "ও দিকটায় বুঝি বাড়িওয়ালা থাকে?"

—হুঁ।

—ওরা জানে যে তুই একবার জেলে গিয়েছিলি?

—বোধ হয় না। সে সব কথা কিছু হয়নি।

—হলেও চেপে যাবি। ঢাক ঢোল পিটিয়ে যেন বলতে যেও না কোনোদিন জেলে ছিলে, বা জেলের কারো সঙ্গে জানাশুনো আছে। সব ব্যাপারে যুধিষ্ঠির হলে চলে না। বুঝলে?

চায়ের গেলাসটা নামিয়ে রেখে উঠতে উঠতে বলল, আজ চলি; আরেক দিন আসা যাবে। যদি পারি দেবুকে নিয়ে আসবো।

—দেবু কে?

—আমাদেরই একজন। লেখাপড়া জানা ভালো ঘরের ছেলে। একদিন এসে পড়েছিল এই রাস্তায়। এখানেই রয়ে গেছে। বলে, কাজ নেই আমার ভালো হয়ে। যারা মন্দ, তাদের সঙ্গে মন্দ হয়েই যেন থাকতে পারি। জেল-ফেরৎ হতভাগাদের নিয়েই ওর কাজ। যারা দু পয়সা দিতে পারে তাদের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু করে চাঁদা তোলে। তার থেকেই যার যা দরকার চালিয়ে দেয়। এমন মজার মজার সব কথা বলে, জানিস? শীগগিরই একদিন নিয়ে আসবো তোর কাছে!

বেশি দেরি হল না। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এমনি রাত করে আবার একদিন এল নিতাই। শশাঙ্ক শোবার আয়োজন করছিল। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল। পেছনের

লোকটির দিকে তাকাতেই নিতাই পরিচয় করিয়ে দিল, এই আমাদের দেবু।

শশাঙ্ক খুশি হয়ে বলল, আসুন আসুন।

—আসুন নয়, এস। যেন মারাত্মক ভুল শুধরে দিয়েছে, এমনি ভাবে বলল দেবু, আমরা সামাজিক মানুষ নই। কাজেই সেখানকার সব নিয়ম-কানুন, এই যেমন অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে ভদ্রতা করা, আমাদের মানায় না।

—যা বলেছিস, বলেই নিতাই তার অট্টহাসির রোল তুলেই সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিল। চোখ বড় বড় করে আবার তাকিয়ে দেখল বাড়িওয়ালার বাড়ির দিকে।

দেবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, নিতাইদার হাসি থামাবার কসরৎ দেখেই বুঝতে পারছ, কী রকম হুঁসিয়ার হয়ে আমাদের চলতে হয়। তার কারণ, ওঁদের কাছে, মানে মানুষের সমাজে আমরা শুধু অসামাজিক নই, সমাজ-বিরোধী, ওঁরা ইংরেজিতে বলেন anti-social. হাসির ছোঁয়াচও মারাত্মক।

শশাঙ্ক কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি মাদুর বিছিয়ে দিল। নিতাই বসে পড়ে বলল, সেদিন গিয়েই দেবুকে তোর কথা বললাম। সেই থেকেই ও তাড়া দিচ্ছে, কবে আবার ডাক পড়বে, দুহাতে ভারী বালা পরে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি, তার আগেই চল একদিন আলাপটা সেরে আসি।

—খালি আলাপ করতে আসিনি, তার সঙ্গে কিছু কাজও আছে বলে, দেবু তার ভিতর দিকের পকেট থেকে একটা ছাপান কাগজ বের করে এগিয়ে ধরল শশাঙ্কের দিকে।

—কী এটা? হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে চোখে পড়ল বড় বড় হরফের শিরোনামা—অমানুষ-সঙ্ঘ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল দেবুর মুখে। দেবু বলল, একটু কেমন কেমন লাগছে না? কী করা

যাবে, বল? ছুনিয়ায় বাঁচতে হলে, চাই লড়াই। সেটা এক হাতে চলে না। দশজনে মিলে হাত মেলাতে হয়, অর্থাৎ দল গড়তে হয়। ঐ দলেরই আরেক নাম হল সঙ্ঘ। দল কথাটার মধ্যে কেমন একটা দলাদলির গন্ধ আছে; অনেকের পছন্দ নয়। তাই এই গালভরা নামটা রাখতে হয়েছে।

—লড়াইটা কার কার মধ্যে ঠিক বুঝতে পারছি না; এতক্ষণে প্রশ্ন করল শশাঙ্ক।

—কেন, মানুষের সঙ্গে অমানুষের লড়াই।

—কিন্তু আমার তো মনে হয় এটা আমাদের অভিমান। ওরা বলছে বলেই আমরা ও কথাটা মেনে নেবো কেন?

—না মেনে যাচ্ছ কোথায়? জেলখাটা লোকগুলোর ওপরে একটু আধটু দয়া বা অনুগ্রহ যে কারো কারো মনে নেই, তা বলছিনে। কিন্তু তার মধ্যে, তারা যে মানুষ, সে স্বীকৃতি নেই।

—তাই যদি হয়, আমাদেরই দেখিয়ে দিতে হবে যে আমরা মানুষ।

—কেমন করে দেখাবে?

—মনুষ্যত্বের যেটা সোজা সরল পথ তাই ধরে যদি চলবার চেষ্টা করি, তাহলেই সেটা সম্ভব।

—সে সুযোগ কোথায়? সেখানে কত যে বাধা তা হয়তো তুমি জান না।

—সবটা না জানলেও, কিছু কিছু জানি। কিন্তু বাধা আছে বলেই হটে আসতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমার তো মনে হয় লড়াই-এর দরকার যদি কোথাও থাকে, সে ঐখানে; মানুষ হবার পথে যে-সব বাধা আছে সেগুলো সরিয়ে দেবার জন্যে।

—তাতে শুধু শক্তিক্ষয় হবে, আর কোনো লাভ হবে না। লাঞ্ছনা অত্যাচারের ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু অনুকম্পা হয়তো পাবো, কিন্তু মর্যাদা পাবো না। সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে আমাদের

একমাত্র পরিচয় হবে Ex-Convicts, খালাসী কয়েদী, একটা বিশেষ সেক্‌ট বা শ্রেণী, বলতে পার, এক নতুন ধরনের হরিজন, যাদের সুখ-সুবিধার নাম করে সরকারী বাজেটে কিঞ্চিৎ অর্থ মঞ্জুর হবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট লাইন বা স্তরের ওপরে তাদের কোনোদিন উঠতে দেওয়া হবে না।

দেবুর কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস পেয়ে শশাঙ্ক নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এল। কোনো রকম তর্কের সুর না প্রকাশ. পায় এমন ভাবে বলল, তোমার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি, সে বিদ্যা আমার নেই, ভাই। তেমন করে ভাবিওনি কিছু। তবে এইটুকু মনে হয়, ঐ যে তুমি বললে এক্‌স্‌-কনভিক্‌টস্‌, প্রথম প্রথম ঐ নামেই আমাদের আলাদা হয়ে থাকতে হবে, এটা ঠিক। তারপর আস্তে আস্তে লোকেও ভুলে যাবে, আমরাও ভুলব। এতবড় দুনিয়ায় সবাই আজ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। পরের সঙ্গে সম্পর্ক যেটুকু, সে শুধু কাজের সূত্রে।. তার মধ্যে কে কী ছিল, কে কোত্থেকে এল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়?

নিতাই এসে অবধি সটান শুয়ে পড়েছিল এবং এতক্ষণ ধরে ওদের কথাই শুধু শুনে যাচ্ছিল, নিজে কোথাও যোগ দেয়নি। এবার একটু অসহিষ্ণু সুরেই বলে উঠল, মানলাম তোর কথা। সবাই আমাদের মাথায় তুলে রাখবে, পুলিশ পেছনে লাগবে না, পাড়া-পড়শীরা ভয়ে ভয়ে থাকবে না, দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে। কিন্তু যাকে তুই সোজা রাস্তা বলছিস, সেখানে আমরা করবোটা কী, আর কটা পয়সাই বা কামাতে পারবো। তোর মত বড় জোর এই আলুসেদ্ধ ভাতের যোগাড় হবে। তাও সবাই পাবে না। তার চেয়ে নিজেদের কোমরে—

ঘরের বাইরে জুতার শব্দ শোনা গেল। সাধারণ জুতো নয়, বেশ ভারী এবং বুটের আওয়াজের মত। নিতাই ধড়মড় করে উঠে

পড়ল এবং জানালা দিয়ে এক পলক তাকিয়েই পেছন দিকের দরজা খুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সামনেকার ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল পুলিশ—একজন অফিসার, জন চারেক সিপাই এবং সেই সঙ্গে একজন সাদা পোশাকপরা লোক। অফিসারটি রিভলভার হাতে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেলেন পিছনের খোলা দরজার দিকে। চারদিকে টর্চ ফেললেন বার কয়েক, কাউকে দেখা গেল না। একটা সরু গলিপথ বাড়িওয়ালার সদর দরজায় গিয়ে থেমেছে। তার ধার ঘেঁষে ছফুট উঁচু কম্পাউণ্ড পাঁচিল। পাঁচিলের ওপাশে রাস্তা। টর্চের আলোয় আগাগোড়া পাঁচিলটা পরীক্ষা করে পিছন ফিরে সাদা পোশাক-পরা অনুচরটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ঠিক দেখেছিলে ?

—এই মাত্তর আমি নিজের চোখে দেখে গেছি হুজুর।

—এই পাঁচিল টপকে পালিয়েছে। দাগও রয়েছে দেখছি। ব্যাটা এক নম্বর ঘুঘু। আচ্ছা !

ততক্ষণে সিপাই চারজন দেবু এবং শশাঙ্ককে ঘিরে ফেলেছে। অফিসারটি ঘরে ফিরে তাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বন্ধুটি গেলেন কোথায় ?

—"কার কথা বলছেন স্যার ?" যেন গাছ থেকে পড়ল দেবু, "এখানে তো আর কেউ ছিল না। সেই সন্ধ্যা থেকে আমরা দুটিতেই গল্প করছি।"

"I see ; তুমি কি বল ?" শশাঙ্কের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন সাবইন্‌স্‌পেক্টর।

—কি জানতে চান, বলুন ?

—উনি যা বললেন, শুধু 'দুজনে মুখোমুখি' আর কেউ নয়।

শশাঙ্ক জবাব দিল না। এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন পুলিশ অফিসার, বল আর কে ছিল এখানে ?

—ছিল একজন, খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলল শশাঙ্ক।

—কে সে ?

শশাঙ্ককে নিরুত্তর থাকতে দেখে বললেন, ও, বলতে চাও না, আচ্ছা! ওষুধ পড়লেই বলবে।

দারোগাবাবু সিপাইদের কী ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তালাসি। ঘরের কোণে সাজানো খবরের কাগজের গাদা এবং অন্যান্য বইপত্র উলটে-পালটে, বিছানা বাসন ছুঁড়ে, কাপড়-চোপড় ছড়িয়ে তছনছ করে ফেলা হল। শরীর তালাসি করে শশাঙ্কের কাছে পাওয়া গেল দুটাকা কয়েক আনা, আর দেবুর পকেট থেকে বেরোল কয়েকখানা বিজ্ঞাপন এবং কিছু হিসাবপত্র।

—তোমাদের থানায় যেতে হবে! গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করলেন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর। দেবু কোনো কথা বলল না। শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

—কেন, তা ওখানে গেলেই জানতে পারবে।

একজন সিপাই এগিয়ে এসে দুজনের কোমরে দড়ি বাঁধল এবং একজনের ডান, আরেকজনের বাঁ হাত একসঙ্গে জুড়ে লাগিয়ে দিল হাত-কড়া।

ছয়

দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট। অর্থাৎ ঘর বলতে দুখানা, কিন্তু তার সঙ্গে আর কিছু ফাউ—যথা, একফালি বারান্দা, এক চিলতে রসুইখানা, এক টুকরা খাবার জায়গা, আর তার পাশে একটুখানি ঝকঝকে বাথরুম। দিল্লীর এই সোয়াশ ডিগ্রি উত্তাপে যখন সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে, ঐখানটি আশ্রয় করে মাথার উপরকার ঝরনাটি খুলে দিয়ে দাঁড়ালে বিশ্বসংসার ভুলে যাওয়া যায়। অন্ততঃ অনিমার তাই মনে হয়। ঐ ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের সমস্ত উল্লাস সুর হয়ে ফুটে ওঠে। সে সময় যদি কেউ এসে পড়ে, বন্ধ দরজার এ পাশে দাঁড়ালে শুনতে পাবে জলপড়ার শব্দের সঙ্গে জলতরঙ্গ বাজনার মত ভাঙাভাঙা গানের কলি। সংসারের যতরকম বিলাস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় বোধ হয় স্নান-বিলাস।

অনেক ঘোরাঘুরি অনেক খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ এই আশ্রয়টুকু একদিন জুটে গিয়েছিল। সেদিন সত্যিই মনে হয়েছিল, জীবনে কাম্য যদি কিছু থাকে, সেটা "ধন নয় মান নয়, একটুকু বাসা।" হোক না ছোট, তবু এ-সবটাই তার নিজের, তার একান্ত আপনার। হয়তো এতটুকু বলেই এত মধুর।

দিল্লীতে চাকরি পাবার পর বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল মাসিমার বাড়িতে। আদরযত্নের স্নেহের ও সখ্যের অভাব হয়নি, অভাব ছিল একটুখানি আরামের—নিরালা গৃহকোণে কিংবা নির্জন অন্ধকারে ঠাণ্ডা মেঝের উপর গা এলিয়ে না দিলে যা পাওয়া যায় না। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এমন কতগুলো মুহূর্ত আসে যখন মন চায় একান্তভাবে নিজের মধ্যে ডুব দিতে। নিতান্ত যে অন্তরঙ্গ তার সঙ্গও

তখন পীড়া দেয়, নিতান্ত যে প্রিয় তাকেও তখন ভাল লাগে না। মাসী-মার বাড়ির লঘুগুরু বহু পরিজনের সর্বাত্মক মনোযোগের লক্ষ্যস্থলে বসে অনিমা নিজের মনের দিকে কখনো তাকাবার অবসর পায়নি। অনুক্ষণ অন্য সবাই যার খোঁজ নিয়ে ফিরছে, নিজের খোঁজ সে নেবে কখন ?

এতদিনে যেন একটা হাঁফ ছাড়বার সুযোগ পাওয়া গেল।

এই বিরল সৌভাগ্যের জন্য একজনের কাছে সে কৃতজ্ঞ, এবং সে কৃতজ্ঞতা অনিমা একটি মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারে না। সে ব্যক্তিটি তার সহকর্মী রাঘবন্ আচারিয়া। আফিসে ঢুকবার পরেই বেশ কিছুদিন ধরে তার চারদিক থেকে যে-সব বিভিন্ন বয়সী এবং বিভিন্ন পদাধিকারী শুভানুধ্যায়ীর দল নানাভাবে তাকে সাহায্য করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং সৌজন্যের আতিশয্যে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে এই লাজুক ও স্বল্পভাষী প্রিয়দর্শন মাদ্রাজী যুবকটিকে দেখতে পাওয়া যায়নি। হয়তো সেই কারণেই সে চোখে পড়েছিল সব চেয়ে বেশি। তারপর এখানে, ওখানে, সিঁড়ির মুখে লিফটের ধারে, রাস্তার মোড়ে বাসস্ট্যাণ্ডে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। ক্ষণিকের মৃদু হাসি, এক পলক দৃষ্টি বিনিময়, একটি ছোট নমস্কার, কখনো বা দুটি সাধারণ কুশল প্রশ্ন—কিছুদিন পর্যন্ত এর মধ্যেই ছিল তাদের পরিচয়ের সীমানা।

সে দিনটা ছিল বোধ হয় রবিবার কিংবা অন্য কোনো ছুটির দিন। টুকটাক কেনাকাটা উপলক্ষ্য করে একটু ঘুরে বেড়ানোই ছিল অনিমার উদ্দেশ্য। গোলবাজার থেকে বাইরে বেরোতেই ঠিক সামনে রাঘবন। মুখে সেই ছেলেমানুষের মত সলজ্জ হাসি। দেখামাত্র হাত দুটো উদ্যত হল নমস্কারের ভঙ্গীতে। প্রতিনমস্কার করে অনিমাই প্রথম প্রশ্ন করল, বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি ?

প্রশ্নটা ছিল ইংরেজিতে, উত্তর এল পরিষ্কার বাংলায়, ঠিক বেড়াতে নয়, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

—বাঃ, চমৎকার বাংলা বলেন তো আপনি !

রাঘবন আরো লজ্জিত হল। বলল, একটু একটু শিখেছি। আপনি বুঝি মার্কেটিং, মানে, বাজার করতে বেরিয়েছেন ?

—হ্যাঁ ; তবে বেড়ানটাই আসল।

—কদ্দূরে থাকেন আপনি ?

—টিমারপুর।

—টিরামপুর ! সে তো অনেক দূর। আফিস থেকেও অনেকখানি পথ। যেতে আসতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয় আপনার।

—কষ্ট হলে আর কী করবো বলুন ? কাছাকাছি বাড়ি পাচ্ছি কোথায় ? কমাস ধরে একটা ফ্ল্যাট খুঁজছি। পেলাম না তো।

—কত বড় ফ্ল্যাট হলে আপনার চলে ?

—কত আর ? একা থাকবো ; খান দুই ঘর হলেই যথেষ্ট।

—আচ্ছা, আমি চেষ্টা করবো, অবিশ্যি আপনার যদি আপত্তি না থাকে !

—আপত্তি কি বলছেন ! আমি তাহলে বেঁচে যাই। তবে আপনার খানিকটা কাজ বাড়ল, এই যা।

—কিছু না।

এর পরে আর কথা হয়নি। রাঘবন একটু ইতস্ততঃ করছিল ; যেন কিছু একটা বলতে চায়, কিন্তু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। হয়তো মনে মনে ছিল অনিমাকে খানিকটা এগিয়ে দেবার প্রস্তাব। মুখ ফুটে বলতে পারেনি। সে অনুরোধ যদি আসত অনিমা নিশ্চয়ই আপত্তি করত না, মনে মনে বোধ হয় খুশিই হত। কিন্তু নিজে থেকে তো আর একথা তুলতে পারে না। ততখানি ঘনিষ্ঠতা ওদের হয়নি। কি জানি কি মনে করবেন ভদ্রলোক।

আরো মাসখানেক কেটে গেল। বাড়ি খোঁজার সূত্র ধরে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই ওরা আরো খানিকটা কাছাকাছি সরে এল। কোনো

কোনো দিন আফিসের পর ঐ নিয়ে কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ একসঙ্গে গিয়ে তারপর ওরা ভিন্ন দিকের বাস্ ধরে। একখানা ফ্ল্যাট জোটাবার জন্যে রাঘবন অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে এবং না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। তার এই উপকারটুকু যদি করতে পারে নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করবে, এসবই অনিমা জানে। মনে মনে খানিকটা কৌতুক উপভোগ করে। খুশীও কি আর না হয়? কিন্তু কথাবার্তায় ধরা-ছোঁয়ার ধার দিয়েও যায় না। বরং অনুযোগ করে বসল একদিন, করছেন কী আপনি! বাড়ি খুঁজতে বলেছি বলে প্রাণ-টা তো আর দিতে বলিনি।

রাঘবন হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। বিস্ময়ে আনন্দে লোভে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার ভীরু দৃষ্টি। অনিমাও চমকে ওঠে। কথাটা নিজের কানে যেতেই এক ঝলক রক্ত ছুটে এল মুখের উপর। ছি ছি, এ কী বলে ফেলল সে! সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নেবার চেষ্টা করে, "নিজের কাজ-কর্ম ফেলে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরছেন। অসুখে পড়বেন যে। আগে জানলে কখ্খনো আপনাকে বলতাম না আমার বাড়ির কথা।"

শেষের কথাগুলো আচারিয়ার কানে পৌঁছায় এই পর্যন্ত। কিন্তু তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করে রাখে অসাবধানে বলে-ফেলা অনিমার সেই প্রথম উক্তি। উত্তরে অনেক কথা ভিড় করে আসে মনের মধ্যে। বলা হয় না কিছুই।

তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ জুটে গেল এই ফ্ল্যাট। দুজনে মিলে দেখতে গেল এক ছুটির দিনে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রতিটি ঘরের প্রতিটি কোণ। খুব খুশী হল অনিমা। সেই খুশীর ঝলক ছড়িয়ে পড়ল আরেক জনের চোখে। সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি নামতে নামতে মুগ্ধ মৃদুকণ্ঠে বলল অনিমা, কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, মিস্টার আচারিয়া। সত্যি বড় উপকার করলেন!

রাঘবনের মুখ থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে গেল, "শুধু উপকার !" চমকে উঠল অনিমা। কী বলতে চায় রাঘবন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। কেমন একটা অপূর্ব তন্ময়তা যেন জড়িয়ে আছে চোখদুটোয়। ঠিক আগের রাতটিতেই বারবার করে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানী। সেই নেশা লেগেছিল মনে। তারই মাদকতা নিঃসৃত হল কণ্ঠে—শুধু উপকার !

অনিমার মুখখানা প্রথমে লজ্জারুণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল। ততক্ষণে দুজনেই সিঁড়ির ধাপগুলো পার হয়ে ছোট্ট চাতালটিতে এসে পৌঁছেছে। অনিমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই রাঘবন থমকে দাঁড়াল। তার সেই স্বচ্ছন্দ সরল সাদা হাসিটুকু যেন দপ করে নিবে গেল, ফুটে উঠল আতঙ্কের ছায়া। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, একি ! আপনি রাগ করলেন? না, না, ও কথার কোনো অর্থ নেই। এমনি বলছিলাম। আপনার মুখে ঐ উপকার কথাটা শুনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল কবিগুরুর দুটি লাইন। কালই পড়ছিলাম কিনা?—

শুধু উপকার ?
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর ?

কিছু মনে করবেন না আপনি। হঠাৎ বলে ফেলেছি।

—না, না, এতে মনে করবার কী আছে? মুখের উপর একটুখানি ম্লান হাসি টেনে এনে বলল অনিমা। কিন্তু সে হাসি ফুটল না। রাঘবন এইমাত্র তাকে আশ্বাস দিয়েছে, যা সে হঠাৎ বলে ফেলেছে তার কোনো অর্থ নেই। নিছক কবিগুরুর লাইন, আর কিছু নয়। এর পরে তো অনিমার নিশ্চিন্ত হবার কথা। ইংরেজিতে যাকে অফেন্স নেওয়া বলে (অপরাধ কথাটা এখানে অফেন্স-এর ঠিক প্রতিশব্দ নয়) তার কোনো কারণ ঘটেনি। সবই ঠিক। তবু তার নারীহৃদয়ের কোনো একটা অদৃশ্য কোণে মাথা তুলে উঠল একটুখানি ক্ষুব্ধ অভিমান। কে চেয়েছিল এই গায়ে-পড়া কৈফিয়ৎ? অত

ঘটা করে জানাবার কী দরকার ছিল, যা বললাম তার কোনো অর্থ নেই, শুধু কবিতার লাইন আউড়ে গেছি?

কদিনের মধ্যেই মাসিমার আশ্রয় ছেড়ে নতুন বাসায় উঠে এল অনিমা। সেদিনটা ওর মাসতুতো ভাইবোন এবং অন্য যারা যারা তার নতুন সংসার পত্তনে সাহায্য করতে এসেছিল, তার মধ্যে রাঘবনও ছিল। ভিড়ের মধ্য থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর আর আসেনি। অনিমার সঙ্গে তার যা কিছু সংযোগ বা সম্পর্ক সব যেন শুধু এই বাড়ি খোঁজা আর বাড়ি পাওয়ার মধ্যেই সীমিত, তার বাইরে আর কিছু নেই। এই আশ্রয়টুকু সংগ্রহ করে সেখানে তাকে বসিয়ে দিয়েই কি সব কর্তব্য শেষ হয়ে গেল, একবার খোঁজ নিতে নেই সে কেমন আছে? আফিসে প্রায় রোজই ওদের দেখা হয়। চোখাচোখি হলেই রাঘবনের সেই ছোট্ট নমস্কারটি কখনো ভুল হয় না, কিন্তু তার সঙ্গে সেই অন্তরঙ্গ হাসিটুকু যেন অভ্যর্থনা জানায় না। অনিমাও ঠিক আগের মত সেই সহজভাবে সাড়া দিতে পারে না। কথাবার্তা যা হয়, তার মধ্যেও সৌজন্যের অভাব নেই, তবু একথা বুঝতে পারা যায়, আরো কী একটা ছিল, যা চলে গেছে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অনিমা যতই ভাবে সব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবে, ফিরে যাবে সেই লঘুপক্ষ দিনগুলোর মধ্যে, এ বিদেশী মানুষটি যখন তার জীবনে আসেনি, ততই ফিরে ফিরে তার মনের কোণে বেজে ওঠে ভিন্নভাষী উচ্চারণে কিন্তু গভীর সুরে বলা মহাকবির দুটি ছোট্ট লাইন। অন্তরের সঙ্গোপনে প্রশ্ন জাগে, একি সত্যিই শুধু কাব্য, শুধু আবৃত্তি, কথার পৃষ্ঠে কথা, ভাষণের উত্তরে প্রতিভাষণ? তার পরেই আবার মনে মনে লজ্জিত হয় অনিমা। এ কী হল তার? কী সব ছাইভস্ম ঢুকল তার মাথার ভিতর?

নতুন বাসায় এসে এখানকার এই নির্ঝঞ্ঝাট নির্জনতা প্রথম দিকে যেমন তার মনটা বেশ হালকা করে দিয়েছিল, তুদিন না যেতেই আবার ভারী হয়ে চেপে বসল। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মন নামক মহাশয়ের মন পাওয়াই ভার। আজ যা তার ভাল লাগে কাল সেদিকে তাকাতেও চায় না। মাসিমার বাড়িতে যাদের অবিরাম সঙ্গ একদিন ক্লান্তিকর মনে হয়েছিল, এবং এখানে এসে সে ক্লান্তিভার নামিয়ে দিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, বাঁচলাম, আজ তাদেরই কারো আশায় বসে বসে আবার নতুন করে ক্লান্তি আসে। দিনটা কেটে যায় কাজের মধ্য দিয়ে, বিকেল আর সন্ধ্যাগুলো কাটতে চায় না। প্রথম প্রথম ভাই-বোনেরা ঘন ঘন না হলেও মাঝে মাঝে আসত। মাসিমাও একবার এসে দেখে-শুনে গেছেন, তারপর স্বাভাবিক গতিতেই একটা আসা থেকে আর একটা আসার ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল। আজ ওটা কালেভদ্রে এসে ঠেকেছে। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। একে অনেকখানি দূর, তায় সকলেরই চাকরি-বাকরি, কাজকর্ম ইস্কুল-কলেজ একটা কিছু আছে। ঘন ঘন যাওয়া-আসার আর্থিক দিকটাও অবহেলা করা যায় না।

পাশাপাশি ফ্ল্যাটগুলোয় নানা দেশের লোক। আলাপ-পরিচয় যে একেবারে না হয়েছে তা নয়। তু একটি সমবয়সী মেয়ে, বেশিরভাগ গিন্নীবান্নীরা মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেন, গল্পসল্পও করে থাকেন। কিন্তু আলাপ আর অন্তরঙ্গতা এক জিনিস নয়। ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও প্রথমটা চালিয়ে নেওয়া যায়; শেষেরটি গড়ে উঠতে সময় লাগে, হয়তো কোনোদিনই গড়ে উঠতে চায় না। যাদের ভাষা এক নয়, একটি তৃতীয় ভাষাকে আশ্রয় করে তাদের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌজন্যের আদান-প্রদান চলতে পারে, সৌহার্দ্যের পথেও বাধা নেই, কিন্তু তুজনের মাঝখানে কোথায় যেন একটা অন্তরাল থেকে যায়। তাই বলে ভিন্নভাষী বন্ধু কি নেই? আছে। তবু একথা মানতেই হবে

মাতৃভাষার সোনার কাঠির স্পর্শ না পেলে অন্তরের সব পাপড়িগুলো খোলে না, কতগুলো দল বন্ধ থেকে যায়। প্রাণ খুলে মিশতে পারি তখনই, যখন যার সঙ্গে মিশবো, অর্থাৎ যার খোলা প্রাণের কাছে আমার প্রাণ খুলে দেবো, তার ও আমার কথার জাত হবে এক এবং বাহন অভিন্ন।

একদিন সকালে উঠে অনিমা হঠাৎ আবিষ্কার করল তার শরীরটা ভাল নেই। অসুখটা যে কী ঠিক ধরা যাচ্ছে না। চেনা-শোনা ব্যাধিগুলোর যে-সব লক্ষণ, সবই অনুপস্থিত। মাথা ধরেনি, জ্বর হয়নি, যকৃতের বিকৃতি কিংবা ফুসফুসের বৈকল্য ঘটেনি। হৃদয়ের অবস্থা যা-ই হোক হৃদপিণ্ড সুস্থ ও সবল। তবু মনে হচ্ছে শরীরটা ঠিক নেই। অতএব আফিসে যাওয়া চলে না। যে-কথা সেই কাজ। প্যাড্ থেকে কাগজ টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লেখা হল ছুটির দরখাস্ত এবং দেরি করলে মত পরিবর্তনের সম্ভাবনা পাছে দেখা দেয়, তখনই ঝিকে দিয়ে ডাকে ফেলাও হয়ে গেল। তারপর সটান বিছানায় পড়ে একখানা নতুন কেনা মাসিকের পাতা ওল্টাতেও লাগল। মন বসল না। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সম্পাদকের জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা সব কিছু থেকে খানিকটা খানিকটা চেখে দেখতে দেখতে কখন যে চোখের পাতা বুজে এসেছে জানতে পারেনি। ঘুম ভাঙল ঝিএর ডাকে। উঠে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করল, কটা বাজে রে? এগারটা বেজে গেছে, দিদিমণি। আমার রান্নাবান্না সব সারা। যাও, চান করে এসো। স্নানের ঘরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় বেজে উঠল কলিং বেল। ঝি দরজা খুলতে গেল এবং অনিমা এসে দাঁড়াল সদরের সামনে। কপাট খোলার পর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর বৌদি! বলে অস্ফুট চিৎকার করে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল জয়ন্তীকে।

কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। তারপর জয়ন্তীর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল অনিমা, এ কী শরীর! একেবারে চেনা যায় না। অসুখ করেছিল, একবারও তো লেখনি?

—পাগল! সস্নেহে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল জয়ন্তী, অসুখ আবার করল কবে? ভালই তো আছি।

—হুঁ, তাই দেখছি, বলে বৌদির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে বলে উঠল, তোমার মায়া কই? তাকে নিয়ে আসনি?

জয়ন্তীর বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে কোনোরকমে বলে ফেলল, মায়া ওখানে নেই।

—ওখানে নেই! কোথায় গেল?

—চলে গেছে।...ঘুরে ঘুরে পা ধরে গেছে; চল বসি—বলে বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

চলে গেছে! এই সামান্য দুটি কথা সহজভাবেই বলেছিল জয়ন্তী। তবু তার মধ্যে এমন একটি গভীর উদাস সুর ধ্বনিত হল, যার পরে অনিমার কণ্ঠে আর কোনো প্রশ্ন জোগাল না। মুহূর্তকাল অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ব্যস্ত হয়ে উঠল, ওখানে নয় বৌদি, ঘরে চল। জামা-কাপড় ছেড়ে একেবারে কলতলায়। বেলা কম হয়নি। বিমান কোথায় গেল? এই তো দেখলাম সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।

—আজ্ঞে, আমি এখানেই আছি, বারান্দার কোণ থেকে সাড়া দিল বিমান, জয়ন্তীর ছোট ভাই।

—ওখানে কী করছ? এদিকে এসো।

—আপনার বৌদির রিসেপশন পর্বটা কতক্ষণে সমাধা হয় সেইজন্যে অপেক্ষা করছি, বলে এগিয়ে এল।

অনিমা হাসতে হাসতে বলল, এত হিংসা কিসের! তোমাকেও কিছুটা ভাগ দেওয়া হবে।

—রক্ষে করুন। সেই সকাল থেকে যা দৌড় করিয়েছেন, আর রিসেপশনের লোভ নেই। এখন সটান লম্বা হতে পারি, এই রকম একটু জায়গা দেখিয়ে দিলেই কৃতার্থ হবো।

—লম্বা হবে কি! নাইতে-খেতে হবে না? ও, আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। এ বাসার খোঁজ পেলে কী করে? মাসিমার ওখান থেকে বুঝি?

—মোটেই নয়। সেখানে গেলে এতক্ষণে খেয়ে-দেয়ে দিব্যি একদফা দিবানিদ্রাও সেরে নেওয়া যেত। কিন্তু আপনার বৌদিদি ঠাকুরাণীর সেটা মনঃপুত নয়। হুকুম হল, ওর আফিসে চল, বেশ সারপ্রাইজ দেওয়া হবে। বেশ চল, আমার কি? তারপর সেই সারপ্রাইজের ধাক্কা সামলাতে—এই সেরেছে! সে ভদ্রলোক আবার গেলেন কোথায়?

—ওমা, তাই তো? আমারও খেয়াল হয়নি, ঘর থেকে এদিকে আসতে আসতে বলল জয়ন্তী, তুইও যেমন, তখন থেকে খালি বকবক করে চলেছিস। একবার খোঁজ নিতে হয় না, কোথায় গেলেন ভদ্রলোক?

—কোন্ ভদ্রলোক, কার কথা বলছ? জিজ্ঞাসা করল অনিমা।

—তোমাদের আফিসেই কাজ করেন। তোমার খোঁজ করছি জানতে পেরে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, বেশ ছেলেটি! কি নাম যেন?

বিমান মাথার পিছন দিকে হাত দিয়ে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, পাছে ভুলে যাই, তাই রামধুন মুখস্থ করতে করতে এলাম।

—রামধুন! সবিস্ময়ে বলে উঠল অনিমা।

—দাঁড়ান। রঘুপতি, রাঘব—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাঘবন, রাঘবন আচারিয়া।

ভাই-এর কাণ্ড দেখে জয়ন্তী হেসে উঠল। অনিমার মুখে ফুটে উঠল একটি লাজনম্র স্নিগ্ধ স্বর—উনি নিয়ে এলেন বুঝি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতেই সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই দরজার মুখে দেখা দিল রাঘবন। বিমান কলরব করে উঠল, এই যে এসে গেছেন? মানে, You have come! We were just—

—থাক, আর ইংরেজি আওড়াতে হবে না, বাধা দিয়ে বলল জয়ন্তী, উনি তোমার চেয়ে ভাল বাংলা জানেন।

—তাই নাকি! তা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলুন তো?

—না, মানে, একটু—সলজ্জ দৃষ্টি তুলে এইটুকু বলেই থেমে গেল রাঘবন। বাঁ হাতে বাজারের থলে, ডান হাতে একটা খাবারের প্যাকেট। অনিমা এগিয়ে গিয়ে জিনিস দুটো ধরে নিল। সেই সঙ্গে চকিতে একবার তাকাল ওর মুখের দিকে। রাঘবনের মনে হল সে দৃষ্টিতে শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আরো কিছু, যার নাম সে জানে না। তবু তারই স্পর্শে তার সমস্ত অন্তর এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে উঠল। হয়তো মুখের উপরেও ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রতিচ্ছবি, যেটা বিমানের চোখে না পড়লেও জয়ন্তীর দৃষ্টি এড়াল না।

বহুদিন পরে আত্মজন-মিলনের চমক ও আনন্দে অনিমা যখন বিভোর, তখন সকলের অলক্ষ্যে রাঘবন প্রথমেই গেল ভাঁড়ার ঘরের খবর নিতে। অতিথির আদর অভ্যর্থনা শেষ হলে পরবর্তী পর্ব যখন দেখা দেবে, তখন এই সুদূর বিদেশে অসময়ে একটি নারীর এই একার সংসার কোনো রকমে বিব্রত হয়ে না পড়ে, এইটাই ছিল তার লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, ভাঁড়ারের অবস্থা আকস্মিক অতিথি-গ্রহণের অনুকূল ছিল না। ঝি-এর সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ করে সমূহ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সে থলে হাতে বাজারে ছুটেছিল। অনিমা এবং তার অতিথিদের

অজ্ঞাতে, নেপথ্যে থেকেই দরকারী ব্যবস্থাটুকু সেরে রেখে সকলের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, এই উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি ফিরে আসছিল। কিন্তু সিঁড়ির মুখে ধরা পড়ে যাওয়ায় প্রথমটায় একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তার মত একজন অনাত্মীয় সহকর্মীর এই গায়ে পড়ে আত্মীয়তা দেখানো, বিশেষতঃ নিজের লোকের সামনে, অনিমা হয়তো অনধিকারচর্চা বলে মনে করবে, এ রকম একটা আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু সমস্ত লজ্জা ও শঙ্কা থেকে তাকে নিমেষে মুক্তি দিয়ে গেল অনিমার একটি ভাষাময়ী দৃষ্টি। যে মেঘখানা তার মনের উদার আকাশে এতদিন মাঝে মাঝে আনাগোনা করছিল সেও এক নিমেষে উড়ে চলে গেল।

জয়ন্তী স্নান সেরে ঘরে চলে গেছে, বিমান ঢুকেছে স্নানশালায়, ঝি রান্নাঘরে ব্যস্ত। সিঁড়ির ধাপগুলোর উপরে সেই সঙ্কীর্ণ চাতালের পাশে দাঁড়িয়ে রাঘবন বলল, এবার আমি যাই।

—যাই মানে? ভ্রূ যুগলে কৃত্রিম কোপকুঞ্চন ফুটিয়ে তুলল অনিমা।

—আফিস নেই বুঝি? মৃদু হেসে চাপাগলায় বলল রাঘবন।

—আফিস তো রোজই আছে, অন্তরঙ্গস্বরে বলল অনিমা, একদিন না হয় পালান গেল একসঙ্গে।

রাঘবন চকিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর মুখের দিকে। সমস্ত দেহমনে যেন ছড়িয়ে গেল সেই একসঙ্গে পালানর রোমাঞ্চ। অনিমার মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, বৌদি আপনাকে খুঁজছিল। না বলে চলে গেলে আমাকে বকুনি খেতে হবে। ঐ যে বিমানও বেরিয়েছে। আপনারা গল্প করুন। আমি চট করে স্নানটা সেরে আসি।

একমাথা ভিজে চুল। ভাল করে মোছাও হয়নি। তারই উপরে গোটা কয়েক চিরুনির টান দিয়ে বিমান এসে বসল রাঘবনের

মুখোমুখি। বলল, আপনার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া আছে, মিস্টার আচারিয়া।

স্থুরু করুন, মৃদু হেসে বলল রাঘবন।

—সত্যি, আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কী লাভ হল?

—কষ্ট দিয়েছি!

—দেননি? তর্জমা করে করে ইংরেজি বলতে হয়েছে, সে যে কী যন্ত্রণা, আপনি বুঝবেন কেমন করে? গোড়া থেকেই বাংলা বলতে কী দোষ ছিল? কী ঠাউরেছিলেন আমাদের—গোয়ানীজ, না রেডইণ্ডিয়ান?

—ও-ও, হেসে উঠল রাঘবন, আমার বাংলা শুনলে আপনারা হাসতেন, তাই—

—তাই রীতিমত কাঁদিয়ে ছাড়লেন? আচ্ছা, আপনি এরকম চলিত বাংলা কোত্থেকে শিখলেন? বই পড়ে তো এতটা হয় না।

—যখন স্কুলে পড়ি, আমার একটি বাঙালী বন্ধু ছিল। তাদের বাড়িতে রোজ যেতাম, তার মাকে মাসিমা বলে ডাকতাম। তাঁর কাছ থেকে শেখা। তারপর একটু-আধটু পড়াশুনো করেছি। তার মূলেও মাসিমা।

—দিল্লীতে আপনার কদ্দিন হল?

—বছর তিনেক হবে।

—আচ্ছা শুনুন, আমার মেয়াদ কিন্তু তিনদিন। তার মধ্যে এখানে যা কিছু দেখবার, সাঁ করে দেখিয়ে দিতে পারবেন?

রাঘবন একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখা অনেক রকমের। তিনদিন কেন, তিন্ ঘণ্টাতেও সব দেখে নেওয়া যায়। আবার তেমন করে দেখলে, তিন মাসেও শেষ হয় না।

—আপনিও যেমন! আমি কবি না প্রত্নতাত্ত্বিক যে তিনমাস ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবো? কোনোরকমে দেখা, যাতে করে বন্ধুদের গিয়ে বলতে পারি, এই-এই দেখে এলাম।

জয়ন্তী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তার মানে দেখা নয়, লোকের কাছে বাহাত্বরি দেখানো।

—তা যদি বল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বিমান, সে রকম বাহাত্বরি বৃহৎ ব্যক্তিরা আরো বৃহৎ আকারে দেখিয়ে থাকেন।

—বৃহৎ ব্যক্তিরা মানে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল জয়ন্তী।

—মানে, যাঁরা ঘটা করে দেশভ্রমণ করেন, তারপর লম্বা লম্বা ভ্রমণ-কাহিনী লিখে আমাদের তাক লাগিয়ে দেন।

—তার মধ্যে বাহাত্বরি এল কোত্থেকে ?

—বাহাত্বরি নয়! বেড়াচ্ছ বেড়াও, এত ফলাও করে বলবার কী দরকার—ওহে, আমি এতবার কেশেছি, এতবার ডিনার খেয়েছি অমুক অমুকের সঙ্গে, এই এই কথা বলেছি, অমুক জায়গায়। কেউ কেউ আবার অন্যকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে একটা কাঁটা-চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেন—ইনি লেখক।

—কে লেখক? কার কথা বলছ? বলতে বলতে সদ্য স্নান-শেষে অনিমা এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। তার সঙ্গে এল এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ। স্নান-চিক্কণ দেহখানা ঘিরে এলোমেলো ভাবে জড়ানো একখানা আকাশী রং-এর তাঁতের শাড়ি, কাঁধের পাশে পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে একরাশ ভিজে চুল। সব মিলিয়ে একটি শুচিশুদ্ধ মনোরম আবির্ভাব। সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকাল। বিমানের কথার খেই হারিয়ে গেল; জয়ন্তীর মনে হল, অনিমা এই ক'বছরে সত্যিই খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে! রাঘবনের উজ্জ্বল চোখ ত্বটি স্থির হয়ে রইল একখানি স্নিগ্ধশ্রী সিক্ত মুখের উপর, যেন নতুন করে দেখল তাকে।

বিমান যে কটা দিন কাটিয়ে গেল, কাউকে আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর দেয়নি। অনিমার সেই শখ করে নেওয়া একদিনের ছুটি টেনে টেনে কয়েকদিনে নিয়ে দাঁড় করাল। রাঘবনকেও আরো ত্বদিন

আফিস কামাই না করিয়ে ছাড়ল না। সকালবেলা কোনো রকমে চায়ের পাট সেরে সবাই মিলে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। এবেলা লালকেল্লা, ওবেলা জুম্মামসজিদ, আজ কুতবমিনার, কালীবাড়ি, কাল ফিরোজশাহ-কোটলা। এত ঘোরাঘুরির পরেও যাবার আগের দিন খাবার টেবিলে বিমানের আপসোস শোনা গেল, হরিদ্বারটা দেখে যাওয়া হল না।

অনিমা চা পরিবেশন করছিল। বলল, আজ রাত্রের গাড়িতেই চল না। একদিনের তো মামলা।

—নাঃ, তাহলে দাদার হোটেলে নাম কাটা যাবে।

—আচ্ছা সে যাতে না যায়, সে ভার না হয় আমরা নিলাম। আশ্বাস দিল জয়ন্তী। ছুটো দিন তুই নির্ভয়ে থেকে যেতে পারিস।

—এখন বলছ বটে, কিন্তু বিপদের সময় তোমাদের পাব কোথায়? পরীক্ষা দিতে না পারলে দাদাকে আর ঠেকানো যাবে না। নির্ঘাৎ বলে বসবে, আর পড়তে হবে না, আমার সেরেস্তায় বসে মুহুরিগিরি কর।

—মুহুরিগিরি! হেসে ফেলল অনিমা।

—তা ছাড়া আর কি? বি-এ পাশ যে করতে পারল না, উকিলের মুহুরির বেশি সে আর কী হবে?

—কিন্তু পরীক্ষা দেবার বাধাটা কোথায়? আর, ছুটো দিন না পড়লেই বা ফেল করবে কেন?

—ফেল তো পরের কথা, পরীক্ষার 'হল'-এই ঢোকা যাবে না।

—কেন?

—মূলধনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

—মূলধন! কথাটা বুঝতে পারল না অনিমা।

—আপনারা যাকে বলেন পার্সেণ্টেজ, যার মোটা পুঁজি না থাকলে পরীক্ষা-ব্যবসায় নামা যায় না।

অনিমা হেসে উঠল, ও-ও। দুবছর ধরে .করলে কী? সেই দরকারী মূলধনটুকুও যোগাড় করতে পারনি?

জয়ন্তী একবার ভাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, কেমন করে পারবে? তার জন্যে মাঝে মাঝে ক্লাসে যেতে হবে তো।

—শুধু যদি ক্লাসে যাওয়া হত, তা না হয় একরকম করে চালিয়ে নিতাম। তার সঙ্গে আবার লেকচার শোনা। হরিবল! সত্যি বলছি অনিমাদি, আমরা না হয় বখাটে ছেলে, কিন্তু আপনার মত ভাল ছাত্রী যদি দুটো দিন আমাদের জি. সি. এম্-এর লেকচার শুনতেন, নির্ঘাৎ ব্লাড্‌প্রেসার হত আপনার।

—কী অলুক্ষণে কথা ছেলের! ছদ্ম-তিরস্কারের সুরে বলল জয়ন্তী, ব্লাড্‌প্রেসার হতে যাবে কোন দুঃখে!

—ওটা তো কম করে বললাম। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে সেই পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরনো খাতাটা থেকে যখন নোট্ ডিক্‌টেট্ করতে থাকেন, আমার কি ইচ্ছে হয় জানো? দোতলা থেকে একটা লাফ দিই।

—কি পড়ান তোমাদের জি. সি. এম?

—পলিটিক্যাল ফিলজফি, বলে চোখে মুখে এমন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলল যে ননদ-ভাজের মিলিত হাসিতে ঘর ভরে গেল।

বিমানকে কলকাতা মেলে তুলে দিয়ে রাঘবন চলে গেল তার নিজের বাসার দিকে, জয়ন্তী এবং অনিমা ফিরে এসে বসল সেই ফালিমতন বারান্দাটায়। কথা বলতে কিংবা আলোটা জ্বালতেও ইচ্ছা করল না। অনেকক্ষণ পরে অনিমা বলল, বাড়িটা যেন পাথর হয়ে গেছে। কটা দিন একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল ছেলেটা।

জয়ন্তী কোনো সাড়া দিল না। তেমনি নিঃশব্দে বসে রইল বাইরের দিকে চেয়ে। তারপর মনের উপর থেকে কোনো ভারী চাপ যেন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, এমনি ভাবে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

তোমার প্যাড্ আর কলমটা দাও তো। বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দিই। কতদিন হয়ে গেল।

—কী লিখবে? উঠবার উদ্যোগ না করেই বলল অনিমা।

—একটা পৌঁছন সংবাদ তো দিই। আগেই দেওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন।

—তুমিও যেমন! শুষ্ক হাসি হেসে বলল অনিমা, বাবা আবার ভাবেন নাকি কারো জন্যে?

জয়ন্তী প্রতিবাদ করল না। কথাটার মধ্যে অনেকখানিই হয়তো অভিমান, কিন্তু সবখানি নয়। ছেলেমেয়েদের কাছে এইটাই বসন্তবাবুর পরিচয়। তাঁর অন্তরের মধ্যে এ ছাড়া অন্য কিছু যদি থেকে থাকে, তাঁর সন্তানদের তা জানবার সুযোগ হয়নি। তারা জানে এবং দেখে এসেছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের সম্বন্ধেই তিনি নির্লিপ্ত এবং উদাসীন। একমাত্র কর্তব্যবোধ ছাড়া তাদের প্রতি তাঁর আর কোনো আকর্ষণ নেই। তাঁর প্রতিটি ছেলেমেয়ের মধ্যে এই যে মনোভাব দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে, জয়ন্তী তাকে কেবলমাত্র একটা ভুল বলে উড়িয়ে দেবে কিসের জোরে? সে কথা বলতে গেলে ওকেই হয়তো তারা পাল্টা প্রশ্ন করে বসবে, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে ছাখ, তুমিই কি তার জীবন্ত প্রমাণ নও?

গত পাঁচ-ছ বছর ধরে ছাড়াছাড়ি হলেও এই ননদটির সঙ্গে তার যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়নি। মাঝে মাঝে দুতরফেই চিঠি-পত্রের আনাগোনা চলত। অনিমা যে চিঠি পেত, তার প্রায় সবটুকু জুড়ে থাকত মায়া, তার দুষ্টুমি, তার দুরন্তপনা, তার নিত্য নতুন অত্যাচারের নমুনা, তাকে ঘিরে কত গভীর উৎকণ্ঠা, কত ব্যাকুল ব্যস্ততা। তার থেকে অনিমা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল, এই কুড়িয়ে-পাওয়া পরের মেয়েটি শুধু চিঠির পাতা নয়, তার পরিধি ছাড়িয়ে অনেক গভীরে, একটা গোটা জীবন জুড়ে বসেছে। সেই মায়া সম্বন্ধে জয়ন্তী আজ

একেবারে নীরব। এতদিন পরে যে কারণে তাকে ছাড়তে হল, শ্বশুরের সেই প্রতিশ্রুতি, সেইটুকু উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ সে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু শেষ করতে চাইলেই সব শেষ হয় না। কত বড় প্রচণ্ড আঘাত পেলে মানুষ এমন মূক হয়ে যেতে পারে, কী দুঃসহ বেদনায় জয়ন্তীর মত সর্বংসহা মেয়েকেও সব ফেলে বেরিয়ে পড়তে হল, কিছু না বললেও অনিমার কাছে তার কোনোটাই অস্পষ্ট নেই। জয়ন্তী যতই চেষ্টা করুক নিজের বিক্ষত অন্তরের রক্তাক্ত রূপ এই একান্ত অনুরক্ত ননদটির কাছে লুকিয়ে রাখতে পারেনি।

সুতরাং আজ অনিমার অভিযোগের উত্তরে জয়ন্তীর পক্ষে এ কথা বলা কঠিন—এই মানুষটিকে তোমরা দূর থেকে, বাইরে থেকে যা দেখেছ, আসলে তা তিনি নন। তাঁর মধ্যে একটি স্নেহের ফল্গুধারা আছে, অলক্ষ্য হলেও তা প্রবল। কিন্তু তার চেয়ে প্রবলতর তাঁর অত্যাজ্য সত্যনিষ্ঠা। সমস্ত হৃদয়বৃত্তির দাবি অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর. কঠোর ন্যায়ানুরাগ। এ দুয়ে যেখানে বিরোধ দেখা দেয়, সেখানে তিনি নির্মম। কিন্তু তাঁর একান্ত কাছটিতে যে পৌঁছতে পেরেছে সেই শুধু জানে, যে-আঘাত তিনি দেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি পান। আজ তাঁরই হাত থেকে চরম আঘাত পেলেও একথা জয়ন্তী অস্বীকার করে কেমন করে?

অনিমা উঠে গিয়ে চিঠি লিখবার প্যাড্ এবং কলমটা এনে টিপয়ের উপর রাখল। তারপর আলোটা জ্বেলে দিয়ে বসল গিয়ে আবার তার নিজের জায়গায়। জয়ন্তী লিখবার আয়োজন করতেই বলল, যা-ই লেখ, দেওঘরে তোমার ফিরে যাওয়া হবে না।

—বেশ, তাই লিখে দিচ্ছি, মুচকি হেসে বলল জয়ন্তী।

—জানি, তা তুমি পারবে না। ওটা আমাকেই লিখতে হবে।

—বর্তমানে তুমি যখন আমার লোক্যাল গার্জিয়ান, তখন নিশ্চয়ই লিখতে পার।

—শুধু বর্তমানে কেন, কলকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল অনিমা, আমি তোমার চিরদিনের গার্জিয়ান, খেয়াল রেখো।

—নিশ্চয়ই ; যে-সে ব্যাপার নয়, ননদিনী। কথামত না চললেই গঞ্জনা, কি বল ?

—অতএব সাবধান ! যা বলি তাই শুনবে।

—যে-আজ্ঞে, ছদ্ম-বিনয়ের অভিনয় করে মাথা নোয়াল জয়ন্তী।

অনিমা খানিকক্ষণ নিজের মনে কী সব আলোচনা করে বলল, আচ্ছা বৌদি, এক কাজ কর না কেন ?

সুরটা পরিহাসের নয়। জয়ন্তী লেখা থামিয়ে মাথা তুলে তাকাল। অনিমা বলল, বাবাকেই এখানে আসতে লিখলে হয় না ? একা একা পড়ে আছেন।

জয়ন্তীয় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গভীর আগ্রহের সুরে বলল,' সত্যিই খুব ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এই বাসায়—

পাশের ফ্ল্যাটটা খালি হচ্ছে। দুটো ফ্ল্যাট একসঙ্গে নিলে মাঝখানের এই পার্টিশানটা তুলে দেবে।

—দুটো ফ্ল্যাট পেলে তো কথাই নেই। তাহলে আর দেরি নয়, এসো আমরা দুজনে মিলে লিখে দিই !···বলতে বলতে একটা দূরাগত চিন্তার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল মুখের উপর। অনেকটা যেন আপন মনে বলল, সত্যিই তো। আর ওখানে পড়ে থাকবেন কেন ? যার জন্যে বাড়িঘর ছেড়ে, সংসার থেকে আলাদা হয়ে—বাকী কথাটা আর বলা হল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি সেই অসমাপ্ত চিঠিখানা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সাত

মায়াকে সঙ্গে নিয়ে দেওঘরে ফিরে এসে যখন দেখলেন, জয়ন্তী নেই, একটা চরম বিপদের আশঙ্কায় বসন্তবাবুর দেহমন হঠাৎ অসাড় হয়ে গেল। দাঁড়াবার শক্তি যেমন চলে গেল, কোনো কিছু ভাববার ক্ষমতাও তেমনি রইল না। তারপর চিঠিখানা পেয়ে যেন জীবনের স্পন্দন ফিরে এল। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলেন, জয়ন্তীর এই চলে যাওয়ার মধ্যে দুঃসহ বেদনার তাড়না যতই থাক, তার স্বভাবজ সংযমের বন্ধন অটুট রয়ে গেছে। যতই বিচলিত হোক, কর্তব্যবোধ হারিয়ে ফেলেনি। অন্য কোনো মেয়ে হলে হয়তো কোনো কিছু না বলেই চলে যেত। সে যাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকত হতাশা এবং অভিমান। যে গৃহে আমার দুঃখ কেউ বুঝল না, নিষ্ঠুরতম আঘাত ছাড়া যেখানে আমার আর কিছু প্রাপ্য নেই, সেখানে কী নিয়ে পড়ে থাকব—নীরবে এই অতিসঙ্গত ক্ষোভ জানিয়ে যদি বিদ্রোহ করে চলে যেত জয়ন্তী, সে যাওয়াকে আর যাই হোক অন্যায় আখ্যা দেওয়া যেত না। সত্যই তো। যেদিন একে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন, তার পর থেকে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই তাকে দিতে পারেননি। আজ দিয়েছেন চরমতম আঘাত। তবু যাবার পূর্বমুহূর্তেও কী গভীর তার উৎকণ্ঠা। অনুমতি না নিয়েই চলে যেতে হল বলে ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা বোধ করেনি। এই পরম স্নেহভাজন কল্যাণী বধূটির প্রতি মমতা ও করুণায় বসন্তবাবুর সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মনে মনে বললেন, এ ভালই হল। সে দূরে থাক, বিমুক্ত থাক, নতুন করে আর কোনো বন্ধনে তাকে জড়াতে দেবেন না।

কাশীনাথ ততক্ষণে চিঠিখানা পড়া শেষ করে, খামের মধ্যে ভরতে

ভরতে ভাবছিল, সপ্তাহ্খানেক অপেক্ষা করেই সে দিল্লী যাত্রা করবে। অনিমার ঠিকানা বাড়িতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। জয়ন্তীর ঘরে কিংবা কর্তার কাছেও থাকতে পারে। ওঁকেও তো সে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে থাকে। তার আগে তাকে বোধহয় একখানা চিঠি লেখা দরকার— বৌমা ওখানে পৌঁছলেই যেন একটা টেলিগ্রাম করে। প্রস্তাবটা জজসাহেবের কাছে উপস্থিত করতে যাবে, এমন সময় তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাসূত্র অনুসরণ করে বলে উঠলেন, এটা একদিক দিয়ে ভালই হল কাশীনাথ। একটা বড় সমস্যার আপনা থেকেই সমাধান হয়ে গেল।

কোন্ সমস্যার কথা ইঙ্গিত করলেন জজসাহেব, কাশীনাথের মাথায় ঢুকল না। মায়া ফিরে এসেছে, অথচ জয়ন্তী নেই, আপাততঃ এইটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা; এবং তার সমাধান হতে পারে একটমাত্র উপায়ে—যতশীঘ্র সম্ভব জয়ন্তীকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করে। সেই কাজটি কি করে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই কথাই সে ভাবছিল। জয়ন্তীর দিল্লীযাত্রা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে কলকাতা থেকেই যদি তাকে নিয়ে আসা যায় সেইটাই বরং আরো বাঞ্ছনীয়। জজসাহেব কী ভাবছেন, সেদিক দিয়ে না গিয়ে সে নিজের কথাই পাড়ল। জিজ্ঞাসা করল, বৌমার ভাইয়ের ঠিকানাটা জানা আছে কিনা। জজসাহেব হাত নেড়ে জানালেন, তার দরকার নেই। ওর যেখানে ভাল লাগে সেখানেই থাকতে দাও।

কাশীনাথের সন্দেহ ছিল, পুত্রবধূর উপরে অভিমান করেছেন জজসাহেব। তাই, যেন তার হয়ে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমনি সস্নেহ সহানুভূতির সুরে বলল, অতবড় একটা আঘাত, হঠাৎ সইতে পারেনি বলে চলে গেছে। সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে মনটা একটু শান্ত হলেই চলে আসবে। ঘরের লক্ষ্মী কদিন আর বাইরে পড়ে থাকবে?

—তুমি বুঝতে পারছ না, কাশীনাথ। বাইরেই ওর থাকা দরকার। তাই যাতে থাকতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করছি।

—সে কী করে হয়? অপ্রসন্ন মুখে বলল কাশীনাথ, এই বুড়ো বয়সে আপনাকে দেখবে কে? আর ঐ মেয়ে? ওকে সামলায় কার সাধ্য! এসেই কি কাণ্ড বাধিয়েছে দেখছেন তো।

—আমার জন্যে ভেবো না। বেশ চলে যাবে। মায়াও আস্তে আস্তে সামলে উঠবে। ঝি আছে, নবীন আছে, আর তুমি তো আছই।

এর পরে আর কী বলবে কাশীনাথ? তার এই প্রাক্তন মনিবের অনেক কথাই সে বুঝতে পারে না, কিন্তু এটুকু জানে, একবার তিনি যা স্থির করবেন, তার উপরে আর কারো কিছু বলবার থাকে না। শুষ্ক মুখে প্রস্থানের উদ্যোগ করতেই বসন্তবাবু বললেন, কি জানো কাশী, বৌমা এখানে নেই, তার জন্যে আমি কতখানি স্বস্তি পাচ্ছি, তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

স্বস্তি! বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল কাশীনাথের। এ কী ভয়ঙ্কর কথা বলছেন জজসাহেব! তিনি তখন বলে চলেছেন, দুদিন বাদে এই মেয়েটা যখন সত্যিই চলে যাবে, সে দৃশ্যটা চোখে দেখতে হল না। পেয়ে আবার নতুন করে হারাতে হল না।

মায়ার এই ফিরে আসা যে সাময়িক, একথা কাশীনাথের একবারও মনে হয়নি। ওর বাবার যেটুকু পরিচয় সে পেয়েছে, তার সঙ্গে নিজের সাধারণ বিচারবুদ্ধি যোগ করে এইকথাই সে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল যে এই রকম নিশ্চিত নিরাপত্তা, এবং এই স্নেহময় ঐশ্বর্যময় আশ্রয় থেকে কোনো বাপ তার সন্তানকে নিঃস্ব অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলতে পারে না। সেদিন ট্রেনের কামরায় মায়াকে দেখে প্রথমটা একটু বিস্ময় বোধ করলেও, এ নিয়ে জজসাহেবকে কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। বাপ মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে রাজী হয়নি, হয়তো তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরো

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে এই রকম একটা ধারণা করে সেও নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এবার নতুন করে চিন্তা দেখা দিল। তাহলে কি শশাঙ্কর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়নি, কিংবা যতদিনে তার একটা সংস্থান না হয়, ততদিন অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত করেছেন জজসাহেব? তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না। তার আগেই বসন্তবাবু ওখানকার সব ঘটনা একে একে খুলে বললেন। মেজর ব্যানার্জি যে শীঘ্রই একটা কিছু করে উঠতে পারবেন, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ—সে কথাও জানিয়ে দিলেন। কাশীনাথ বুঝল মেঘ কেটে যায়নি। যে আলোক-রশ্মির সম্ভাব্য প্রত্যাশায় সে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, সেটা অলীক মাত্র। সান্যাল পরিবারের মাথার উপর কোন দুর্যোগ অপেক্ষা করছে কেউ বলতে পারে না।

মায়া জানল, মা মামাবাড়ি গেছে, কদিন পরে আসবে। কোনো কথাই সে মানতে চাইল না। নবীনকে মেরে, ঝি-এর কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে কাশীনাথকে গালাগালি করে কয়েকদিন খুব উৎপাত চালাল। তারপর আপনিই খানিকটা শান্ত হয়ে এল। বসন্তবাবু কাশীনাথকে দিয়ে ওকে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। পিতৃপরিচয় সম্পর্কে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো প্রশ্ন করল না। খাতাপত্রে কাশীনাথ যা লিখিয়ে দিল তাই লেখা হল। স্কুলের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ওকে পড়ানো, সঙ্গে করে বেড়িয়ে আনা, এবং ঐ সম্পর্কে সবরকম দেখাশোনার ভার দিয়ে ওখানকারই একজন বর্ষিয়সী শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করলেন। খাওয়ানো পরানো এবং অন্যসব প্রয়োজন মেটাবার জন্য সেই পুরনো ঝিটি তো রইলই, তার উপরে নবীনকেও বিশেষ নজর রাখতে বলে দিলেন জজসাহেব। কাশীনাথকে আগেকার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে আসতে হল, এবং সংসারের সমস্ত ব্যাপারে মোটামুটি তত্ত্বাবধানের ভার ছাড়াও মায়ার খানিকটা ঝক্কি আপনা থেকেই তার কাঁধে এসে পড়ল।

শিশুমন নিয়ত-বর্ধমান। তার আসক্তি একদিকে যেমন প্রবল, আরেকদিকে তেমনি দ্রুত-সঞ্চারী। খেয়ালী নদীর মত ঘন ঘন তার গতি বদলায়। একপার ছেড়ে আরেকপারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনো কিছু দীর্ঘদিন আঁকড়ে ধরে থাকা তার প্রকৃতির বাইরে। আজ যার জন্যে সে উন্মত্ত, কাল যদি তার দিকে ফিরেও না চায়, তার মধ্যে বিস্ময়ের কারণ নেই। তার স্মৃতিভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র; সেখানে ক্ষণে ক্ষণে নতুনের আবির্ভাব। চোখের আড়াল মানে মনেরও আড়াল—এই ইংরেজি প্রবাদটি শিশুর পক্ষেই সব চেয়ে বেশি প্রযোজ্য।

কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতে মায়াও তেমনি ডুবে গেল তার নতুন জগতের মধ্যে—তার ইস্কুল, খেলাধূলা, দিদিমণি এবং নতুন নতুন সঙ্গী-সাথীর দল। মায়ের কথা ক্বচিৎ শোনা যায় তার মুখে। সবাই খুশি হল, নিশ্চিন্ত হল, বলাবলি করতে লাগল, আহা, ছেলেমানুষ, ভুলে আছে থাক। কিন্তু ভুলে থাকা আর ভুলে যাওয়া তো এক জিনিস নয়। মাঝে মাঝে কোনো ছুটির দিনের দুপুরবেলা, চারদিকে যখন ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, রাস্তায় কোনো লোক নেই, দিদিমণি বিশ্রাম করছেন, ঘরের মেঝেয় আঁচল পেতে তার ঝিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, মায়ার চোখে কিছুতেই ঘুম আসত না, নিঃশব্দে উঠে পড়ে পা টিপে টিপে দোতলার নির্জন বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াত, দূরে ঐ গাছগুলোর মাথার উপর এবং তারও পিছনে ঐ পাহাড়ের কালো রেখার গায় কী দেখত সেই জানে। অকারণে চোখ দুটো জলে ভরে উঠত, ছোট্ট ঠোঁট দুখানি ফাঁক করে বেরিয়ে আসত একটি-দুটি অস্ফুট স্বর—মা। বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠত। ইচ্ছা হত এখনই ছুটে চলে যায় ঐ গাছপালা, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অনেকদূরে যে অজানা দেশ, সেইখানে, তার মায়ের কাছে।

জয়ন্তী যখন ছিল, তার ঘরে বড় খাটের উপর মা ও মেয়ে বরাবর একসঙ্গেই শুয়ে এসেছে। এখন সে ঘর বন্ধ থাকে। পাশের ছোট

ঘরটায় একখানা একজনের মত ছোট খাটে মায়া শোয়, আর তার ধার ঘেঁষে মেঝের উপর ঝি-এর বিছানা। কোনো কোনো দিন অনেক রাতে হঠাৎ চাপা কান্নার শব্দে ঝিয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখতে পায় পাশ-বালিশটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মাথার বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মায়া। প্রথম দু-একদিন জিজ্ঞাসা করত কাঁদছ কেন, কী কষ্ট, কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। উত্তর পায়নি। শুধু একটানা বোবা কান্না। এখন আর কোনো প্রশ্ন করে না, শুধু নিঃশব্দে গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর কখন আপনিই আবার ঘুম এসে যায়। ঝি একটা নিঃশ্বাস ফেলে নেমে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ছোট হোক, বড় হোক সকলের অন্তরেই একটা অন্তঃপ্রবাহ আছে। বাইরের জগৎ তার খবর রাখে না। যার অন্তরে সে বহমান, সে নিজেও অনেক সময়ে তার অস্তিত্ব ভুলে থাকে।

কিছুদিন পরেই জয়ন্তীর চিঠি এসে গেল। সেই সঙ্গে অনিমাও লিখেছে কয়েক লাইন। খাম খুলতে সেইটাই আগে বেরিয়ে এল। অনেকদিন চিঠিপত্র লিখে উঠতে পারেনি, তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে শেষ দিকে জানিয়েছে—আমাদের একান্ত ইচ্ছা, দেওঘরের বাসা তুলে দিয়ে আপনিও আমাদের কাছে চলে আসুন। ওখানে আপনাকে একা রেখে বৌদির পক্ষে বেশিদিন এখানে বা আর কোথাও থাকা সম্ভব নয়। অথচ তার বর্তমান শারীরিক এবং মানসিক অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিতেও আমার মন সরছে না।

এখানে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। এদিকটায় তেমন কিছু ভিড়ও নেই। আপনার ভাল লাগবে। আপনার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

জয়ন্তীর চিঠিখানা ওর চেয়ে অনেকটা বড়। কলকাতা হয়ে দিল্লী পৌঁছবার সংবাদ দিয়ে শ্বশুরকে সাবধানে থাকবার এবং স্বাস্থ্যের

প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেবার পর উপসংহারে লিখেছে—অনিমা কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। আপনি যদি অনুমতি করেন, মাসখানেক ওর কাছে কাটিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আপনি তো জানেন, আপনাকে অতদূরে একা ফেলে রেখে আমরা এতদিন কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না। ওখানকার বাসাটা যদি আপাততঃ ছাড়তে না চান, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে এখানটায় একবার বেড়িয়ে যান। এখানে এলে আমরা দুজনে আপনার দেখাশুনো করতে পারবো। অনিমা একা থাকে, অনেকদিন আপনাকে দেখেনি ; ওরও মনটা খুশি হবে।

এ সম্বন্ধে কাশীকাকাকেও লিখলাম।

সে চিঠিটাও বেশ দীর্ঘ। তারও প্রতিটি ছত্রে শ্বশুরের জন্যে গভীর উদ্বেগ এবং তাঁর সেবা যত্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেবার অনুরোধ। পড়তে পড়তে কাশীনাথের চোখদুটো ছলছল করে উঠল। পাছে জজসাহেবের নজরে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে চিঠিখানা ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই বসন্তবাবু বললেন, তোমার কাছেই থাক। কি লিখেছে আমি জানি। জানালার বাইরে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, কি জানো, কাশী, অন্যায় বা অপরাধ শুধু যে সজ্ঞানেই করে মানুষ, তা নয়। অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে, মনের অগোচরে বাধ্য হয়ে কত অন্যায় আমাদের করতে হয়। তার মধ্যে একটা হল এই বেশিদিন বেঁচে থাকা। যতদিন এই দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে না যাবে, এতদূরে বসেও ঐ হতভাগিনী মেয়েটার ওপর এমনি অলক্ষ্য অত্যাচার করে যেতে হবে। শুধু দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার অভিশাপ। অথচ এর কোনো প্রতিকার নেই।

জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে কাশীনাথের দিকে চেয়ে বললেন, চিঠির উত্তর দিতে দেরি করো না। আমাকেও তাড়াতাড়ি করতে

হবে। তা না হলে হঠাৎ কখন এসে পড়বে। অনিমা আটকাতে পারবে না।

কী লিখবো? নিস্তেজ নিরাশ সুরে জিজ্ঞাসা করল কাশীনাথ। জজসাহেব উত্তর দিতে যাবেন, বাধা পড়ল। ঘরের ঠিক বাইরেই ঘুঙুরের মিষ্টি আওয়াজ এবং তার সঙ্গে ঢুকল তার চেয়েও মিষ্টি স্বর। যেন ভয়ানক দরকারী খবর দিচ্ছে এমনি ভাবে বলল, জানো দাদু আমি আজ নাচ শিখে এলাম। দেখবে? বলে কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাড়াতাড়ি ঘুঙুর জোড়া পরে তালে তালে পা ফেলে দেখিয়ে দিল এক, দুই, তিন, চার—এক, দুই, তিন, চার।

—বাঃ চমৎকার হয়েছে, মাথা নেড়ে বললেন জজসাহেব। দাদুকে সহজেই জয় করে মায়া এবার গর্বোন্নত মুখ তুলে তাকাল ছোট দাদুর দিকে। সেও সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসভরে বাহবা দিয়ে উঠল—খাসা হয়েছে। শিক্ষয়িত্রীটি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে তাকিয়ে ছিলেন, বললেন, আচ্ছা এবার ও ঘরে গিয়ে ঘুঙুর তুলে রাখ। ইস্কুলের পোশাক ছেড়ে ফেল, কেমন?

মায়া চলে যেতেই ঘরে ঢুকে জজসাহেবের উদ্দেশে বললেন, ঐ টুকু মেয়ে; আশ্চর্য তালজ্ঞান। তাই দেখে নাচের সেকশনে নিয়ে গিয়েছিলাম। যদি মত করেন, ভর্তি করে দিই। শনিবার বিকেলে আর রবিবার সকালে ক্লাস। পড়াশুনোর কোনো ব্যাঘাত হবে না।

—তা দিতে পারেন, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন সান্যাল সাহেব, তবে ভাবছিলাম, কদিন পরে দিলে হয় না?

—বেশ তো; তাই হবে। কদিন পরেই বরং দেবো।

শিক্ষয়িত্রী প্রস্থান করতেই, কাশীনাথ বলল, অতটা আগ্রহ করে শিখতে চাইছে, আর উনিও যখন বলছেন ভালই পারবে, দিন না ভর্তি করে? একটু নাচগান শেখা আজকাল সব বড় ঘরেই একরকম রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জজসাহেব কি ভাবছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আমিও ঠিক ঐ কথা ভেবেই ইতস্ততঃ করছিলাম। বড় ঘরের যেটা রেওয়াজ, ও যে ঘরে যাচ্ছে, সেখানে সেটা হবে সমস্যা। সে সমস্যা যে এখনো কিছু কম, তা বলছি না। এতদিন যে ভাবে ও মানুষ হয়েছে তাতে করে ও-ই যে শুধু কষ্ট পাবে তা নয়, গরিব বাপকেও বিব্রত করে তুলবে। সব জানি। জেনেও কিছু করতে পারিনি। কতদিন ভেবেছি, বৌমাকে বলবো, বাধা দেবো, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আমার সব সংকল্প ভেসে গেছে।

কাশীনাথের চোখে তার জজসাহেবের এই রূপটি একেবারে নতুন। এ দুর্বল করুণ সুরও তাঁর কণ্ঠে আগে কোনোদিন শোনেনি। সে শুধু নীরবে চেয়ে রইল। সান্যাল সাহেব বললেন, এতদিন যে ভুল করেছি, নতুন করে তার বোঝা আর বাড়াতে চাই না। নাচটাচ থাক। ওকে ইস্কুলে দেবারও আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তখনকার মত সামলাবার জন্যেই দিতে হল। এখন কেবলই ভাবছি, সেখানকার সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে তো?

কাশীনাথ তেমনি নিরুত্তর। এ সব তো প্রশ্ন নয়, নিজের মনের সঙ্গে নিজেরই বোঝাপড়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বললেন, মেয়েটা আমার কাছে কত কম আসে, লক্ষ্য করেছ? ওর মন ওকে বলে দিয়েছে, আমারই জন্যে ওর মা চলে গেছে। আমাকে ও কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবে না।

কাশীনাথ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, সে সব কিছু নয়। নেহাৎ শিশু; নতুন টিচারটিকে ওর ভাল লেগেছে, তাই আমাদের দিকে তেমন ঘেঁষে না। কিন্তু কিছু বলবার আগেই জজসাহেবকে বলতে শোনা গেল, তার জন্যে আমি বরং খুশিই হয়েছি। একটু একটু করে যত দূরে সরে যাবে, ততই ওর যাবার পথ সহজ হবে। সেইজন্যেই তোমাকে বলছিলাম, বৌমা যেন হঠাৎ এসে না পড়ে। তাহলেই সব

ওলটপালট হয়ে যাবে। একটুখানি থেমে আবার বললেন, সব চেয়ে ভাবনার কথা কি জানো, কাশী, নিজের ওপর আর আমার তেমন আস্থা নেই। ও দূরে আছে দূরেই থাক। তাই লিখে দাও তুমি। শুধু তুমি লিখলে শুনবে না, আমাকেও লিখতে হবে।

পরদিনই চিঠি চলে গেল। অনিমাকে লিখলেন, বৌমা তোমার কাছে আছে, ইহাতে আমি সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলাম। কিছুদিন হইতেই তাহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। এ অবস্থায় যে রকম যত্ন ইত্যাদি করা দরকার আমার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। এবার তুমি তাঁহার দেখাশোনা করিতে পারিবে। তোমারও একজন অভিভাবক-স্থানীয়া সঙ্গিনী দরকার। সেদিক হইতেও সুবিধা হইল। বৌমা তোমার কাছেই থাকুক, ইহাই আমার ইচ্ছা।

আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি রীতিমত সুস্থ আছি। কাশীনাথ সর্বদাই আমার দেখাশোনা করে। আপাততঃ কোথাও যাইবার ইচ্ছা নাই। সময় ও সুযোগ মত কিছুদিন পরে একবার গিয়া তোমাদের দেখিয়া আসিব।

ঐ একই মর্মে জয়ন্তীকে আলাদা চিঠি দিলেন। শেষের দিকে এমন একটা বিষয়ের উপর জোর দিলেন যার ফলে জয়ন্তীর পক্ষে দিল্লী ছেড়ে আসবার পথ আর রইল না। বুঝিয়ে দিলেন, অনিমা যতদিন তার মাসিমার আশ্রয়ে থেকে আফিস করেছে, ততদিন তার সম্পর্কে কোনো ভাবনার কারণ ঘটেনি। আলাদা বাসায় উঠে যাবার পর ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়েছে। তার বয়সী একটি মেয়ের একা একটা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকার যে সমস্যা তাকে উপেক্ষা করা যায় না। ঘটনাক্রমে জয়ন্তী গিয়ে পড়াতে সে সমস্যার সহজ এবং স্বাভাবিক সমাধান হয়ে গেল। শ্বশুরের চেয়ে ননদের কাছে থাকাই তার বেশি প্রয়োজন। অনিমার মা থাকলে, তিনিই যা হোক ব্যবস্থা করতেন। তাঁর অবর্তমানে সে ভার এখন জয়ন্তীকেই নিতে

হবে। তাছাড়া তার নিজের দিক থেকেও এই রকম একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল।

নিজের সম্বন্ধে লিখলেন, সে বিষয়ে জয়ন্তী যে বারংবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে, সেটা নিতান্তই অহেতুক। এখানে তাঁর কোনো অসুবিধা নেই। তার বন্দোবস্ত মতই সব কিছু চলছে। কাশীনাথ সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ।

কাশীনাথের চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত। গৃহলক্ষ্মীর অভাবে গৃহের শ্রী চলিয়া গিয়াছে,—এই জাতীয় কিঞ্চিৎ ভূমিকার পর একেবারে কাজের কথা শুরু করেছে। বৌমা দিল্লীতে থাকুন—এইটাই কর্তার একান্ত ইচ্ছা। সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তাঁর দেখা-শোনার ভার সে আর কাউকে দেয়নি, নিজের দুটি অপটু হাতেই তুলে নিয়েছে। সে বিষয়ে সাধ্যমত কোনো ত্রুটি হবে না। বৌমা যেন নিজের শরীরের প্রতি কোনো অবহেলা না করেন। দিল্লী সে কখনো দেখেনি, রাজধানী দর্শন এবং সেই সঙ্গে মালক্ষ্মী ও অনুদিদিকে একটিবার দেখে আসবার সাধ তার মনে মনে রইল। কিন্তু সাহেবকে একা ফেলে যায় কেমন করে? দেখা যাক, যদি কোনো রকম সুযোগ পাওয়া যায়।

নিজের চিঠির সঙ্গে কর্তার চিঠিখানাও ডাকে দেবার জন্যে কাশীনাথ যখন তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লেখা হয়েছে তোমার?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

একটুখানি অপেক্ষা করে বললেন, “তোমার কি মনে হয় কাশীনাথ?”

কাশীনাথ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

জজসাহেব বললেন, ছাড়তে যখন হবেই, তখন দুদিনের জন্যে ডেকে এনে আবার একটা আঘাত দিয়ে কী লাভ?

কাশী পাত্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে ম্লান মুখে বলল, আপনি যা করছেন, সব দিক ভেবেচিন্তেই করছেন। তার ওপরে আমার আর কি বলবার থাকতে পারে? তবে আমি ভাবছিলাম—

থেমে যেতেই, বসন্তবাবু সাগ্রহে বললেন, কী ভাবছিলে, বলো।

—ভাবছিলাম, এ আঘাত থেকে বৌমাকে বাঁচানো যাবে কি? যেদিন ফিরে এসে শুনবেন, মেয়েটা এসেছিল, আমরা তাঁকে জানতে দিইনি, একবার দেখতে দিইনি, সে দুঃখটা বোধহয় আরও বড়। আমরাই বা কী বলব, কেমন করে মুখ দেখাব তাঁর কাছে?

—না কাশী, সে দুঃখ যত বড়ই হোক সে সয়ে নেবে। তার কাছে আমরা ছোট হয়ে যাব, সে জন্যেও ভাবছি না। কিন্তু তার চোখের ওপরে তার কোল থেকে ঐ মেয়েটাকে আরেকবার ছিনিয়ে নিয়ে তুমি গাড়িতে তুলবে, সে দৃশ্যটা আর দেখতে চাই না!

কাশীনাথ মাথা নত করে শুনছিল। সেইভাবেই এগিয়ে এসে টেবিলের উপর থেকে খামখানা তুলে নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই জজসাহেব উঠে পড়ে বললেন, 'দাঁড়াও, ঐ সঙ্গে বৌমার নামে একটা মনিঅর্ডার করে দিও।' ড্রয়ার খুলে কয়েকখানা নোট ওর হাতে দিলেন। কাশীনাথ দরজার বাইরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ডাকলেন, হ্যাঁ. শোন। টাকাটা কিন্তু ফি মাসেই পাঠাতে হবে। আমার যদি খেয়াল না থাকে, মনে করে চেয়ে নিও।

কাশীনাথ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

দেওঘরে ফিরে সাধারণ পৌঁছনো সংবাদ দেবার কিছুদিন পরে মেজর ব্যানার্জিকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন জজসাহেব। সেটাও সংক্ষিপ্ত স্মারক পত্র। তার উত্তর এসে গেল। এখনো কিছু করতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন জেলে পরিচিত সহকর্মীদের কাছে খোঁজ নিয়েছেন, এ পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া

যায়নি। দেশে ফিরে আসেনি, সে-খবর পাওয়া গেছে। যদি আসে, সঙ্গে সঙ্গেই যাতে তিনি জানতে পারেন সে ব্যবস্থা করা আছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু শশাঙ্কের পূর্ব ইতিহাস বিবেচনা করে এবং অন্যান্য কারণে সেটা সমীচীন বলে মনে হয়নি। এদিকটা জজসাহেবও ভেবে দেখতে পারেন।

তাঁর তরফ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না, আরেকবার এই আশ্বাস দিয়ে ব্যানার্জি সাহেব বিদায় নিয়েছেন।

যে-লোক নিজে থেকেই এতটা সচেষ্ট, তাকে অনাবশ্যক তাগিদ দিয়ে বিরক্ত করেছেন বলে সান্যাল সাহেব মনে মনে লজ্জিত হলেন। বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্পর্কে জেল-সুপারের সঙ্গে তিনিও একমত। তাতে করে কতগুলো অবাঞ্ছনীয় জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া শশাঙ্কর মত লোকের পক্ষে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ বা অভ্যাস থাকতে পারে বলে আশা করা যায় না। সুতরাং মেজর ব্যানার্জি যে-সব সূত্রে চেষ্টা করছেন, তারই উপর নির্ভর করা ছাড়া আপাততঃ আর কিছুই করণীয় নেই।

শশাঙ্কর ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িত আর একটি লোক আছে, অন্ততঃ তখন ছিল। সনাতন। তাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায় হয়তো তার বন্ধুর সন্ধানও মিলতে পারে। ফুলতলি যখন গিয়েছিলেন, তখন এ কথাটা তাঁর খেয়াল হয়নি। হলে একবার খোঁজ নিতেন। এখন সেটা পুলিশের সাহায্যে করা যেতে পারে। কিন্তু পুলিশের সন্ধানী আলোর সামনে পড়াটা সে হয়তো পছন্দ করবে না। পল্লী-অঞ্চলে কেউ করে না। তার নানা বিপদ আছে। থানা থেকে খোঁজ করেছে—প্রতিবেশীদের সন্দেহ উদ্রেক করবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কারণটা কেউ জানতে চাইবে না। তার চেয়েও বড় কথা—বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও শশাঙ্কর সে সুহৃৎ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। তার গতিবিধি জানা থাকলেও পুলিশের কাছে গোপন করাই সনাতনের পক্ষে

স্বাভাবিক। যে একবার জেল খেটে বেরিয়েছে, পুলিশ সদুদ্দেশ্যে তার খবর সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, একথা বিশ্বাস করা কারো পক্ষেই সহজ নয়। সুতরাং সনাতন সম্পর্কে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে কি নিজেই একবার যাবেন সনাতনের সন্ধানে? তার প্রথম বাধা হল তার বাড়িটা ঠিক কোনখানে, ফুলতলি না তার পাশের কোনো গ্রামে সেটা তখন স্পষ্ট করে জানা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ মায়াকে রেখে যাওয়া। কাশীনাথ আছে সত্য, শিক্ষয়িত্রীটিও তাকে স্নেহ করেন। তবু ঐ দুরন্ত মেয়েকে বেশ কয়েক-দিনের জন্যে কাছছাড়া করাটা—।

জজসাহেব ভাবতে লাগলেন। তারপর মনে হল, এ মেয়ে যদি আপনার কেউ হত, তাহলে পারতেন। কিন্তু ও যে পর। তিনি আশ্রয়দাতা মাত্র। যার জিনিস তার হাতে গছিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি দুদিনের তরেও দায়মুক্ত হতে পারেন না। সে দায় যাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়া যেত সে আজ অনেক দূর।

আট

কী একটা ছুটি উপলক্ষে সেদিন আফিস বন্ধ। দিল্লীতে সবে গরম পড়তে শুরু হয়েছে। বেলা পড়লে খোলা বারান্দায় এসে বসা যায়। জয়ন্তী কিছুক্ষণ থেকে ওখানে বসেই একটা বই-এর পাতা ওলটাচ্ছিল। ছুটির দিনের বরাদ্দ দিবানিদ্রাটুকু সেরে মন্থর গতিতে গা ধোয়া ইত্যাদি বৈকালিক প্রোগ্রাম যথারীতি সমাধা করে অনিমাও এসে বসল তার পাশে। অবেলায় ঘুম থেকে উঠলে দেহে এবং মনে যে জড়তা জড়িয়ে থাকে তখনো তা পুরোপুরি কাটেনি। কিছুক্ষণ কোনো কথা হল না। তারপর জয়ন্তী বইখানা সশব্দে টেবিলের উপর ফেলে জিজ্ঞাসা করল, রাঘবন অনেকদিন আসেনি। কি ব্যাপার বলতো ?

—আমি কী করে জানবো ?

—তাহলে জানবে কে ? আমি ?

—গরজ থাকে জানতে পার, মুচকি হেসে বলল অনিমা।

—আফিসে তোদের দেখাশুনো হয় না ?

—হয় বৈকি ?

—আফিসের পর ?

—তাও হয় মাঝে মাঝে।

—কথা-টথা ? বলে, চোখের কোণ দিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তাকাল জয়ন্তী। অনিমা ইঙ্গিতটা বুঝল। কিন্তু যেন বুঝতে পারেনি এমনি ভাবে বলল, কিসের কথা বলছ ?

—যে কথা শুধু 'এমন দিনে তারে বলা যায়'।

—ওসব কাব্যি-টাব্যি আমার আসে না।

—এখনো যদি না এসে থাকে, কবে আসবে শুনি ? আর কতকাল

ঘোরাবি বেচারাকে? আমাকেই বা আর কদিন আটকে রাখতে চাস?

—তোমাকে আবার কে আটকাচ্ছে? যাও না যেদিন ইচ্ছে।

অভিমানের সুর লাগল অনিমার কণ্ঠে। জয়ন্তী হেসে বলল, থাক আর মুখ ভার করতে হবে না। তোদের দুহাত এক না করে যাচ্ছি না। ভয় নেই। তার আর কত দেরি তাই জানতে চাইছি।

—কেন, দুহাত আলাদা থাকলেই বা ক্ষতিটা কি? এই তো বেশ আছি।

জয়ন্তী আর একটু কাছে সরে এসে ননদের চোখে চোখ রেখে গম্ভীর স্বরে বলল, আমার কাছে লুকোসনে। কী হয়েছে খুলে বল।

অনিমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। ধীরে ধীরে মুখের উপর ঘনিয়ে উঠল একটি বিষণ্ণ ছায়া। মাথা নেড়ে শুষ্ক স্বরে বলল, সে হয় না, বৌদি।

—হয় না মানে? কতকটা বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করল জয়ন্তী। তারপর একটু হেসে হালকা সুরে বলল, যাকে বলে মন-দেয়া-নেয়া সে পর্বটা কি এখনো তোদের বাকী আছে বলতে চাস?

—না, তা হয়তো নেই, ম্লান হাসি টেনে এনে বলল অনিমা।

—তবে?

—তবু সাহস হয় না।

—সাহস! বলে হেসে উঠল জয়ন্তী, খুব একটা বীরত্বের কাজ করতে যাচ্ছিস, মনে হচ্ছে!

অনিমা সে হাসিতে যোগ দিল না। গম্ভীর হয়েই রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুমি হয়তো বলবে, সবাই যা করছে তাতে এত ভয় কিসের? কিন্তু জানতো, সকলের সব জিনিস সয় না। বিয়ে আমাদের সইবে না।

—সে আবার কী কথা!

বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ঝি গিয়ে খুলে দিতেই কলকণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করলেন পাশের ফ্ল্যাটের মজুমদার-গৃহিণী। হাতে কী একটা মিষ্টান্নের ভাঁড়। হয় স্বহস্তে তৈরি, নয়তো কোনো আত্মীয় মারফৎ সদ্য দেশ থেকে আমদানী কোনো অপূর্ব বস্তু। অনিমা ঐ মহিলাটির বড় মেয়ের সমবয়সী। সম্প্রতি তার বিয়ে হয়ে গেছে; ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে অনেকদূর, বাংলাদেশের একটা ছোট শহরে তাঁর কর্মস্থলে। বাড়িতে মন টেকে না। ঘন ঘন আসেন অনিমার কাছে। ওর মুখখানা দেখে, দুদণ্ড ওকে পাশে বসিয়ে, বারংবার বলা নানা তুচ্ছ কথা দুর্বোধ্য ভাষায় আরেকবার নতুন করে বলে কন্যা-বিচ্ছেদের গুরুভার খানিকটা নামিয়ে দিয়ে যান। অনিমা অবশ্য তার অনেকটাই বুঝতে পারে না। সেজন্যে ওপক্ষে কোনো অসুবিধা নেই। কথা বলতে পেয়েই তাঁর তৃপ্তি। সেটা কেউ বুঝল কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামান না। অনিমা নিঃশব্দে শুনে যায়, মাঝে মাঝে স্থানে অস্থানে মাথা নাড়ে। সুতরাং অসুবিধা তার দিক থেকেও নেই। কিন্তু বিপদ দেখা দেয় তখন, যখন মহিলাটির সামনে বসেই ঐ ভাঁড়মুক্ত বস্তুগুলো গলাধঃকরণের তাগিদ আসে, এবং চোখে মুখে কোনো রকম বিকার না এনে সে কাজটি করে যেতে হয়। শুধু খেয়েই নিস্তার নেই, সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয় 'চমৎকার'!

জয়ন্তীকেও মাঝে মাঝে এই আসরে যোগ দিতে হয়। কিন্তু সেই 'কানাড়ী'-রাজ্যে অনিমা যদি বা একটু ঝাপসা দেখে, ওর দশা একেবারে ছুঁচোর মতন। কর্কশ রসনা থেকে ড়-এর অজস্র বর্ষণের ভিতর দিয়ে তিনি কোন রস পরিবেশন করছেন—মধুর না রৌদ্র,—কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

আজ সে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনিমাকে ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, কি ভাগ্যি, আজ যে এত

সহজেই ছাড়া পেয়ে গেলি? অনিমা চোখের ইঙ্গিতে একটা বিশেষ স্থান দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, তোমাকে ডাকছেন। জয়ন্তী রগদুটো টিপে ধরে চোখে মুখে একটা সন্ত্রাসের ভাব ফুটিয়ে তুলল, সর্বনাশ!

—ওকি, মাথা ধরেছে নাকি? ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল অনিমা।

— ধরবে; মিনিট পাঁচেক ঐ কাড়ার বাগ্যি কানে গেলেই নির্ঘাৎ ধরবে।

—কাড়ার বাগ্যি!

—তাছাড়া কি! ঐ কড়মড় কানাড়ীর চেয়ে কাড়ার বাজনা অনেক মিষ্টি।

অনিমা কাছে সরে এসে বলল, শোনো, তা বললে চলবে না। ওঁর এক দিদি এসেছেন ত্রিবেন্দ্রাম থেকে। এসেই কাত, নড়তে পারছেন না। আমাদের দুজনকে দেখবার জন্যে নাকি ছটফট করছেন। না গেলে হার্ট ফেল করবে!

—ত্রিবেন্দ্রাম? সে যে আর এক ডিগ্রি সরেস! কাড়া নয় নাকাড়া। রক্ষে কর বাপু। তুমি একাই যাও। হার্ট সামলাও গে ভদ্রমহিলার। আমি পারবো না।

—আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। বলে দিই, কাজ আছে, বেরোতে হবে।

—না, না। সেটা ভাল দেখায় না। নিজে নিতে এসেছেন ভদ্রমহিলা। যা, ঘণ্টাখানেক থেকেই চলে আসিস।

—তুমিও যেমন। ঘণ্টাখানেকে ছাড়লে তো?

অনিমা চলে গেলে জয়ন্তীর মন ফিরে গেল সেই অসমাপ্ত প্রসঙ্গে, যা নিয়ে ওদের আলোচনা চলতে চলতে একটা গোলমেলে বাঁকের মুখে এসে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। কী বলতে চায় অনিমা? বিয়ে আমাদের সইবে না—ওর মুখ থেকে এমন অদ্ভুত অলক্ষুণে কথা শুনতে হবে জয়ন্তী কল্পনাও করেনি। একথার অর্থই বা কি? এরকম

মনোভাব যে কখন কেমন করে এল, আঁচ করতেও পারেনি। সে যতদূর জানে, ওদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, সেখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই। একজন আর একজনকে সম্পূর্ণরূপে জানবার সুযোগ ওরা পেয়েছে। পরস্পরকে গ্রহণ করা সম্পর্কে দুজনেরই মন দ্বিধাহীন। বাধা যেটা ছিল বা হতে পারত—দেশ জাতি এবং সংস্কৃতির বৈষম্য—তা ওরা অনেক আগেই অতিক্রম করে এসেছে। তবে কিসের এ দ্বিধা?

অনিমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে জয়ন্তী ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। মন্দ্র-গৃহিণী এবং তার অন্ধ-ভগিনী সম্ভবত ওকে রীতিমত একটা ভোজ না খাইয়ে ছাড়বেন না। তারপর সেই রসম্ সম্বরম্ তুপা এবং পাচ্চারির জের সামলাতে লেগে যাবে তিন দিন। হয়তো সে কদিন শুধু মইছুর (দই) কিংবা মজনাই (ঘোল) এর উপর দিয়েই চালিয়ে দিতে হবে, এবং সে বস্তুও উনিই পাঠাবেন। সে সব পরের কথা। আপাততঃ তার এসে পড়া দরকার। ব্যাপারটা যেদিকে মোড় নিচ্ছে, অবিলম্বে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া না হলে হয়তো আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কথাবার্তার পক্ষে এই ছুটির দিনটাই ছিল সবচেয়ে উপযোগী। অন্যদিন সকালে আফিসের তাড়া, বিকেলে কেরানী-জীবনের ক্লান্তি। মনটাকে মেলে ধরবার মত একটু অবকাশের অভাব।

জয়ন্তীর নিজের দিক থেকেও কিছু ভাববার আছে। অনেকদিন হয়ে গেল দিল্লীতে। এবার তাকে দেওঘরে ফিরতে হবে। তার জন্যে কিছুদিন থেকে ভিতরে ভিতরে একটা তাগিদ অনুভব করছিল। শ্বশুরের চিঠিখানা যেদিন এল, প্রথমটায় মনে হয়েছিল বেশ তাই হোক। যখন নিষেধ করছেন, কী দরকার ফিরে গিয়ে? এখানেই না হয় থেকে যাবে বরাবর। উনি একা থাকতে চান; তাই থাকুন। তারপর যেমন দিন যেতে লাগল, নিজের মনের সঙ্গে আরো খানিকটা

বোঝাপড়া করে বোঝা গেল, এটা তার সরল মনের কথা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিমান। শ্বশুর যাই বলুন, সংসারে যদি কোথাও তার প্রয়োজন থাকে, সে তাঁরই কাছে। যতদিন বেঁচে আছেন, যতটুকু সেবা যত্ন এবং স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে দেওয়া যায়, এই সংকল্প নিয়েই সে তো কলকাতার সংসার ছেড়ে ওঁর সঙ্গ নিয়েছিল। তখনও তিনি নিষেধ করেছিলেন। সে শোনেনি। তবু তখন শাশুড়ী বেঁচে; পরিবারের সঙ্গে বসন্তবাবুর যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এলেও একেবারে ছিন্ন হয়নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আরো দূরে চলে গেছেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর যে বন্ধন তার অনেকটাই ছিল কেবলমাত্র কর্তব্যের বন্ধন। আজ তাও শিথিল হয়ে গেছে। একমাত্র সে-ই আত্মজা না হয়েও এই নিঃসঙ্গ মানুষটির নিভৃত আত্মার একটি ক্ষুদ্র কোণ এখনো অধিকার করে আছে। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আজই তো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

সেই দিনটির কথা মনে পড়ল। নিতান্ত নিস্পর একটি শিশুকে আশ্রয় দেবার কঠিন প্রয়োজনে আপন পরিবারের আশ্রয় ত্যাগ করে চলেছেন বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য বসন্ত সান্যাল। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা বিহ্বল বিমূঢ়। সে তো পরের মেয়ে। তবু কে যেন বলে দিল তার কানে কানে, তোমাকে যেতে হবে। মুহূর্তমধ্যে সকল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্তী। সেদিন অবশ্য আর-একটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে শুধু উপলক্ষ। লক্ষ্য ছিল শ্বশুরের দিকে। তারপর সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। তখন কে জানত দুখানি ছোট্ট কচি হাতের মুঠিতে এত জোর? কে ভেবেছিল অতটুকু একটা মানুষ তার সব দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে বসবে, জুড়ে বসবে তার সমস্ত অস্তিত্ব। দেওঘরের সেই পাঁচটি বছরের ইতিহাস ক্ষুদ্র হলেও তার জীবনের মর্মমূলে অনন্তকালের জন্যে গাঁথা হয়ে আছে। সে অধ্যায় শেষ হবার পর এবার সে ফিরে গেছে সেই প্রথম দিনটিতে, কলকাতা

ছেড়ে যেদিন দেওঘরের পথে পা বাড়াল। যে ভার সেদিন কাঁধে তুলে বেরিয়েছিল, তেমনি রয়ে গেছে। শ্বশুর আছেন ;—যদিও তিনি বলছেন, এখানে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু প্রয়োজনটা তো শুধু একদিকের নয়। তাঁর দিক থেকে হয়তো নেই। তাঁর নিজস্ব মানসিক গণ্ডীর মধ্যে তিনি চিরদিনই একা। তবু প্রয়োজন আছে। তার নিজের দিক থেকে আছে। সেইজন্যেই তাকে যেতে হবে।

কিন্তু অনিমা? তাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাবে কেমন করে? শুধু যে একা থাকার সমস্যা, তা নয়। যদিও তার বয়সী একটি মেয়ের এই একক জীবনযাত্রার বাস্তব দিকটা উপেক্ষা করা যায় না। শ্বশুরও তাঁর প্রথম চিঠিতেই সে কথার উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ, মায়ের অভাবে এখন সে-ই অনিমার অভিভাবিকা। কিন্তু অভিভাবিকার সাধারণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছাড়াও আরো কিছু আছে—অনিমার মানসিক দিক, জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যে আকস্মিক পরিবর্তনের সামনে এসে সে দাঁড়াল, সেইটাই আজ সবচেয়ে তাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

শুধু কি তাই? অনিমাকে ছেড়ে যেতে হবে, সেই বিচ্ছেদের বেদনাও কম নয়। এই মেয়েটির প্রাণপূর্ণ প্রীতি ও সখ্যের অলক্ষ্য সূত্রে ধীরে ধীরে কখন যে জড়িয়ে পড়েছিল সেটা জানতে পারল তখন, যখন সে-বাঁধন ছেঁড়বার অনিবার্য প্রয়োজন আসন্ন। বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসে প্রায়-সম-বয়সী এই ননদটির প্রতি অতি অল্পদিনের মধ্যেই তার একটি অনায়াস নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। দিন দিন তার গভীরতা বেড়ে গেছে। কলকাতার বাড়িতে একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে কত দীর্ঘরাত তারা শুধু গল্প করে করে কাটিয়ে দিয়েছে। সে গল্প ঠিক গল্প নয়—না বিষয়ে, না রচনায়। সে শুধু কথা, 'অর্থহারা' হলেও 'ভাবেভরা'। দেওঘর যাত্রার পূর্বক্ষণে অনিমার

সেই ব্যাকুলতা, তার মধ্যেও সবচেয়ে বেশি করে বেজেছিল প্রিয়-সুধীর সমূহ বিচ্ছেদ এবং পুনর্মিলনের ক্ষীণ সম্ভাবনা। তার পর দীর্ঘ পাঁচ বছর তাদের দেখা হয়নি। দুজনের মধ্যে একমাত্র সেতু ছিল চিঠি, তাও ঘন ঘন নয়। কিন্তু মায়া যেদিন চলে গেল, বিক্ষত অন্তর যখন একটি স্নেহার্দ্র হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজে ফিরছিল, তখন সকলের আগে অনিমার কথাই মনে পড়েছিল জয়ন্তীর। সেদিন এমন একান্ত কাছটিতে আর কেউ তাকে টেনে নিতে পারত না। এতদিন একসঙ্গে কাটিয়ে এই নীরস একঘেয়ে চাকরিজীবনের বিষণ্ণ নির্জনে তাকে একা ফেলে যেতে হবে মনে হতেই, সমস্ত বুকখানা ভারাতুর হয়ে ওঠে।

এই দূর প্রবাসে অনিমার একমাত্র সঙ্গী রাঘবন। সহকর্মী শুধু নয়, একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এই সদাতৎপর, লাজুক, বিনয়ী, প্রিয়-দর্শন যুবকটির উপর জয়ন্তীরও কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওদের ভিতরকার সম্পর্কটা তখনও বন্ধুত্বের রেখা পার হয়নি। হলেও জয়ন্তীর কাছে সে খবর ছিল অজ্ঞাত। তারপর মুখফুটে ওরা কিছু না বললেও, নারীজাতির যে বিধিদত্ত তৃতীয় নয়ন, তার দ্বারাই সে জানতে পারল সম্পর্কটা অনেক গভীর স্তরে এগিয়ে এসেছে। এবার শুধু মিলনের অপেক্ষা। অত্যন্ত খুশি হয়েছিল জয়ন্তী। ঘর বাঁধবে অনিমা। সে ঘর নিজের হাতে গুছিয়ে দিয়ে কটা দিন ওদের মিলিত জীবনের মধুর সাহচর্য উপভোগ করে, তারপর আসবে তার বিদায়ের পালা। সেই দিনটিকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যেই তার উৎকণ্ঠা। তাই আজ সুযোগ বুঝে কথাটা পেড়েছিল। কিন্তু এমন একটা উত্তর যে অপেক্ষা করে আছে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

অনিমার এখনো দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে ঝিকে পাঠাতে যাবে, এমন সময় দরজা খোলার সাড়া পাওয়া গেল। বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছতে দেবার তর সইল না। তার আগেই বেশ খানিকটা তিরস্কারের ঝাঁজ মিশিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা পড়শী জুটিয়েছিস যা হোক। ওরা না হয়

আসতে দেয় না, তাই বলে—ওমা, তুমি! অ্যাদ্দিন পরে বুঝি মনে পড়ল আমাদের?

রাঘবন মাথাটা নিচু করে তার সেই সলজ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব দিল, কদিন ছিলাম না এখানে।

—তাই নাকি? কই অনি তো কিছু বলেনি। কোথায় গিয়েছিলে?

—মীরাট।

—মীরাট? কেউ আছেন বুঝি সেখানে?

—না, বদলী হয়ে যাচ্ছি। তাই একটা মেস্-টেস্ ঠিক করতে গিয়েছিলাম।

—বদলী হয়ে যাচ্ছ? কী আশ্চর্য! এতবড় একটা খবর, অথচ অনি আমাকে কিচ্ছু জানতে দেয়নি। হঠাৎ তাক্ লাগিয়ে দেবে, এই বোধহয় ওর মতলব।

—সে এখানো জানে না।

জয়ন্তী গভীর বিস্ময়ের সুরে কথাটা কেবল আবৃত্তি করে গেল— এখনো জানে না! কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছে তোমাদের? ঝগড়া করেছ দুজনে?

—না, না; ঝগড়া কেন হবে? ম্লান হেসে বলল রাঘবন।

—তবে?

—এমনিই।

—না, না; এড়িয়ে গেলে চলবে না। কী হয়েছে আমাকে খুলে বল।

—আপনি কি কিছুই শোনেননি?

—না তো। হ্যাঁ, একটা কি বলছিল অনিমা। কিন্তু তার কোনো মানে হয় না।

—কি বলছিল?

—সে কিছু না। একটু তামাশা করছিল আমার সঙ্গে। বিয়ে তোমাদের সইবে না। বদ্ধ পাগল আর কি!

—তামাশা নয় দিদি, শুষ্ক গম্ভীরকণ্ঠে বলল রাঘবন, ওটাই ওর মনের কথা এবং শেষ কথা।

—তুমিও কি পাগলামি শুরু করলে?

রাঘবনের মুখে আবার একটু মলিন হাসি দেখা দিল। কোনো উত্তর এল না। এবার জয়ন্তীর কণ্ঠেও বেজে উঠল গাম্ভীর্যের সুর—ছাখ, রাঘবন, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমাদের একটা ভুল ধারণা আছে। তোমরা মনে কর, তারা শুধু দেবী, স্তবস্তুতি জানিয়ে হাত পেতে বসে থাকলেই বর পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো যায়, কিন্তু সে শুধু বর। তার বেশি আর কিছু না। আর কিছু পেতে হলে হাতটা বাড়াতে হয়। তোমরা ভুলে যাও, যে পুরুষ ধরতে জানে, তারই হাতে মেয়েরা ধরা দেয়। তোমাকে একটু জোর করতে হবে, ভাই।

রাঘবন একবার চোখ তুলে তাকাল জয়ন্তীর মুখের পানে। দেখল দুটি আগ্রহাকুল চোখ, কী উত্তর সে দেবে, তারই জন্য অপেক্ষমান। চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, অন্যের বেলায় হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু আমি এদিক থেকে ভাগ্যবান। হাত না বাড়িয়েই পেয়েছিলাম। তারপর এমন এক জায়গায় এসে বাধল, যেখানে কোনো জোর চলে না।

—সেই বাধাটা কী, তাইতো জানতে চাইছি।

রাঘবন একটু ইতস্ততঃ করল, একবার চোখ ফেরাল পাশের কামরার দিকে। জয়ন্তী বলল, সে বাড়ি নেই; তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

—না, সে জন্য নয়। আমি মনে করেছিলাম আপনি সব শুনেছেন। একথা ওর পক্ষে বলা যতটা সহজ, আমার পক্ষে তা নয়।

—কিন্তু সে তো কিছুই আমাকে বলেনি। হয়তো পরে বলত।

তার আগে তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। অবিশ্যি, তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি! আপনাকে যে শুধু দিদি বলে ডাকি তা নয়, দিদি বলেই জানি। আপনার কাছে লুকোবার আমার কিছুই নেই।...অনিমা তার মনের কথাই বলেছে। বিয়ে ওর সইবে না। ওদের বংশে কারো বেলাতেই সয়নি। ওটা ওদের পারিবারিক অভিশাপ।

জয়ন্তী হঠাৎ চমকে উঠলো। রাঘবন হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে। বলল, কিন্তু দিদি, এসব কথা উচ্চারণ করাও যে আমার অপরাধ।

—কিছু অপরাধ নয়, তুমি বল।

—ও আমাকে বলেছে ওর বাবা মার কথা। কী বলেছে, আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। বিবাহজীবন তাঁদের সার্থক হয়নি। ওর দিদির ইতিহাসও তাই। স্বামীর ঘর পেয়েছে, মন পায়নি, নিজের মনটাও দিতে পারেনি। আলাদা হয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হত, দুজনের পক্ষে আজ সেটাই ছিল মঙ্গল। তারপর ওর ছোড়দা। সকলের অমতে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। কমাস না যেতেই তাঁদের ঘর ভেঙ্গে গেছে। আজ তাঁরা একজন আর-একজনের মুখ দেখেন না। অনিমার বিশ্বাস এর কোনোটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সবগুলোর পেছনে—

জয়ন্তী যেন অন্য কোনো জগতে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ জেগে উঠে বলে উঠল, আর কারো কথা বলেনি অনিমা?

রাঘবন সহসা উত্তর দিতে পারল না। যে পথটাকে সে অতি সন্তর্পণে পাশে রেখে চলে যেতে চাইছিল, হঠাৎ তার মুখে এসে পড়তেই একটু থতমত খেয়ে থেমে গেল। তারপর জয়ন্তীর দীপ্তোজ্জ্বল চোখদুটির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, বলেছে দিদি; ওর বড়দার কথাও বলেছে।

—কিন্তু সেখানে তো এই অদ্ভুত থিওরি—থিওরিই বলবো—একেবারেই খাটে না, রাঘবন। একজনকে নিয়ে তিনি সুখী হন নি, আরেক জনকে নিয়ে হয়েছেন। তাঁর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, একথা বলা চলে না।

রাঘবন সঙ্কোচের সুরে বলল, আমাকে মাপ করবেন, দিদি। এটা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। তবু বলবো, অনিমা অন্য সকলের বেলায় যদি বা ভুল করে থাকে তার বড়দার বেলায় করেনি। তিনি সুখী হয়েছেন কিনা জানি না। কিন্তু ওদের পারিবারিক জীবনে এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে ?

জয়ন্তী প্রতিবাদ করল, না রাঘবন, তোমরা জিনিসটাকে বড় বেশি বাড়িয়ে দেখছ। কারণ আর কিছুই নয়—এটাকে তোমরা আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছ। অনিমা তার বৌদিকে এত বেশি ভালবাসে বলেই তার এ দৃষ্টিভ্রম। বেশ, ওর কথাই যদি সত্যি হয়, ওর দাদা বা দিদির জীবনে যা ঘটেছে, ওর বেলাতেও তাই ঘটবে, এ কেমন ধারা যুক্তি ? একটা বদ্ধ কুসংস্কার ছাড়া একে আর কিছুই বলা যায় না। তুমিও কি ওর এই পাগলামিগুলো মেনে নিয়েছ ?

—ঠিক মেনে নেওয়া যাকে বলে তা নিইনি।

—তাহলে ওকে বুঝিয়ে দাও, ও যা কিছু বলছে এবং করতে যাচ্ছে, সব ভুল।

—আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, সে চেষ্টা আমি বাকী রাখিনি। তার থেকে এই বুঝলাম যে এটা ওর কাছে শুধু সংস্কার নয়, তার চেয়ে অনেক গভীর। বলতে পারেন এক ধরনের ধর্মবিশ্বাস, ইংরেজিতে যাকে বলে ফেথ্ (faith)। অবিশ্যি ও যখন বলে, যুক্তি দিয়েই বলে।

—কী যুক্তি দেয় সে ? সাগ্রহে প্রশ্ন করল জয়ন্তী।

—অনিমা বলতে চায়, বৌদির দাম্পত্য জীবনের যে ব্যর্থতা তার দায়িত্ব ওদের সমস্ত পরিবারের, এবং সেই সঙ্গে তারও। তার দাদা যে অন্যায় করেছেন, তাঁর বোন হিসেবে সেও তার অংশীদার। সে অন্যায়ের প্রতিকার তার হাতে নেই; কিন্তু তার খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করতে পারে।

—প্রায়শ্চিত্ত! শ্লেষ ও দুঃখমেশানো অদ্ভুত সুরে বলল জয়ন্তী, হতভাগী জানে না, যার জন্য ওই প্রায়শ্চিত্ত, তাকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া এতে করে আর কোনো লাভ হবে না।

—আপনি যে দুঃখ পাবেন তা ও জানে; সেদিন আমাকে বলেছিল, বৌদি বড্ড আঘাত পাবে, হয়তো আমার মুখ দেখতেও চাইবে না। কিন্তু কি করবো? যা আমি পারি না, তা কেমন করে করি। যে পরিবারে বধূ পেল শুধু বঞ্চনা, কন্যা সেখানে সুখ সৌভাগ্য চাইতে যাবে কোন্ মুখে? কোন্ অধিকারে?

রাঘবন আর একটা ক্ষুব্ধ উত্তরের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু তা এল না। গালের উপর ডান হাতটা রেখে নিঃশব্দে বসে রইল জয়ন্তী। অনিমার এই অদ্ভুত 'প্রায়শ্চিত্ত' কতখানি হাস্যকর, বলতে গেলে নিছক পাগলামি বা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়, এই মুহূর্তে সে কথা তার মনে হল না। এর পেছনে যে একটি বলিষ্ঠ প্রাণ আছে তারই স্পর্শ তাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে ফেলল। মনে পড়ল তার ঠাকুরদাদার বন্ধু এবং তাদের তিন পুরুষের গৃহচিকিৎসক ডাক্তার মুখার্জির কথা। ভদ্রলোক বিবাহ করেননি। ঠাট্টার সম্পর্কীয় কেউ যদি সেকথা তুলত, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠতেন, 'কে বললে করিনি। এই দেখছ না বরের মালা?'—বলে গলায় ঝোলানো রবারের নলটা দেখিয়ে দিতেন। কখনো বলতেন, 'সময় পেলাম কই? সারাজীবনটা তো রোগ নিয়েই কাটল, বিয়ের যোগ আর এল কখন?' জয়ন্তী তখন ছেলেমানুষ। ভারী আমোদ লাগত

এই সব মজার কথায়। আসল কারণটা শুনলেও বুঝতে পারেনি। বুঝেছিল বড় হবার পর। ডাক্তার মুখার্জিরা ছ'ভাইবোন। বোনটিই বড়। বেশ ঘটা করে বড় ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন বাপ। তখনকার তুলনায় একটু বেশি বয়সে। তারপর কী সব নিয়ে শুরু হল গোলমাল। একদিন কোনো একটা বড় রকমের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সেই যে চলে এসেছিলেন আর যাননি। স্বামী অবশ্য অত সহজে নিষ্কৃতি দেননি। মাঝে মাঝে সদলবলে শ্বশুরবাড়ি চড়াও করে জোর জুলুম, গালিগালাজ চালিয়েছিলেন অনেকদিন। একবার নাকি পুলিশ নিয়েও এসেছিলেন। ডাক্তার মুখার্জি তখন স্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছেন। বিবাহ নামক বস্তুটার যে-রূপ তিনি সেদিন দেখেছিলেন, সেটা তাঁর কিশোর মনে এমন দাগ কেটে বসেছিল, যা সারাজীবনেও এতটুকু ম্লান হয় নি।

তবু তিনি পুরুষ-মানুষ। তিনি যা পেয়েছিলেন বা করেছিলেন, একটি মেয়ের পক্ষে তা কত কঠিন। পুরুষ তার স্বকীয় বলে বলীয়ান। নিজের বাহু ছুটি দিয়েই সে সংসারের বাধা ঠেলে ঝড়ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে চলে যেতে পারে। মনের মত সঙ্গী যদি না মেলে, বলতে পারে—'একলা চল রে'। কিন্তু মেয়ে মানুষের সে জোর কোথায়? তার চলতে গেলে চাই চলার সাথী, তার ভীরু কোমল হাত ছুখানা ধরে নেবার মত ছুটি বলিষ্ঠ হাত। একটি অবলম্বন ছাড়া সে দাঁড়াতে পারে না। স্থূল অর্থে সে অবলম্বনের প্রয়োজন যার মিটে গেছে, অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা যার নেই, তারও চাই একটি আশ্রয়, তার অন্তর্জীবনের, আত্মার অবলম্বন। তারই জন্যে মেয়েদের তপস্যা করতে হয়, পথ চেয়ে বসে থাকতে হয় কখন এসে দাঁড়াবে তার সারাজীবনের সঙ্গী। সকলেই কি পায়? পায় হয়তো, কিন্তু মন যাকে চেয়েছিল বাহু তাকে পায় না। আর, এই মেয়ে অনায়াসে সমস্ত অন্তর ভরে পেয়েও তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। নিজেকে বঞ্চিত করছে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য

ও সৌভাগ্য থেকে শুধু নয়, সাফল্য ও সার্থকতা থেকে, নারীজীবনের যে সর্বময়-পরিপূর্ণতা, সেই মাতৃত্বের গৌরব থেকে। এ যে কত বড় ত্যাগ, কী কঠোর দুঃখকে স্বীকার করে এ সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছে, জয়ন্তীর চেয়ে কে বেশি জানে? এও জানে, এ সবই শুধু তারই জন্যে, তারই মুখের দিকে চেয়ে। এইটাই আজ তার কাছে সব চেয়ে মর্মান্তিক।

অনিমার মনের এই বিশেষ ধারাটির পেছনে আর-একটি প্রবল শক্তি কাজ করছে; জয়ন্তীর কাছে তা অজ্ঞাত নয়। অস্পষ্ট ভাবে হলেও রাঘবন সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তারই আভাস পাওয়া গেল তার কথায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জয়ন্তীর চিন্তাক্লিষ্ট আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, দিদি। শুধু আপনার কথা বলে নয়, প্রায় সব বিষয়েই ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোভাব লক্ষ্য করেছি। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, বাংলায় বোঝাবার মত বিদ্যাও আমার নেই। বলতে পারেন, A peculiar sense of uprightness. কোনো কিছু করতে গেলেই ও ভাবে অন্যের উপর তার ফলটা কী হবে। সুবিচার করছে; না অবিচার করছে---Whether she is just or unjust.

—জানি ভাই, যেন আত্মগত ভাবে বলল জয়ন্তী, এর বীজ রয়েছে ওর রক্তের মধ্যে। আমার শ্বশুরমশায়কে তুমি ছাখনি। তাঁরও ঐ একটিমাত্র অবলম্বন—ন্যায়। তার পাশে আর যা কিছু, সব তুচ্ছ। দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি কিছু নয়, ছেলে মেয়ে প্রিয়জন কেউ নয়। সেই ন্যায়দণ্ডের আঘাত অন্যের উপর যতখানি পড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর নিজেকেই সইতে হয়। এই মেয়েটারও তাই হল।

জয়ন্তীর বেদনাহত কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। রাঘবন আরও কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে থেকে একবার বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে, এই প্রথম জয়ন্তীর পায়ে

হাত দিয়ে প্রণাম করে অস্ফুট স্বরে বলল, কাল আমি যাচ্ছি। হেসেই বোধহয় বলতে চেয়েছিল কথাটা। মুখের উপর ফুটে উঠল কতগুলো বিকৃত কুঞ্চন, যার সঙ্গে হাসির চেয়ে কান্নার মিল স্পষ্টতর। সেই দিকে চেয়ে জয়ন্তীর বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠল। বলবার ইচ্ছা ছিল—রাঘবন, এই 'ন্যায়'-এর ধ্বজা যত বড়ই হোক, প্রেম তার চেয়ে আরো বড়। তার এই পরাজয় তুমি মেনে নিও না। অনিমার পিতৃরক্ত যেখানে ওকে নিয়ে চলেছে, সেই ব্যর্থতার গহ্বর থেকে মেয়েটাকে তুমি রক্ষা করো, ওকে বাঁচতে দাও। এই যে তুমি আজ চলে যাচ্ছ, তার মধ্যে উদারতা থাকতে পারে, পৌরুষ নেই।

আরো বলবার ছিল—প্রেম চিরদিনই স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি। সেই তার প্রকৃতি। ন্যায়বোধের তুলাদণ্ড দিয়ে তার বিচার চলে না। অন্যের মুখ চেয়ে চলা তার ধর্ম নয়। 'আমরা পরস্পরকে ভালবাসি'—এইটাই চরম কথা, তার পরে আর কিছু নেই।

বলবার ছিল এমনি আরো অনেক কথা। কিন্তু কিছুই বলা হল না। এই শান্ত ভদ্র পরমসহিষ্ণু বিদেশী যুবকটি কত বড় মূক বেদনা বহন করে দূরে চলে যাচ্ছে, কত বড় আঘাত পেয়ে বেছে নিয়েছে এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন, অন্তরে অন্তরে অনুভব করে জয়ন্তীর সমস্ত প্রগল্‌ভতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাঘবনকে দরজার মুখে এগিয়ে দেবার পথে শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'একবার দেখা করে যাবে না?' ততক্ষণে তারা অনিমার ঘরের সামনে এসে পড়েছে। যেখানে দাঁড়িয়ে বোধহয় আপনার অজ্ঞাতেই সেই শূন্য ঘরের দিকে একটিবার চোখ তুলে তাকাল রাঘবন। ক্ষণকাল কী ভাবল। তারপর চলতে চলতে বলল, না, থাক।

নয়

এবার অনেকদিন পরে কলকাতায় ফিরে দিলীপবাবু স্থির করলেন, সব কাজ ফেলে প্রথমেই একবার শশাঙ্কর খোঁজখবর নেওয়া দরকার। শুধু খোঁজ নেওয়া নয়, উঠে পড়ে লেগে ভাল রকম একটা সংস্থানও তাকে জুটিয়ে দিতে হবে। কাগজ বেচে আর কতদিন চালাতে পারে মানুষ। এই সব ভাবতে ভাবতে তার সেই একখানা-ঘরের বাসায় গিয়ে যখন পৌঁছলেন, রাত প্রায় নটা। ততক্ষণে দোকান গুটিয়ে নিয়ে শশাঙ্কর ফিরে আসবার কথা। দরজায় তালা ঝুলতে দেখে একটু আশ্চর্য মনে হল। ফিরে যাবেন, না আর একটু অপেক্ষা করবেন স্থির করবার আগেই, সম্ভবতঃ তাঁর সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল বাড়িওয়ালা। খালি গা, কোমরে একখানা আট-হাতি ধুতি বেড় দিয়ে পরা, মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। ঘর ভাড়া নিতে যেদিন আসেন, সেদিনও এই বেশই দেখেছিলেন মনে পড়ছে। এইটাই বোধহয় ভদ্রলোকের নৈশ পোশাক। আর একটু এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দিলীপবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কাকে খুঁজছেন?

—শশাঙ্ক মণ্ডল, এই ঘরে যে থাকে।

—ও-ও, আপনিই তো এসেছিলেন ঘর ভাড়া নিতে?

—আজ্ঞে হাঁ, আমিই এসেছিলাম। শশাঙ্ক ফেরেনি বুঝি?

—ফেরবার উপায় থাকলে তো ফিরবে?

দিলীপবাবু বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। বাড়িওয়ালা তার বক্তব্যটা আর একটু পরিষ্কার করল, যেখানে গেছে, সেখান থেকে ইচ্ছে করলেই আসা যায় না।

—সে কি! কোথায় গেছে?

—জেলে।

—জেলে !

—আজ্ঞে হ্যাঁ; কী চীজই জুটিয়েছিলেন মশাই! খদ্দর-টদ্দর পরেন; ভাবলাম দেশের কাজ-টাজ করে থাকেন হয়তো। আর যাই করুন, ঠকাবেন না। কিন্তু দেখলাম, ত্বনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস নেই। আপনার মত লোকও যে স্রেফ্ ভাঁওতা দিয়ে ঘরখানা বাগাবে কেমন করে জানবো?

—কী বলছেন! বিরক্তির স্বরে বললেন দিলীপবাবু, ভাঁওতা আবার দিলাম কোথায়?

—তা দেবেন কেন? একটা জেলফেরৎ দাগী চোর ধরে এনে বললেন, একেবারে খাঁটি লোক, এরকম ভাড়াটে আর পাবেন না।

—কে বললে দাগী চোর?

—বলছে পুলিশ। কেন, জেল খাটেনি লোকটা?

—কোনো কারণে জেলে গেলেই তাকে দাগী চোর বলে না।

—হাসালেন মশাই। দাগী আর কাকে বলে? তাতেও আপত্তি ছিল না। দাগী আছিস থাক, কাজকর্ম কর। মাস মাস ভাড়াটা চালিয়ে গেলেই হল। কে জানতে চাইছে, জেলে ছিলি না কোন চুলোয় ছিলি। তা না। ওরই মত এক দঙ্গল মেয়াদখাটা বন্ধু জুটিয়ে এনে রাত-বিরেতে আড্ডা। খালি আড্ডা নয়, কী সব গোপন ষড়যন্ত্র! আমি কি ছাই জানি? বুঝতে পারলাম, যেদিন পুলিশ এসে ধরল টুঁটি চেপে। তাও শুনলাম, আসল গোদাটাকে ধরতে পারেনি, একগাদা পুলিশের চোখের সামনে কি করে হাওয়া হয়ে গেল মশাই! আমাকে শুদ্ধ যে চালান দেয়নি চোর ডাকাত পুষছি বলে, এই আমার বহু পুরুষের ভাগ্যি।

কলকাতার মত শহরে শশাঙ্কর কোনো বন্ধু থাকতে পারে, এ রকম সম্ভাবনাও দিলীপবাবুর ধারণার অতীত। তাও আবার পুলিশের

নজরে পড়তে পারে এইরকম বন্ধু। তাছাড়া দলবল জুটিয়ে ষড়যন্ত্র করছে শশাঙ্ক মণ্ডল! এও একেবারে অবিশ্বাস্য। তবে সরল মানুষ, মতলববাজ বদলোকের ফাঁদে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কারা তারা? এই বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। শুধু জানতে চাইলেন, কদিন হল ধরেছে বলতে পারেন?

—কদিন? তা মাসখানেকের বেশি হবে। সব আমার লেখা আছে।

দিলীপবাবু যাবার জন্যে পা বাড়াতেই বাড়িওয়ালা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে চললেন নাকি? দোহাই আপনার! আবার যেন এখানে এনে তুলবেন না। আগের একমাস আর এই জেলে যাওয়া একমাস ক'দিন—হিসেব করে পুরো ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে বিছানাপত্তর কি আছে নিয়ে চলে যান।

দিলীপবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ তো সেজন্যে তৈরি হয়ে আসিনি। ওদিকটা একবার দেখি গিয়ে। তারপর যত শীগগির পারি, ভাড়া আপনার মিটিয়ে দিয়ে যাবো।

—দেখবেন মশাই। তদ্দিন পর্যন্ত ভাড়া কিন্তু চলতেই থাকবে। জিনিসপত্তর সরিয়ে না নিলে আমি তো আর অন্য ভাড়াটে বসাতে পারছি না।

—তাই হবে, মৃদু হেসে বললেন দিলীপবাবু, তদ্দিন পর্যন্তই পাবেন।

বাড়িওয়ালা ঠিকই বলেছিল। জেল হাজতেই শশাঙ্কর খোঁজ পাওয়া গেল। দরখাস্ত করতেই দেখা করবার অনুমতিও পেলেন দিলীপবাবু। কিন্তু মোলাকাত ঘরের লোহার খাঁচায় ঢুকে জালের বেড়ার ওপারে তার চিন্তাশীর্ণ মুখখানাই শুধু নজরে পড়ল, এ পাশে ওপাশে আরো পাঁচ-ছজন দর্শনপ্রার্থীর সোরগোলের মধ্যে মুখের কথা বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলেন না। কোর্টে হাজির হবার আগামী

তারিখটা জেনে নিয়ে সেইদিন জামিনের চেষ্টা করবেন, এই আশ্বাস দিয়ে এলেন।

নির্দিষ্ট দিনে কোর্ট-হাজতে আবার দেখা হল। তার আগে একজন উকিল নিযুক্ত করে যতটা সম্ভব তদ্বির তদারকের পর জানা গিয়েছিল, জামিনের ব্যাপারে পুলিশ আপত্তি করবে না, যদি, যে লোকটা পালিয়ে গেল সেই যে নিতাই সরকার, একথা ও কবুল করে এবং তার বর্তমান আস্তানা কোথায়, জানিয়ে দেয়। তা নাহলে জামিনের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। মামলাও যে কয়েক মাসের মধ্যে শুরু হবে, সেরকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নিতাই যতদিন না ধরা পড়ে এবং তার বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ হয়, ততদিন শশাঙ্ককে চৌদ্দদিন অন্তর কোর্টে হাজির করা এবং জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া—এই শুধু চলতে থাকবে। অর্থাৎ অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্যে হাজত ভোগ।

কোর্ট-হাজতে শশাঙ্কর সঙ্গে যখন দেখা হল, দিলীপবাবু প্রথমটা একটু মৃদু তিরস্কার করলেন—কী দরকার ছিল ঐ সব লোকের সঙ্গে মিশবার? তার পর বোঝাবার চেষ্টা করলেন, লোকটা যদি সে-ই হয়, পুলিশের কাছে স্বীকার করতে বাধা কি? এই সম্পর্কে শশাঙ্কর কোনো সাড়া না পেয়ে শুধু যে বিস্মিত হলেন তা নয়, খানিকটা বিরক্তও হলেন। বললেন, এই ধরনের একটা লোককে বাঁচাতে গিয়ে অকারণ দুর্ভোগ বাড়াচ্ছ কিসের জন্যে?

শশাঙ্ক মৃদু হেসে উত্তর দিল, কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে বলুন!

—ওটা কোনো কাজের কথা নয়। এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা তো করতে হবে।

—কী লাভ বেরিয়ে? এই বেশ আছি। যাদের মধ্যে আছি, তারা আমাকে ঘৃণা করে না, অষ্টপ্রহর সন্দেহের চোখেও দেখে না। তারা আমারই মত দুঃখী, আমার দুঃখ বোঝে। আপনি আমার জন্যে

কত কী করেছেন, দিলীপদা! আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। এবার আমাকে এখানেই থাকতে দিন।

এই ক্ষোভ যে অমূলক নয়, আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, দিলীপবাবুর অজানা নেই। কিন্তু তাই বলে অভিমান করে বসে থাকা চলে না। বললেন, এখানে তো চিরকাল থাকা যাবে না। একদিন বেরোতেই হবে। তার পর? কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে হবে তো। গোড়া থেকে সেই চেষ্টাই করা গিয়েছিল। এতদিন যা করছিলে, এবার তার থেকে আর একটু ভাল ভাবে যাতে থাকা যায় তেমন কোনো একটা পথ জুটিয়ে দেওয়া যাবে, এই আশা নিয়েই গিয়েছিলাম তোমার বাসায়। যে খবর পেলাম তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। লোকটা কে, কি ভাবে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে, কিছুই আমি জানি না। তবে, যত বড় কারণই থাক, এই সব রাস্তা এড়িয়ে চলবে, এটাই মনে করেছিলাম।

এই কথাগুলোর মধ্যে যে সস্নেহ এবং ক্ষুব্ধ অভিমানটুকু ছিল, শশাঙ্ককে তার সবখানি স্পর্শ করল। দিলীপদা তাকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসেন। এরকম শুভাকাঙ্ক্ষী তার আর নেই। সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে এই নির্মম শহরের জনস্রোতে যখন সে ভেসে বেড়াচ্ছিল ইনিই তাকে যাহোক একটা ভেলা জুটিয়ে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। আজ তার এই পরিণাম ওঁকে কতখানি আঘাত দিয়েছে, সহজেই বোঝা যায়। দিলীপদা দুঃখ পেয়েছেন, এইটাই তার সবচেয়ে বড় দুঃখ। একবার ইচ্ছা হল, নিতাই-এর কথাটা তাঁকে খুলে বলবে। সে যে ওর একজন অকৃত্রিম বন্ধু, কোনো স্বার্থের অনুরোধে, কোনো লাভের লোভে নিতাইকে সে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে না, এটা হয়তো উনি বুঝবেন। তারপর কী ভেবে থেমে গেল। মনে হল, এই সব শুদ্ধাচারী মানুষ, যারা সব রকম অন্যায় এবং অপরাধের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চিরদিন শুধু সৎপথ ধরে চলে

এসেছেন, একজন বারংবার—জেলখাটা সত্যিকার অপরাধীকে তাঁরা কখনো সহানুভূতির চোখে দেখবেন না। তাই দিলীপদার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শশাঙ্ক শুধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দিলীপবাবু এবার যাবার উদ্যোগ করে বললেন, আচ্ছা, চলি। সব দিকটা ভাল করে ভেবে ছাখ। জামিনের শর্ত হিসেবে পুলিশ যা বলছে, খুব অন্যায় বলেনি। দিন পাঁচেক পরে জেলখানায় আবার দেখা করবো।

—না, দিলীপদা অনুনয়ের সুরে বলল শশাঙ্ক, ওখানে আপনি যাবেন না।

—কেন?

—না, ঐ অবস্থার মধ্যে আপনাকে যেতে হবে না।

—কোন্ অবস্থার কথা বলছ?

শশাঙ্ক জবাব দিল না। দিলীপবাবু হেসে উঠলেন, ও-ও, ওদের ঐ মোলাকাত-ঘরের ব্যাপার? তাতে কি হয়েছে। ও আমার অভ্যাস আছে। তুমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলে ঠিক ঐখানে আমিও যে কতবার এসে দাঁড়িয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

—কার সঙ্গে কিসের তুলনা! সে কথা ভাবতে আজও বুক ফুলে ওঠে। কিন্তু সেদিন ঐ ভিড়ের মধ্যে যখন আপনাকে দেখলাম, লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিলাম না। আমার জন্যে আপনার—

—কি মুস্কিল! এতো তোমার নিজের বাড়ি নয়, বা বন্দোবস্তটাও তুমি করনি যে তার জন্যে লজ্জিত হবে। না, না, ওসব ভেবে মন খারাপ করো না।—বলে আদালতের কর্মব্যস্ত জনতার ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন।

দিন-দুই পরে। বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। জেলখানার হাজতী আসামীদের নৈশ আহার সবে শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি থালা-বাটি ধুয়ে নিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে শশাঙ্কও গুনতির ফাইলে গিয়ে

বসবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। আফিসের পাহারা গয়জদ্দির সঙ্গে সেদিনকার আমদানী আসামীরা এসে পৌঁছল। বেশির ভাগই নতুন মুখ। দু-একজন পুরনো লোকও আছে, কিছুদিন আগে যারা বেরিয়ে গেছে, এবং যেকারণেই হোক আর বাইরে থাকা সম্ভব হয়নি। এই দলটা সম্বন্ধে শশাঙ্কর অদ্ভুত কৌতূহল। রোজই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, আজও দেখছিল। হঠাৎ চমকে উঠল, এবং থালা বাটি ফেলে একরকম ছুটে গিয়ে একজনের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি!

—খুব অবাক হয়ে গেছিস, না?

—ধরা পড়লে?

—অত সস্তা নয়। নিতাই সরকারকে ধরবে, এতখানি মুরোদ তোদের পুলিশের বাবারও নেই।

—তবে?

—এমনি এলাম! সে যাকগে। তুই এসব গোঁয়াতুর্মি করতে গেলি কিসের জন্যে. বলতে পারিস?

—গোয়াতুর্মি?

—তা বৈকি? একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ করে বসলি, মুখ খুলবো না। চড়চাপড়, বুটের ঘা, কম্বলধোলাই—সব হজম করে ফেললি। ব্যাপার কি?

—কোথায়? ওসব বাজে কথা।

—আমি সব খবর পাই, বুঝলি? গোয়েন্দা খালি পুলিশেরই আছে তা মনে করিস না। কিন্তু এবার যে মোক্ষম অস্তর ছাড়ল রে।

—সেটা আবার কি?

—কেন, এই হাজতে ফেলে রাখা। বলবি তো বল, তা নৈলে জেলে বসে পচতে থাক। রা না করলে ছাড়া নেই। তোর কি এখন তাই চলে? বলে দিলেই তো পারতিস—হ্যাঁ নিতাই সরকারকে চিনি, অমুক ঠিকানায় থাকে।

—আমার জন্যে তুমি ধরা দিলে নিতাইদা!

—আরে না না। শশাঙ্কর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল নিতাই, আসল কথাটা কি জানিস? শেয়ালের মত এক খোঁদল থেকে আরেক খোঁদলে তাড়া খেয়ে খেয়ে আর পারছিলাম না। শরীরটাও ভাল নেই। একটু না জিরলে আর চলে না।

কণ্ঠে একটা ক্লান্তির সুর টেনে এনে পকেট থেকে বিড়ি বের করল নিতাই।

শশাঙ্ক জানে, এটা শুধু স্তোকবাক্য। ধরা দেবার আসল কারণ তাকে ছাড়া পাবার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু এমন করে খালাস পেতে সে চায়নি। পুলিশের হাতে বহু অপমান এবং অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে, দীর্ঘ হাজত-বাসের ভয়ে বিচলিত হয়নি, অতবড় সুহৃৎ ও শ্রদ্ধার পাত্র যে দিলীপদা, তাঁর কথাও অমান্য করতে ইতস্ততঃ করেনি। অন্য যে কেউ হলে এই সুযোগ ছাড়ত না, নিজের নিরাপত্তাকে আরো দৃঢ় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু নিতাই সরকার যে অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। তাই যাকে সে ভালবাসে, তার এই সামান্য কষ্টটুকু সইতে পারল না। এই বহুনিন্দিত এবং বহু অপরাধে অপরাধী আধপাগলা লোকটার দিকে চেয়ে শশাঙ্কর মাথাটা আপনিই নুয়ে পড়ল।

নিতাই বিড়িতে গোটা কয়েক টান দিয়ে টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ধ্যুৎ, ধোঁয়া খেয়ে আর কতক্ষণ চলে? পেটটা চুঁই চুঁই করছে। ভারী কিছু পড়া দরকার। কিন্তু যেরকম গতিক দেখছি— পেটে হাত বুলোতে বুলোতে চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখল।

—তুমি একটু বসো, নিতাইদা, আমি আসছি—বলে হঠাৎ বেশ ব্যস্তভাবে ব্যারাকের দিকে চলে গেল শশাঙ্ক।

বিকেল বেলা যারা নতুন আমদানী সেই সব আসামী বা কয়েদীর জন্যে জেলে কোনো খাবার ব্যবস্থা নেই। ঐদিন সকালে যারা কোর্টে গিয়েছিল তাদের খাবার তোলা থাকে, ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত যে মেট,

তার হেফাজাতে। সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই দেখা যায়, যারা গিয়েছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে আসেনি। কেউ জামিনে বেরিয়ে গেছে, কেউ পেয়েছে বেকসুর খালাস। এমনি করে যে খাবারটা বেঁচে যায়—সবদিন বাঁচে না—তার কিছুটা পড়ে, নতুন যারা এল, তাদের ভাগ্যে। কে বা কারা সেই ভাগ্যবান অনেকখানি নির্ভর করে মেট নামক ব্যক্তিটির দাক্ষিণ্যের উপর। শান্ত নির্বিরোধ এবং অনুগত স্বভাবের দরুন শশাঙ্কর উপর মেট পাহারা সিপাই জমাদারদের কিঞ্চিৎ স্নেহদৃষ্টি পড়েছিল। তার ফলে নিতাই-এর জন্যে এক 'ফাইল' ভাত সহজেই বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সমস্ত দিন ঐ বস্তুটির সঙ্গে যে তার দেখাশোনা হয়নি, সেটা খাবার ধরন দেখেই বোঝা গেল। সব কটা ভাত চেঁচে-মুছে নিঃশেষ করে তারপর পুরো এক বাটি জল গলায় ঢেলে একটা তৃপ্তির উদ্গার ছেড়ে বলল নিতাই, আঃ, এতক্ষণে, ধড়ে প্রাণ এল। সব পারি জানিস, খালি খিদেটা আজও সইতে পারি না। মনে হচ্ছিল, লাখখানেক ভিমরুল পেটের মধ্যে হুল ফোটাচ্ছে। এবার সব ঠাণ্ডা। ভাগ্যিস তুই ছিলি। মেট ব্যাটা দেখছি বেশ খাতির করল তোকে। যাবার সময় একটু বলে-টলে দিয়ে যাস।

—যাবো আবার কোথায়?

—যাবি চুলোয়। হতভাগা কোথাকার!—এবার রীতিমত রেগে উঠল নিতাই। মেয়েটা কোথায় রইল, সে খবরে দরকার নেই, দুবেলা দুমুঠো জুটবে কি করে সে ব্যবস্থা করতে হবে না, জেলে বসে মেটের তোয়াজ করলেই দিন যাবে।

এই তিক্ত তিরস্কারের সবটুকু শশাঙ্কর কানে গেল না। মেয়ের উল্লেখ করতেই বুকের ভিতর যেন হাহাকার করে উঠল। কদিন ধরে রাণীর কথা যখনই মনে হয়েছে, ইচ্ছা করেই সে চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে অন্য ভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই মুহূর্তে সব বাধা ঠেলে সেই স্মৃতিটুকুই ওকে অধিকার করে

ফেলল। নিতাই এবার কোমল কণ্ঠে বলল, কাল-পরশুই তোর অর্ডার এসে যাবে। ভাল উকিল দিয়েছি। কথা যখন দিয়েছে, ঠিক করবে দেখিস।

—কেন এসব করতে গেলে বল তো? অনুযোগের সুরে বলল শশাঙ্ক, এজন্যে খরচপত্রও কম হবে না।

—তা হোক; নিতাই সরকার সে সব পরোয়া করে না।

—তাছাড়া, গিয়ে উঠবোই বা কোথায়? যে ঘরে ছিলাম, সেটা নিশ্চয়ই পড়ে নেই। থাকলেও জায়গা দেবে না বাড়িওয়ালা।

—দরকার কি সেখানে যাবার? থাকবার ব্যবস্থাও করে এসেছি।

—কোথায়?

—সে সব পরে বলবো। চল এবার উঠি। নম্বরবন্দির ঘণ্টা পড়ল, শুনলি না? এখনি জমাদার এসে খিস্তি শুরু করবে।

লম্বা ব্যারাকের একটা কোণ বেছে নিয়ে পাশাপাশি কম্বল বিছিয়ে দুজনে শুয়ে পড়ল। নিতাই নিঃশব্দে বিড়ি টানতে লাগল। শশাঙ্করও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর ছাদের দিকে মুখ করেই বলল নিতাই, একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, বুঝলি?

—কী কাণ্ড? এদিকে পাশ ফিরে প্রশ্ন করল শশাঙ্ক।

—আশুর কথা বলিনি তোকে?

—তোমার ভাই?

—হ্যাঁ, তাছাড়া আবার কে? আমার সেই গুণধর লক্ষ্মণ।

—কী হয়েছে তার?

—হয়েছে যা হবার। ভালোই হয়েছে বলতে হবে। দুদুটো বছর বেঁচে মরে ছিল, এবার মরে বেঁচে গেল। আমিও বাঁচলাম। রাজরোগের ধাক্কা সামলাতে রাজাই ফকির হয়ে যায়, আর আমি তো কোন ছার!

শশাঙ্কর মনে পড়ল, এই ভাই-এর কথা অনেকবার শুনেছে নিতাই-এর মুখে। নিজে লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারেনি বলে একমাত্র ছোটভাইটির লেখাপড়ায় যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে তার প্রখর দৃষ্টি ছিল। আশু ছেলেটা ছেলেবেলা থেকেই একটু বেপরোয়া ধরনের। তার উপর দাদার কাছে শাসনের চেয়ে প্রশ্রয়ই পেয়েছে বেশি। মাঝে মাঝে কিছু টাকা-পয়সা হাতে পড়লেই হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যেত। রসদ ফুরোলে তেমনি হঠাৎ আবার একদিন ফিরে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াত দাদার সামনে। খানিকটা বকাবকি করে আবার পাঠিয়ে দিত হস্টেলে। কলেজের বাকী মাইনে, তার সঙ্গে অন্যান্য খরচ বাবদ আরো কিছু টাকা গুঁজে দিত হাতের মুঠোয়। দু'চারমাস একেবারে নির্ভেজাল ভালো ছেলে। তারপর আবার একদিন সুপারিণ্টেডেণ্টের কড়া চিঠি—'অমুক তারিখ থেকে আশু সরকারের পাত্তা নেই। দুমাসের হস্টেল চার্জ বাকী।' এমনি করে একবার যে গেল আর ফিরল না। ফিরল, তবে সে অনেকদিন পরে এবং একা নয়। পেছনে এসে যে দাঁড়াল ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠা-জড়িত পা দুটি ফেলে, তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমার বৌ। নিতাই রুখে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটার মুখের উপর চোখ পড়তেই থেমে গেল। একেবারে ছেলেমানুষ; বয়সের তুলনায় মুখখানা আরো কচি; সরল অসহায় দুটি চোখ। কী করেছে, কোন পথ ধরে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে বোধটুকুও বোধহয় জন্মায়নি।

শশাঙ্ককে গল্পটা শোনাতে গিয়ে এইখানটায় নিতাই-এর স্বর একটু কোমল হয়ে পড়েছিল। টের পেয়েই আবার সাবধান হয়ে গেল। না; আগে যে ভুল করে থাক, ভাই-এর সম্বন্ধে এবার তার মনে আর কোনো দুর্বলতা ছিল না। স্নেহ এবং অর্থ—দুয়েরই একটা সীমা আছে। সে সীমা অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। যদি কোনোদিন

সে ফিরে আসে, যখন যে অবস্থায় আস্থক, এখানে আর স্থান নেই, না ঘরে না অন্তরে, সে বিষয়ে মনকে বেশ দৃঢ় করেই রেখেছিল নিতাই সরকার। কিন্তু তখন কি ভেবেছিল এমন একটা আপদ জুটিয়ে আনবে হতভাগা? কার মেয়ে, কোথাকার মেয়ে, বিয়ে হয়েছে কি হয়নি, কিছুই তখনো সে জানে না। জেনেই বা কি হত? এসে যখন পড়েছে, জায়গা নেই, কি বেরিয়ে যাও, বলে বিদায় করে দেওয়া যায় না।

আশুর আর একটি সঙ্গী তখনো চোখে পড়েনি। পড়ল তার কদিন পরে। সেটি ঐ রাজরোগ। ঘুসঘুসে জ্বর, কাশি, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত। নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। তারপর শুরু হল খরচান্ত। সরু গলির অন্ধকার একতলা ঘরে থাকা চলবে না। চারদিক খোলামেলা আলোবাতাসওয়ালা জায়গা চাই। চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে জুটল শহরতলীর বস্তির পাশে টিনের দোতলা। ঐ হল চেঞ্জ। ওর বেশি পকেটে কুলোয় না। ওখানে রইল ওরা দুজনে। নিতাই আসা-যাওয়া করে, ডিম দুধ ফল আর ওষুধপত্তর যোগান দেয়। তার তো আর ঐ ধরনের প্রকাশ্য জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকা চলে না। একদিন ভোরবেলা গিয়ে দেখল হয়ে গেছে। কদিন আগে থেকেই বড্ড বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল। সময় বুঝে এক ব্যাটা টিকটিকিও বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। কিছুতেই ওপাড়া থেকে নড়বে না। কয়েকটা দিন গাঢাকা না দিয়ে উপায় ছিল না।

কিছুক্ষণ হল জেলগেটের পেটা ঘণ্টায় নটা বাজিয়ে দিয়েছে। পয়লা পাহারা শেষ হয়ে শুরু হল দোসরা ডিউটি। সিপাই বদল হচ্ছে। নতুন যে এল বাইরে থেকে 'লাণ্ঠিন' উঁচু করে হাঁক দিল, এই পাহারা, সব ঠিক হ্যায়? কয়েদী পাহারার ডিউটি হল ব্যারাকের ভিতরে। লোকগুলোকে গুণে দেখল, 'গ্যাঙ্ বইতে' যে সংখ্যা লেখা

আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে নিল, তারপর জানলার ধারে গিয়ে রিপোর্ট দিল, সব ঠিক হ্যায়। একহাতে লাণ্ঠিন দোলাতে দোলাতে আরেক হাতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পাশের ব্যারাকে গুন্‌তি মেলাতে চলে গেল সিপাইবাবু। তার বুটের আওয়াজ একটু দূরে যেতেই আবার শুরু হল চাপা কলরব। আ-স্তে, হেঁকে উঠল কয়েদী পাহারা, 'ন বাত গিয়া।' অর্থাৎ আর কথা বলবার হুকুম নেই। এবার ঘুম। ঘুম না আসে চুপচাপ পড়ে থাক। অনেকেই হুকুম তামিল করে পাশ ফিরে চোখ বুজল। হুচারজন, মৃহুস্বরে চালিয়ে গেল গুঞ্জরণ। নিতাই বিড়ি ধরিয়ে নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। শশাঙ্ক ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, সে মেয়েটি এখন কোথায়?

—আছে সেই বাড়িতেই।

—একা?

—একা বৈকি? বাড়িওয়ালী থাকে নিচের তলায়। সেই দেখা-শুনো করে। তবে বুড়ীটা লোক তেমন সুবিধার নয়। দেবুও নেই যে একটু খোঁজখবর নেবে!

—ভালো কথা,—দেবু কোথায় গেল? জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। আমাকে যখন জেলে পাঠায় ও তখনো থানাতেই ছিল। শুনলাম ছেড়ে দেবে।

—তাই কখনো দেয়? ওকে চালান দিয়েছে পাটনায়।

পাহারাকে এদিকে আসতে দেখে তুজনেই চুপ করে গেল। রাউণ্ড্ সেরে ওদিকটায় চলে যেতেই নিতাই আবার কথা পাড়ল। কেমন একধরনের কোমল অনুনয়মাখা সুর—জানিস শশাঙ্ক, মেয়েটার কেউ নেই। তাই ভাবছিলাম কি—হঠাৎ থেমে গিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। ব্যাপারটা আঁচ করতে না পেরে শশাঙ্ক বলল, থামলে কেন, বল না?

—বলছিলাম, মেয়েটাকে তুই বিয়ে কর।

—বিয়ে করবো! আমি? তোমার কি মাথা খারাপ হল নিতাইদা? অতিমাত্র বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শশাঙ্ক।

—কেন, বিধবার কি আর বিয়ে হয় না? আকছার হচ্ছে আজকাল।

—সে কথা নয়।

—তবে? জাত আলাদা বলে আপত্তি করছিস? দ্যুৎ; আরে, দুটোই যে আমরা মেয়াদ-খাটা কয়েদী। সেই আমাদের জাত। কে বামুন আর কে বাগদি, সেকথা আর এখন উঠবে না।···বলে স্থান কাল ভুলে হেসে উঠল। শশাঙ্ক সে হাসিতে যোগ দিল না। কথাটা যে কতবড় মর্মান্তিক সত্য, তাই বোধহয় মনে মনে অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগল। নিতাই ওর গায়ে কনুই-এর ঠেলা দিয়ে বলল, কী, কথা বলছিস না যে?

শশাঙ্ক ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, তুমি তো আমার সব কথাই জানো, নিতাইদা। আর যা করতে বল, করবো, শুধু ঐ হুকুম করো না।

—বুঝি সবই, নিঃশ্বাস ফেলে বলল নিতাই, কিন্তু মেয়েটা যখন আসবে, তাকে মানুষ করবে কে? ওসব কি তোর কাজ?

—আর কোত্থেকে আসবে? সে আশা আর করি না।

—তোরা থামবি, না ডাকবো সিপাইকে?—কানের কাছে ফেটে পড়ল পাহারার দুর্জয় হুঙ্কার। নিতাই কি বলতে যাচ্ছিল; তা আর হল না। ঐ লোকটার উদ্দেশে একটা অস্ফুট গালাগালি উচ্চারণ করে পাশ ফিরল।

উকিলবাবু কথা রেখেছিলেন। তিন-চার দিনের মধ্যেই শশাঙ্কর খালাসি পরোয়ানা এসে গেল। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে যে বস্তুটি প্রকাশ্য এবং গোপন পথে বিভিন্ন পকেটের ভারবৃদ্ধি করল, তার

পরিমাণ সামান্য নয়। ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শশাঙ্ক আর একবার অনুযোগ করতে যাচ্ছিল। মাঝপথেই এল বিরাট ধমক—আবার সেই কথা? নতুন কুটুম্ব এলি নাকি তুই? যদি কিছু করে থাকি, নিজের স্বার্থে করেছি, তোর জন্যে করিনি।

ডেকয়েট রেলিং-ঘেরা প্রশস্ত হাজত-ইয়ার্ড। এখানে ওখানে আসামীরা ছোট ছোট দল বেঁধে গল্পগুজব করছে। শশাঙ্কর কাঁধে একটা হাত রেখে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন কোণ দেখে নিতাই দাঁড়িয়ে পড়ল। উদাস সুরে বলল, তোর একটা কথা আমার বড্ড মনে লেগেছিল শশাঙ্ক। সেই যে বলেছিলি, সেই প্রথম যেদিন দেখা হল তোর বাসার কাছে, সকলের কপালে সব জিনিস টেকে না। তাই তো দেখলাম। সংসার একদিন নিতাই সরকারও পেতেছিল। টিকল কৈ? ছিল একটা ভাই, সেও গেল। রেখে গেল একটা শেল! তাকে এখন ফেলি কোথায়? আমার কথাটা আরেক বার ভেবে দেখিস ভাই। একেবারে ভেসে যাবে মেয়েটা।

শশাঙ্ক কোনো উত্তর দিল না। আর একটু এগিয়ে গিয়ে নিতাই বলল, বিয়ে ওদের হয়েছিল হয়তো, কিন্তু যাকে ঘর করা বলে, সে সুযোগ আর পেল না। যেদিন সব শেষ হয়ে গেল, গিয়ে দেখি ঘুরছে, ফিরছে, কাজকম্ম করছে। যেন কিছুই হয়নি। কত বড় সর্বনাশ যে হয়ে গেল তা বোধহয় বুঝতেই পারেনি।

আফিসের রাইটার তাড়া দিয়ে উঠল। আর দেরি করা চলে না। শশাঙ্ক যাবার জন্যে পা বাড়াতেই দরকারী কথাটা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিল নিতাই—মনে আছে তো? আঠার-কুড়ি বছরের ছোকরা। নাম বাদল। রোগা লম্বা; মুখে বসন্তের দাগ। গেটের ঠিক সামনাসামনি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। তোকে চেনে। বেরোতে দেখলেই হাঁটতে শুরু করবে। তুই পেছন পেছন

যাবি ; খানিকটা 'ফাঁক রেখে, বুঝলি? টিকটিকি ব্যাটাদের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই !

নির্দেশমত প্রথমে ট্রাম, তারপর শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চেপে যেখানটায় গিয়ে ওরা নামল, তার নাম খড়দহ। মাইলখানেক গিয়ে মস্ত বড় বস্তি। বেশির ভাগ বাসিন্দা কলকারখানায় খেটে-খাওয়া মানুষ। কয়েকটা গলি পেরিয়ে একখানা টিনের দোতলা বাড়ির দরজায় ঢুকে পড়ল বাদল এবং নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। শশাঙ্ক নিঃশব্দে অনুসরণ করল। রাত নটার কাছাকাছি। অন্ধকার বারান্দার কোলে খানদুই ছোট ছোট ঘর চোখে পড়ল। তারই একটা বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বাদল চাপা গলায় বলল, আমরা এসে গেছি, বৌদি। মিনিট খানেকের মধ্যেই দরজা খুলে গেল এবং হারিকেন-হাতে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। শশাঙ্কর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে মাথার উপরে আঁচলটা একটু টেনে দিল। রক্তহীন পাণ্ডুর বিষণ্ণ একখানা মুখ। পাথরের মত স্থির। শশাঙ্কর হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুদিন আগে এর স্বামী যক্ষ্মায় ভুগে মারা গেছে। সেই মৃত্যুর ছায়া যেন রেখে গেছে ঐ মুখের উপর।

পাশের ঘরটার দিকে আঙুল তুলে বাদলের উদ্দেশে ফিসফিস করে বলল মেয়েটি, দরজা খোলা আছে। ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসতে দাও। বলেই আলোটা ওখানে রেখে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাদল ভেজানো দরজা ঠেলে শশাঙ্ককে ভিতরে নিয়ে গেল। ছোট্ট ঘর। টিনের ছাউনি, টিনের দেয়াল, কাঠের মেঝে। তার একদিকে গোটানো একটা কম্বল-জড়ানো বিছানা, আর একদিকে একটা ভারী বাক্স। কোণের দিকে একগাছা দড়ি টাঙানো। তার উপর ঝুলছে লুঙ্গি আর গামছা। বাদল বলল, নিতাইদার ঘর। মাঝে মাঝে

এসে থাকতো এখানে। কল পাইখানা সব নিচে।* বৌদি দেখিয়ে দেবে। আমি তাহলে যাই, দাদা?

শশাঙ্ক মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা। কে এই ছেলেটি, কোথায় যাবে এই রাত্রে সবই তার অজানা। নিতাই সরকারের একজন অনুচর, এই পর্যন্ত জেনেই সে নিশ্চিন্ত। তার বেশি বোধহয় ওদেরও কিছু বলবার নেই।

পিছনের জানালা বন্ধ ছিল। খুলে দিতেই দেখা গেল অন্ধকার এবং ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা বহুদূর বিস্তৃত শৃঙ্খলাহীন চালাঘরের জঙ্গল। কোনোটা টিনের, কোনোটা খোলার। তারই ভিতর থেকে ভেসে আসছিল ঢোলক আর কর্তালের খচমচ, তার সঙ্গে মিশে ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় পরিত্রাহি চিৎকার, যার মধ্যে সুর নেই, আছে শুধু তাল এবং তার চেয়ে অনেক বেশি গায়ের জোর।

শশাঙ্কর হঠাৎ মনে পড়ল তার গ্রামের কথা। সন্ধ্যার পর কীর্তনের আসর বসত দক্ষিণ-পাড়ায় বনমালী বিশ্বাসের বৈঠকখানায়। একজন মূল গাইয়ে, আর একদল দোহার। কেমন একটা কোমল মাধুর্য ছিল সেই সুরে। পদগুলোই বা কত মিষ্টি আর মোলায়েম। তার সঙ্গে এই রূঢ় কর্কশ গলাবাজির কত তফাৎ! এই পার্থক্যের মূল কোথায় শশাঙ্কর জানা নেই। অনেকদিন আগে দিলীপদার কাছে এই প্রসঙ্গে দু'একটা কথা যা শুনেছিল তারই একটা অস্পষ্ট আভাস মনে পড়ল। দিলীপদা বলেছিলেন, গানের সুর এবং প্রকৃতি জন্ম নেয় সেই গান যারা গায়, তাদের জীবনের সুর এবং জীবনযাত্রার গতি থেকে। যে চাষী শ্যামল বাংলার সরস মাটিতে সারাদিন লাঙ্গল চালিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরে গিয়ে দাঁড়ায় তার বনতুলসী কিংবা ঝুমকো জবার বেড়ায়-ঘেরা খড়ো ঘরের কোলে গোবর-নিকনো উঠানের ধারে, তার কণ্ঠ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে আসে কীর্তন বা ভাটিয়ালির কোমল সুর। তার জীবনের ছন্দ যেমন মন্দ-মন্থর, গানের মধ্যেও

তেমনি বিলম্বিত লয়ের মন্থরতা। বিহার কিংবা ছোটনাগপুরের রুক্ষ কঠিন কৃপণ প্রকৃতির কোলে যে জন্মাল এবং জ্ঞান হতে না হতেই দেখল পাথর-ছড়ানো নীরস মাটি তার অন্নদানের ভার নিল না, জীবিকার জন্যে তাকে যেতে হল দেশান্তরে, তার পর প্রতিদিন ইস্পাতের ঘেরা অগ্নিগর্ভ কারখানার যাঁতাকলের পেষণ থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকতে হল খাপরা-ছাওয়া সুড়ঙ্গের অন্ধকারে, তার জীবনে সুর আসবে কোথা থেকে? উদয়াস্ত নির্মম কঠোর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তাল ঠুকে চলতে হয় বলেই তার মধ্যে আছে শুধু তাল। তার গান হল অ-সুরের গলার কসরৎ। এই ধরনের আরো অনেক কথা বলেছিলেন দিলীপবাবু। সব কথা সে বুঝতে পারেনি।

খোলামাঠ আর ক্ষেতখামারের পাশে গরু বাছুর পুকুর বাগান নিয়ে যে জীবনযাত্রা—যার সঙ্গে তার আজন্ম পরিচয়,—তার বাইরে যে আর একটা জীবন আছে, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধ, আলো, বাতাস, জল নিয়ে কুৎসিত কাড়াকাড়ি, সেখানকার হতভাগ্য মানুষগুলোর জন্যে একটা মমতা অনুভব করেছিল সেদিন। কোনোদিন যে তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তাদের অন্নজল আর খোলার ঘরে ভাগ বসাতে হবে, এহেন সম্ভাবনাও ছিল তার স্বপ্নের অগোচর। ঘটনাস্রোতের আবর্ত অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ সেইখানে এনেই তাকে ফেলে দিল। জানলার বাইরে আগাগোড়া ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা বিশাল বস্তির দিকে তাকিয়ে শশাঙ্কর চোখে কোনো আশার আলো দেখা দিল না। ঐ পরদার আড়ালে যে নতুন রঙ্গমঞ্চ, সেখানে কোন্ ভূমিকা তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, কে বলতে পারে?

গানের আসর তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। জানালাটা বন্ধ করে এদিকে ফিরতেই দেখল সেই মেয়েটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তেমনি মৃদুস্বরে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিন। বারান্দায় জল আছে।

—এই যে যাচ্ছি, বলে শশাঙ্ক বাইরে বেরিয়ে এল। মেয়েটি ততক্ষণে আবার তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। বারান্দার কোণে জলের বালতি, মগ এবং দড়ির উপর একখানা ভাঁজকরা গামছা দেখে মনে হল, এই মাত্র কেউ গুছিয়ে রেখে গেছে। মুখহাত ধুয়ে ঘরে ফিরে দেখল, মেঝের উপর বিছানো কম্বলের আসন, পাশে ঢাকা-দেওয়া জলের গেলাস। হারিকেনের শিষ যতটা সম্ভব বাড়িয়ে ঠিক সামনে রাখা হয়েছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই খাবারের থালা হাতে নিয়ে ঢুকল মেয়েটি। পরিপাটি ঘরে সাজানো হাতে-গড়া আটার রুটি, তার পাশে বেগুনভাজা, একটা তরকারী, সঙ্গে একবাটি ডাল। খেতে বসে বহু বছর আগেকার দিনগুলো মনে পড়ে গেল শশাঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটোও ছলছল করে উঠল। রাধার হাতের রান্না, পরম যত্নে থালা সাজিয়ে এমনি করে সামনে ধরে দেওয়া—সব দূর-স্মৃতির অন্তরালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ একে একে নতুন করে চোখের উপর ভেসে উঠল।

কত বছর কেটে গেছে, অন্নের এই স্বাদ তার অদৃষ্টে জোটেনি। খাওয়ার ভিতরে যে উদয়-পূর্তি ছাড়া আর কিছু আছে, জেলের মধ্যে এবং জেল থেকে বেরিয়ে এতদিন সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। আজ মনে হল, আছে। অনেক কিছু আছে। খাওয়া তো শুধু পেট ভরানো নয়, তার সঙ্গে মন ভরানো। উপকরণ সেখানে অবান্তর, রাধাকে ছেড়ে যেদিন জেলে এল, তার পর এ সত্যটা সে এমন করে আর কখনো উপলব্ধি করেনি।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি আবার এল। হাতে একটা ডিস। কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে বলল, আর দুখানা রুটি দিই ?

—না ; এই অনেক হয়ে গেছে।

—অনেক কোথায় ? ও কখানা খেতে হবে। একটু তরকারী দিই।—সম্মতির অপেক্ষা না করেই সবটুকু তরকারী চামচে দিয়ে

পাতের উপর নামিয়ে দেবার উদ্যোগ করতেই শশাঙ্ক ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না, না ; অতটা খেতে পারবো না।

বৌটি শুনল না। তরকারীটুকু ঢেলে দিয়ে বলল, খুব পারবেন। কিছুই তো করতে পারিনি। শুধু কষ্ট দেওয়া। উত্তরে শশাঙ্ক শুধু একটু হাসল, আর কোনো কথা বলল না। মনে পড়ল, রাধাও এমনি পীড়াপীড়ি করত খাওয়া নিয়ে। এ বিষয়ে বোধহয় সব মেয়েই এক। এই জোর করে খাওয়ানোর মধ্যে যে মধুর উৎপাতটুকু জড়িয়ে আছে, তা যেদিন থাকবে না, গার্হস্থ্য জীবনের সব স্বাদ চলে যাবে।

শশাঙ্ক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখল, ঘরে কেউ নেই। দরজার পাশে আঁচলের কোণটা চোখে পড়ল। ডাকল, শুনুন। ফিরে দাঁড়িয়ে সলজ্জ স্মিতমুখে বলল মেয়েটি, আমার নাম সন্ধ্যা ; আমাকে আপনি নাম ধরেই ডাকবেন।

সন্ধ্যা! এ নাম তো এখানকার নয়। কথায়, বার্তায়, চলনে, ব্যবহারে, মৃদু কণ্ঠস্বরে, বিনম্র হাসিটির মধ্যে এমন একটি ভদ্র মার্জিত রূপ আছে যার সঙ্গে ঐ নামটির সঙ্গতি পাওয়া গেল। এই পরিবেশের কথা ভেবে শশাঙ্কর মনটা ব্যথিত হয়ে উঠল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল, আমাকে কিছু বলছিলেন ?

—ও, হ্যাঁ ; বলছিলাম, তুমি এবার খেয়ে নাওগে। আমার আর কিছু লাগবে না।

—আচ্ছা ; সে হবে'খন। তাই বলে আপনি যেন তাড়াতাড়ি করবেন না।

পরদিন সকালে শশাঙ্ক নিচের কলতলায় মুখ ধুচ্ছিল। একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক পেছনে রোয়াকের উপর থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে গা ?' সুরটা রুক্ষ, এবং প্রশ্নের ধরনটাও ঠিক ভদ্র নয়। সোজা হয়ে ঐদিকে ফিরতেই স্ত্রীলোকটি একগাল অন্তরঙ্গ হাসি হেসে বলে উঠল, ও, তুমিই বুঝি এলে কাল রাত্তিরে ? ঐ ওপরের ঘরে উঠেছো তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। নিতাই-এর কাছে শুনছিলাম তোমার কথা। তা, কাজ-টাজ কি করা হয়?

—আপাততঃ কিছুই করছি না।

—ওমা! তবে যে শুনলাম কি সব চাকরি-বাকরি কর? ঐ বৌটার খরচপত্তর, দুখানা ঘরের ভাড়া সব তুমিই চালাবে। তাইতো বলে গেল নিতাই। 'আমার ভাই আসছে; সেই সব করবে।'

শশাঙ্কর মনে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। বাড়িওয়ালীর কাছে নিতাই যে তার এই জাতীয় পরিচয় রেখে গেছে, আগে জানলে উত্তরটা একটু অন্য রকম ভাবে দিত। নিজেকে আর বেশি ধরা না দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, শীগগিরই একটা কিছু জুটিয়ে নেবো।

—জুটিয়ে নে-বে? তাহলেই হয়েছে। ভাড়াটা কিন্তু আমার ফিমাসের পয়লা তারিখে চাই, আগেই বলে রাখছি।

—তাই পাবেন।

এই আশ্বাস কোন ভরসায় দিল শশাঙ্কও যেমন জানে না, বাড়িওয়ালীও তেমনি বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হল না। অপ্রসন্ন মুখে কি সব বিড় বিড় করতে করতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। উপরে উঠতে উঠতে শশাঙ্কর কানে গেল, কাকে যেন বলছে, শতেক খোয়ার আছে, দেখে নিস, ঐ ছুঁড়িটার কপালে। আমার কথা যেমন শুনল না।

—কেন, দেওর কিছু করে না? আর একটি নারী কণ্ঠের প্রশ্ন।

—ঐ তো শুনলি, ঝাঁঝিয়ে উঠল বাড়িওয়ালী, কাজ জুটিয়ে নে-বে। কদ্দিনে নেয় তাই দেখি। ফিস্ ফিস্ করে বলল, দেওর না কী, তাই বা কে জানে?

শশাঙ্ক শঙ্কিত হয়ে উঠল। এ কোন্ জটিল বাঁধনে তাকে জড়িয়ে রেখে গেল নিতাইদা! আলোচনার বিষয় যে সে এবং সন্ধ্যা, স্পষ্টই

বোঝা গেল। তার মধ্যে বিশেষ করে ভাবিয়ে তুলল কিসের একটা ইঙ্গিত, যা অস্পষ্ট হলেও অশুভ।

আগের দিনের তৈরি, কিন্তু সদ্য গরম করা দুখানা রুটি, সঙ্গে একটু গুড়—তাই দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চা-পান শেষ করে বেরোবার উদ্যোগ করছিল শশাঙ্ক। সন্ধ্যা একটা ছোট্ট থলে নিয়ে এসে বলল, বটঠাকুর আপনাকে দিতে বলে গেছেন। ঐ বাক্সটার চাবি।

—কী আছে ওর মধ্যে?

—কি জানি? কি সব সাজপোশাক।

বলতে গিয়ে একটি চাপা হাসির কুঞ্চন দেখা দিল ওর ওষ্ঠ রেখায়। লুকাতে চাইলেও শশাঙ্কের দৃষ্টি এড়াল না। সহজেই অনুমান করা গেল ওগুলো নিতাই-এর রেলওয়ে অভিযানের উপকরণ। বলল, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক। দরকার হলে চেয়ে নেবো। আমি একটু ঘুরে আসি।

বেরোবার আগেই বাদল এসে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছেন, দাদা?

—এই একটু বেরোচ্ছিলাম।

—একটা দরকারী খবর ছিল। এখনি শুনবেন, না বাজারটা সেরে আসব? কাছেই; বেশি দেরি হবে না।

—তাই এসো। পরে বেরোলেই হবে।

—বৌদি কই? কি আনতে হবে শীগগির দাও—বলতে বলতে বাদল পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং পরক্ষণেই পয়সা ও থলে নিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

খবরটা বাদলের দিক থেকে সত্যিই খুব দরকারী এবং নিতাই থাকলে সেও নিশ্চয়ই তাই মনে করত। এর সদ্ব্যবহার করবার মত শক্তি, সাহস এবং উৎসাহ কোনোটারই তার অভাব ছিল না, কিন্তু

শশাঙ্কর কাছে এর মূল্য কী? এ সব দিয়ে কি করবে সে? বাদলের তা বুঝবার কথা নয়। নিতাইদার অবর্তমানে তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যাবার ভার শশাঙ্কর, এইটুকুই সে জানে। নিতাইও সেই নির্দেশ দিয়ে গেছে। শশাঙ্ক যা বলবে, সেই ভাবে তাকে চলতে হবে, খবরাখবর যা সে সংগ্রহ করতে পারে, এইখানেই যোগান দিতে হবে। তার তরফ থেকে যা কিছু করবার, সবটার জন্যই সে প্রস্তুত।

কাল রাত্রে এখান থেকে ছাড়া পেয়ে সে হাওড়া স্টেশনটা একবার ঘুরতে বেরিয়েছিল। এটাও নিতাই-এর ব্যবস্থা। বাদলের সংগ্রহ-করা তথ্যের উপর সে অনেক সময়ে তার কর্মসূচী স্থির করত। স্টেশনে যেতেই একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। কালকেই একটা গঙ্গাস্নানের যোগ পড়ছে ত্রিবেণীতে। অনেক যাত্রীর ভিড়। রোজকার গাড়িগুলো তো আছেই। তার সঙ্গে আজকের রাত এবং কাল সকাল মিলিয়ে খানচারেক স্পেশালও ছাড়বে। পশ্চিম থেকে অনেকগুলো দল কাল থেকেই স্টেশনে এসে পড়ে আছে। এক এক দলে দু'চারটি পুরুষ, আর একদঙ্গল মেয়েছেলে। কোথায় টিকিট কাটতে হবে, কত দামের টিকিট, কী খাবে, কোথায় বসবে—সব ব্যাপারেই দিশাহারা, দেহাতী মানুষ যা হয়ে থাকে। সাধুসন্ন্যাসীর উপর এদের অচলা ভক্তি। শুধু স্টেশনে নয়, গাড়িতে উঠবার পর এবং তীর্থস্থানে পৌঁছেও প্রতিপদে এদের নানারকম সাহায্য দরকার। দু-একটি দলের সঙ্গে কথা বলেও দেখেছে বাদল। কোনো সাধু এদের ভার নিতে চাইলে তার হাতে সব কিছু সঁপে দিতে দ্বিধা করবে না। সুতরাং শশাঙ্কর করবার বিশেষ কিছু নেই। ঐ কাঠের বাক্সের মধ্যে চমৎকার একটা গেরুয়া পোশাক আছে। তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালাটালা সব। সেই পোশাকটা চড়িয়ে একটু বেশি রাত করে ঐ যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো এবং গম্ভীর ভাবে দু-একটা আশীর্বাণী উচ্চারণ। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। শশাঙ্কর চেহারাটা সেদিক দিয়ে একেবারে আদর্শ। বাদলের

কাজ চেলাগিরি। . যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া, পূজাপাঠ—সব বন্দোবস্ত সাধুজীই করে দেবেন ; খরচ-পত্তর সব ওঁর হাতে তুলে দিয়ে তোমরা নির্ভাবনায় থাক—এইটুকু শুধু বোঝাতে হবে। বাদল তা পারবে এবং ওদের তরফ থেকে বিশেষ আপত্তি হবে বলেও মনে হয় না। তারপর টাকাটা হাতে এলেই ফাঁক বুঝে চেলাসহ সাধুজীর প্রস্থান। মোটা রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ। অথচ বিপদের ঝক্কি সামান্য। পুলিশ আর কদিকে নজর দেবে ? চোর-ছ্যাঁচড় পকেটমার—এসব সামলাতেই হিমসিম। সাধুসন্ন্যাসীরা কি করছে না করছে, তা দিয়ে আর মাথা ঘামাতে আসবে না।

সমস্ত ব্যাপারটার একটা উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়ে বিপুল উৎসাহে প্রস্তাবটা উপস্থিত করে শশাঙ্কর দিকে চেয়ে বাদল হঠাৎ থেমে গেল। ও তরফে উৎসাহ বা আগ্রহের লেশমাত্র নেই। সমস্ত মুখময় কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিয়েছে। সব শুনে ক্ষীণস্বরে বলল, এসব আমাকে দিয়ে হবে না, ভাই। ও আমি পারবো না।

—কিন্তু কাজটা তো কিছু শক্ত নয়, দাদা।

—শক্ত কি সোজা সে কথা হচ্ছে না।

—তাহলে ?

—সে তুমি বুঝবে না।

বাদল চিন্তিত মুখে আস্তে আস্তে বলল, একটা কিছু না করলে চলবেই বা কি করে ? আমি তো সবই জানি। বৌদির কাছে সামান্য কটা টাকা পড়ে আছে। সে আর কদিন ?—

—দেখি চাকরি-বাকরি কিছু পাই কিনা।

চারদিকে কলকারখানা, ছোট বড় কত আফিস। এত লোক কাজ করছে। তার একটা কাজ জুটবে না, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করে শশাঙ্ক ? পরদিন থেকেই সকালে দুপুরে প্রতিটি দরজায় ধর্না দিতে শুরু করল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গেট পার হওয়া ঘটে উঠল না।

দারোয়ানের ভ্রূকুটি কিংবা ধমক সংগ্রহ করেই ফিরতে হল। দু-এক জায়গায় আফিস পর্যন্ত এগুতে পারলেও ফল হল একই।

কদিনের অভিজ্ঞতায় শশাঙ্ক বুঝতে পারল, তিন দল লোকের কাজ আছে এই সব কারখানায়। প্রথম হল—মজদুর বা ঐ জাতীয় কায়িক-শ্রমী, অর্থাৎ দেহপেশীই যাদের একমাত্র হাতিয়ার। তাদের সংখ্যা অগণ্য। সবাই এসেছে বাংলার বাইরে থেকে। বস্তিগুলোর ভিতরে খবর নিলে দেখা যাবে, কাজ করছে না, এরকম কর্মক্ষম লোকের সংখ্যাও সেখানে কম নয়। তারা হচ্ছে ওদের 'ঘরইয়া', মুলুক থেকে আমদানী। বসে আছে 'ভর্তি'র অপেক্ষায়। একেবারে বসে নেই; সেটা ওদের স্বভাব নয়। কারো কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার নিয়ে, তাই দিয়ে কিছু মুড়ি আর গুড় কিনে গোটা কয়েক মোয়া বানিয়ে বারকোসের উপর সাজিয়ে বসে গেছে গলির মোড়ে; কিংবা ঘণ্টা বাজিয়ে ফেরি করছে কাঁচের চুড়ি বা কাঠের খেলনা; তা নাহলে একটা তোলা উনুন আর লোহার কড়া যোগাড় করে কোনো কারখানার গেটের পাশে হেঁকে চলেছে গরম চিনেবাদাম। এ সবই সাময়িক অবলম্বন। চোখ আর কান পড়ে আছে কোন্ কলে কার ছুটি হল, পেনসন নিয়ে দেশে চলল কারা, কিংবা 'বেমার' বা অ্যাকসিডেণ্ট-এর কবলে পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে কজন। সেই ফাঁকগুলো জুড়ে বসে এই সব 'ঘরইয়া'। বাইরের লোক তার খোঁজ পায় না, পেলেও নিয়োগকর্তাদের কাছে ঘেঁসতে পারে না। 'ভর্তির' ব্যবস্থা বেশির ভাগ সর্দারদের মারফৎ। তারা ঐ দেশোয়ালী ভাইদের জাতগোষ্ঠী কিংবা আর কিছু না হলেও মুলুককা আদ্মী।

এই মজদুর বা দেহসর্বস্ব শ্রমিকদের উপরে রয়েছে দ্বিতীয় দল—কল বা যন্ত্রের কাজে দক্ষ মিস্ত্রী জাতীয় লোক, কর্তৃপক্ষের কেতাবে যাদের নাম টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডস। সেখানে আনাড়ির স্থান নেই। শিক্ষানবিশের রাস্তাও অত্যন্ত সংকীর্ণ। আগে থেকে যারা আছে,

তারাই সাবধানে ঘাঁটি আগলে থাকে, যাতে করে আত্মীয়স্বজন বা চেনামহলের বাইরে কেউ সেখানে নাক গলাতে না পারে। কর্তারাও তাই চান। অজ্ঞাতকুলশীল অতিকুশলের চেয়ে উনকৌশল বশংবদ অনেক বেশি নিরাপদ।

এ ছাড়া আর একটা বড় গোষ্ঠী আছে, যাদের বলা যেতে পারে কলমপেশার দল। সাধারণ কেরানী। এদের পেটে কিছু পড়ুক না পড়ুক মাথায় আছে কিঞ্চিৎ স্কুল-কলেজের বিদ্যা আর দেহে মোটামুটি ফরসা জামাকাপড়। ইংরেজ আমলে এদের নাম ছিল 'ভদরলোক'।

বলা বাহুল্য শশাঙ্ক এই তিন দলের কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। তাই দিনের পর দিন চলে গেল, চাকরি বা তার কোনো ক্ষীণসম্ভাবনাও দেখা দিল না। এদিকে সংসার (সন্ধ্যাকে নিয়ে যে জীবনযাত্রা তাকে যদি ঐ আখ্যা দেওয়া যায়) একেবারে অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সকালবেলাকার জলখাবার কিছুদিন থেকে শুধু চা'এ এসে ঠেকেছিল, বর্তমানে উধাও। দুপুর বেলা ভাত আর তার সঙ্গে শাকজাতীয় কিছু, তাও তৈলহীন। বিকাল বেলাও তাই। শশাঙ্কের সন্দেহ হল, কদিন থেকে এ ব্যবস্থাও শুধু তারই বেলায় সীমাবদ্ধ। ওঘরে চলছে নির্জলা না হলেও সজলা উপবাস। সে যদি একা হত, কোথাও চলে যেতে পারত, রাস্তায় পড়ে থাকাও অসম্ভব হত না। কিন্তু এই অযাচিত বন্ধন কাটাবে কেমন করে? একদিন একটা কঠিন মুহূর্তে এই ভার থেকে তাকে মুক্তি দেবার দাবি নিয়েই সে গিয়েছিল জেলখানায়। কিন্তু নিতাই নেই। চালান হয়ে গেছে পাটনায়। এতদিনে হয়তো তার মামলাও শুরু হয়ে গেছে। বাড়িওয়ালী কদিন ছিল না। ফিরে এসেই দুবেলা সমানে তর্জন-গর্জন চালিয়েছে। তার ভাষা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু শশাঙ্ক ও সন্ধ্যাকে কান খোলা রেখেই সেগুলো হজম করতে হচ্ছে। তার প্রধান বক্তব্য হল—

'তুমি মিন্‌সে নিজে মরতে হয় মর! ঐ মেয়েটাকে মারছ কেন? ওকে ছেড়ে দাও, ওর ভার আমি নিচ্ছি।' সে ভার যে কী বস্তু কল্পনা করতেই গা শিউরে ওঠে। তাই শত লাঞ্ছনাতেও সায় দিতে পারছে না। সন্ধ্যা মুখ ফুটে কিছু বলে না। কিন্তু তার দীপ্তিহীন অসহায় চোখ দুটির দিকে চাইলেই বোঝা যায়, তারা যেন বলছে, না খেয়ে থাকতে হয়, থাকবো। তাতে আমার কষ্ট নেই। কিন্তু ঐ ডাইনীর হাতে আমাকে ছেড়ে দিও না।

এই মেয়েটির পূর্ব ইতিহাস শশাঙ্কর জানা নেই। নিতাই বিশেষ কিছু জানায়নি। শুধু বলেছিল, ওর কেউ নেই। কোথায় ওর বাপের বাড়ি; সেখানে যদি কেউ না থাকে, অন্য কোনোখানে কেউ আছে কিনা, কোনো আত্মীয়স্বজন, যে এই অসময়ে ওকে একটু আশ্রয় দিতে পারে, তাও এতদিন জানবার সুযোগ হয়নি। সেটা এবার জানা দরকার। যেখানেই হোক ওকে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর দেরি নয়, আজই এ বিষয়ে ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা প্রয়োজন। বাদল অনেকদিন আসেনি। সে থাকলে সুবিধা হত; তাকে দিয়েই তোলা যেত কথাটা। সরাসরি শশাঙ্কর কাছে সন্ধ্যা হয়তো সব কিছু বলতে চাইবে না, যা বাদলের কাছে বলা অনেক সহজ। তার নিজের পক্ষেও এই রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে ঐ মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ানো প্রীতিকর নয়। সে ভুল বুঝতে পারে, মনে করতে পারে, কোনো সম্পর্ক নেই বলে এ শুধু তাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা। অথচ উপায় কি? নিজে সে যেখানে খুশি, যেমন ভাবে ইচ্ছা থাকতে পারে। ঐ বয়সের একটি মেয়েকে তা রাখা যায় না। নানা রকম উঞ্ছবৃত্তি করেও ওর দুটি অন্নের সংস্থান সে করে উঠতে পারছে না।

এই সব নানাদিক ভাবতে ভাবতে রাত প্রায় নটার সময় শশাঙ্ক বাসায় ফিরছিল। নিঃশব্দে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরের ভেজানো দরজা খুলতেই এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল। ডান দিকে দেয়ালের